কণিকায়

প্রাউট

(পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড)

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

কণিকায় প্রাউট

(পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড)

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

সূচীপত্র

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর বিনা অনুমতিতে এই বইয়ের কোন অংশ অর্থকরী কিংবা উপাধিগত কিংবা গবেষণা সংক্রান্ত কার্যে কিংবা অন্য যে-কোন ভাবে ব্যবহার করা অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং কেহ যেন তাহা না করেন।

-প্রকাশক

© আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ আনন্দনগর, পোঃ-বাগলতা জেলা-পুরুলিয়া, পঃ বঃ

যোগাযোগ অফিস: আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর কলকাতা-৭০০১০০

প্রথম সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারী, ২০১৫

প্রকাশক: আচার্য পীযূষানন্দ অবধূত (কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব) আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ ৫২৭ ভি. আই. পি. নগর

সূচীপত্র

কলকাতা–৭০০১০০

অক্ষর বিন্যাস: শ্রীঅনুপ শীট ডট প্লাস

দক্ষিণ শানপুর, হাওড়া–৭১১১০৫

মুদ্রাকর: আনন্দ প্রিন্টার্স;

৩/১সি, মোহনবাগান লেন

কলকাতা–৭০০০০৪

ISBN. 978-81-7252-392-3

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

"প্রাউট” এই বহুল পরিচিত শব্দটি "প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব” বা ইংরেজীতে Progressive Utilization Theory-র সংক্ষিপ্ত রূপ। যাঁরা মহান দার্শনিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের (ধর্মগুরুরূপে যিনি শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি নামে সমধিক পরিচিত) পুস্তকসম্ভার সম্বন্ধে অবহিত আছেন তাঁরা জানেন যে তিনি তাঁর সর্বানুস্যূত আধ্যাত্মিক দর্শন প্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে সেই দর্শনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্ব "প্রাউট”ও প্রতিপাদিত করেন। এ ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল- "অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই, চিকিৎসা চাই, নিবাস চাই। আর এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই একদিন আমি অবস্থার চাপে পড়ে 'প্রাউট' দর্শন তৈরী করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ যে মানুষটা খেতে পাচ্ছে না, আগে তাকে অন্ন দোব, তারপর তাকে শেখাবো অধ্যাত্ম দর্শন। তারপর তাকে সাধনায় বসাবো। তাকে সাধনাতেই বসাবো কিন্তু আগে তার পেট ভরাবার ব্যবস্থা করতে হবে তো। শীতের সময় তার বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে

সূচীপত্র

হবে। অসুখ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলো প্রাথমিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন-পূর্তি না হলে কখনো সামগ্রিকভাবে মানুষ জাতির উন্নতি সম্ভব নয়।”

১৯৫৫ সাল থেকেই তিনি প্রথম দিককার কয়েকটি প্রবচনে তাঁর সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ব্যক্ত করা শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে প্রদত্ত এক প্রবচনমালায় দু'টি বিশেষ প্রবচনের মধ্যে একটিতে ("Cosmic Broth- erhood" Idea and Ideology) প্রথম তিনি প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব তথা Progressive Utilization Theory-র নাম ও এই তত্ত্বের পাঁচটি মূলীভূত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। তাই ধরা হয় যে এটাই জনসমক্ষে প্রাউটের প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর ১৯৬১ সালে তিনি "আনন্দসূত্রম” পুস্তকে (পঞ্চম অধ্যায়) ভাবার্থ সহ ষোলটি সূত্রে এই প্রাউটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিককে উপস্থাপিত করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রায় ১৭০টি প্রবচনে প্রত্যক্ষভাবে তথা আরও কয়েকটি প্রবচনে আংশিকভাবে এই প্রাউট ভাবধারার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। এ ব্যাপারে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা নিম্নরূপ- 'কৃষিবিপ্লব'; 'সুসামঞ্জস্য অর্থনীতি'; 'অর্থনীতির চারটি ধারা'; 'ব্লক ভিত্তিক' ও 'আন্তর্রক পরিকল্পনা'; 'অর্থনৈতিক

বিকেন্দ্রীকরণ', 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র'; 'শূদ্রবিপ্লব ও সদ্বিপ সমাজ'; 'শাসনব্যবস্থার কয়েকটি রূপ'; 'আদর্শ সংবিধানের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ'; 'নিউক্লিয়ার রেভেলিউশন'।

প্রাউট সংক্রান্ত প্রবচনগুলি প্রথমে তাঁর সুবিশাল পুস্তকসম্ভারে বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। ১৯৮৭ সালে তাঁর নির্দেশে "কণিকায় প্রাউট" নামক গ্রন্থমালায় সেই প্রবচনগুলি সংগ্রথিত করা শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে "কণিকায় প্রাউট"-এর চতুর্দশ খণ্ড পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে প্রকাশিত হয়ে যায়। এরপর নভেম্বর ১৯৮৮ থেকে শুরু করে অক্টোবর ১৯৯১ পর্যন্ত "Prout In a Nutshell"-এর পঞ্চদশ খণ্ড থেকে একবিংশ খণ্ড পর্যন্ত আরও সাতটি খণ্ড ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়।

"কণিকায় প্রাউট" প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডগুলিতে পনেরটি প্রবচনের মধ্যে অধিকাংশ প্রবচনগুলি ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ সময়কালের। এই প্রবচনগুলি সুভাষিত সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), মানুষের সমাজ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), আজকের সমস্যা, দেশপ্রেমিকদের প্রতি, তাত্ত্বিক প্রবেশিক, Idea and Ideology বইগুলি থেকে গৃহীত। "দেশ প্রেমিকদের প্রতি"

ও "প্রাউটের মৌল নীতিগুলি" যথাক্রমে ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালের।

"বিভিন্ন মতবাদ", "সামাজিক মনস্তত্ত্ব", "সমাজচক্রে সদ্বিপ্রের স্থান", "বিশ্বভ্রাতৃত্ব" ও "প্রাউটের ওপর কয়েকটি প্রবচন"-গুলি মূল ইংরেজী থেকে পূর্বেই ৰাংলায় অনূদিত হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, "কণিকায় প্রাউট"-এর প্রথম খণ্ড থেকে চতুর্দশ খণ্ডগুলি প্রথম ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই সব খণ্ডগুলি নিঃশেষিত হয়ে যায়। এর ফলে দীর্ঘদিন থেকেই পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ বইগুলির পুনর্মুদ্রণের অনুরোধ করছিলেন। তাঁদের সেই অনুরোধের কথা ভেবেই খণ্ডগুলি পরিমার্জিত করে পুনঃপ্রকাশ করার জন্য আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রয়াস শুরু হয়। সেই প্রয়াসের ফলশ্রুতি স্বরূপ "কণিকায় প্রাউট" প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডগুলি একত্রে ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়। আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবার পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। বাকী খণ্ডগুলিও যথাশীঘ্র তাঁদের হাতে তুলে দেবার জন্যে আমাদের প্রয়াস চলতে থাকবে।

লেখকের সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল, ভাষাবিজ্ঞান তথা-শুদ্ধ বানান-বিধির স্বার্থে বর্গীয় 'ৰ' ও অন্তঃস্থ 'ব'-এর ব্যবহার

বাংলায় থাকাই উচিত। তাই পুস্তকে এই দুটি 'ব'-এর যথোপযুক্ত ব্যবহার করা হয়েছে। পুস্তকের যেখানে প্রথম বন্ধনীর চিহ্ন আছে তা লেখকের বক্তব্য বলেই ধরতে হবে। আর যে সব শব্দ বা বাক্যাংশ তৃতীয় ৰন্ধনীর মধ্যে আছে সেগুলি হ'ল পাঠকের সুবিধার্থে সম্পাদকীয় সংযোজনা।

আজ বিশ্বজুড়ে বঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতিত ও অত্যাচারিত মানুষ সামাজিক- অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে যে নবতর সংগ্রাম শুরু করেছেন তাঁদের ও সমস্ত চিন্তাশীল মানুষদের কিছুমাত্র প্রয়োজন যদি সংসাধিত হয় এই পুস্তকের মাধ্যমে, তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

আচার্য পীযূষানন্দ অবধূত

১লা জানুয়ারী, ২০১৫

-

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল:

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ
a á i ii u ú r rr lr lrr e ae o ao aṁ ah

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ
ka kha ga gha uṇa ca cha ja jha iṇa

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
ta tha da dha na ta tha da dha na

সূচীপত্র

প ফ ৰ ভ ম

প ফ ব ভ ম

Pa pha ba bha ma

য ৱ ল ৱ

য র ল ৱ

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

শ ষ স হ ক্ষ

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোঽহং

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোঽহং

aṇ jiṇa rśi cháyá jiṇána samśkrta tato’haṁ

সূচীপত্র

a á b c d ḍ e g h i j k l m ṁ
n ṅ ṇ o p r s ś t ṭ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f, q, qh, z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে, সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ:

ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
ক়্	খ়্	জ়্	ড়্	ঢ়্	ফ়্	য়্	ল়্	ত্	অঁ
qua	qhua	za	ŕ	ŕha	fa	ya	lra	t	aṉ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পঞ্চম খণ্ড

১। ক্ষত্রিয় যুগ ২। বিপ্র যুগ ৩। বৈশ্য যুগ

ষষ্ঠ খণ্ড

৪। শূদ্র বিপ্লব ও সদবিপ্র সমাজ ৫। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ

৬। দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকতাবাদ ও গণতন্ত্র।

৭। সভ্যতার ভবিষ্যৎ ৮। মানব প্রগতি

৯। সভ্যতা, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক প্রগতি,

১০। জাতি, ভাষা, ধর্মমত ও সংস্কৃতিতে বিশ্বজনীনতা.

১১। সৈদ্ধান্তিক তত্ত্ব ও প্রয়োগভৌমিক তত্ত্ব.

১২। প্রগতি ও পঞ্চবেদনা

১৩। প্রাণ ধর্ম...

১৪। কয়েকটি প্রশ্নোত্তর,

সপ্তম খণ্ড

১৫। বিশ্ব জুড়ে এক জাতি আছে

১৬। মানুষের সমাজ এক ও অবিভাজ্য-১

১৭। মানুষের সমাজ এক ও অবিভাজ্য-২.

সূচীপত্র

১৮। কৃষি বিপ্লব ১৯। সামাজিক মূল্য ও মানবিক মৌল নীতি

২০। এ্যাটম বোম কি মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতেপারে?

২১। গতি ও স্থিতি

অষ্টম খণ্ড

২২। সংস্কৃতি ও সভ্যতা ২৩। পাপস্য কারণত্রয়ম্

২৪। শোষণ করা চলবে না

২৫। মানব সভ্যতার ক্রমঃবিকাশ

২৬। ইতিহাস কেমন হওয়া উচিত

২৭। নোতুন করে ইতিহাস লেখা হোক

২৮। জড়তার মুক্তি ২৯। সম-সমাজ তত্ত্ব

৩০। শোষণ ও অসংস্কৃতি ৩১। মেকী মানবতাবাদ

৩২। নোতুন প্রজন্মের পাথেয়।

৩৩। নব্যমানবতাই শেষ আশ্রয়

পঞ্চম খণ্ড

সূচীপত্র

মানুষের সমাজ

ক্ষত্রিয় যুগ

ব্যষ্টি মানসের তরঙ্গ যেখানে জড়ের তরঙ্গের সঙ্গে তাল রেখে চলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাকে আত্মসাৎ করৰার চেষ্টা করছে না, সে ক্ষেত্রে তার এই তাল রেখে চলবার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যষ্টি-মানসকেও জড়-ভাবাত্মক করে দেয়। জড়-ভাবের ভাবুক এই ব্যষ্টি-মানস-স্বভাবতঃই যাতে তমোগুণী অন্ধকার বেশী- তাকে ৰলি শূদ্র; আর যে সকল মানুষ এই শূদ্র-ভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তাদেরই সমষ্টিগত নাম "শূদ্র-সমাজ"। ৰলা ৰাহুল্য মাত্র, এদের দ্বারা কোনো কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়; কারণ স্থূলতম তরঙ্গ জড়-তরঙ্গই এদের নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ-জাতের ভ্রূণাবস্থায় যখন পশু- ভাব থেকে মানুষ-ভাব গড়ে উঠেছিল, তখন ঠিক আজকের মানুষের মতই তারাও তাদের সামনে দু'টো পথই দেখেছিল। একটা জড়ের ভাবনায় জড় হ'য়ে যাবার পথ বা শূদ্রত্বের পথ আর অপরটি সূক্ষ্মত্বের ভাবনায় জড় তথা

মানসসত্তাসমূহকে জয় করবার পথ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্বের পথ। সেদিনের প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিবেশের মধ্যে জড়ের ভাবনায় তাদি'কে এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে, শুরুর দিকে তাদের সকলকেই শূদ্র-ভাবের ভাবনায় লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। পারস্পরিক স্বার্থৰোধে কিছুটা সমাজৰদ্ধ ভাব দেখা দিলেও সামাজিক কাঠামো তারা তৈরী করতে পারেনি, ও মোটামুটি বিচারে তাদের সমাজ বলতে বোঝাত ব্যষ্টি বিশেষের নিজের শরীর আর শরীরের ভোগোপাদান সম্বন্ধিত পত্নী, কিছুটা পরিমাণে পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য অত্যন্ত নিকটভাবে সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন। দাম্পত্যসম্পর্কেও সম্পূর্ণ ভাবে ভোগ্য-ভোক্তার সম্পর্ক থাকায় তাতে কোনো দায়িত্ব বা মানবিকতা ছিলনা।

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষজাতের মধ্যে এই শূদ্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে সর্বত্রই বা সকল সমাজগোষ্ঠীতেই র'য়েছে। যে সকল জীব- জন্তুতে ভোগবৃত্তি অতি প্রৰল, শূদ্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষেরাও তাদেরই পর্যায়ে পড়ে। অতিরিক্ত ভোগ-বৃত্তির জন্যে শক্তিশালী পুরুষ মাত্রেই ৰহুপত্নীক হ'ত ও যৌবন হারাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হয় নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হ'ত, অথবা সৰলতর পুরুষের হাতে মৃত্যুকে বরণ করতে

হ'ত। তাদের সাহিত্য বা শিল্প বলতে যা কিছু তা অবশ্যই উন্নত সংবেদনের পরিচয় বহন করত না, সেগুলো ছিল নিছক জড়-ভোগী মানুষের লালসারই অভিপ্রকাশ। এই শূদ্র-সমাজের মানুষ দেহগত সম্পর্ক থাকায় সন্তানের প্রতি কিছুটা মমত্ববোধ রাখত, কিন্তু সন্তানের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে শূদ্র-মানসের স্বার্থ-সংঘাত ঘটায় তাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক থাকত না। তাই সন্তানের প্রতি পিতামাতার সাময়িক মমত্ববোধ থাকলেও, পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনের প্রতি সন্তানের কর্তব্য বোধ জাগতে পারতো না। মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য-বোধ জিনিসটার অভাব থাকায়, সমাজ-জীবন তো ছিলই না, বরং মানুষের সান্নিধ্যও অধিকাংশ সময়ে মানুষের কাছে ক্লেশদায়ক হয়ে উঠত। বস্তুতই তথাকথিত শূদ্রসমাজ আসলে আজকের দিনের কুকুর বা বানর- সমাজের চেয়ে খুব সামান্য শ্রেষ্ঠতাই দাবী করতে পারতো।

সোজা কথায় বলতে গেলে শূদ্রমাত্রেই উদর-উপস্থজীবী। আদর্শের কোন বালাই তাদের নেই, যুক্তির কোন দামও নেই। কালের যে তিনটি শাখা- ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর মধ্যে শূদ্রের কাছে আছে কেবল বর্তমান। ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার অবকাশ বা ইচ্ছা তাদের থাকে না। ধার্মিকতা,

আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক সুব্যবস্থা–এগুলির কোনটিই তাদের কাছে কোন লৌকিক মূল্য বহন করে না। তবু শূদ্র সমাজে যে তথাকথিত ধার্মিকতা বা সামাজিক ব্যবস্থার আভাস দেখা যায়, সেটা তাদের দুর্বল মানসিকতাপ্রসূত ভীতম্মন্যতা ও পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার একধরণের অপবিত্র চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রায় পশুর মতই যে শূদ্র সে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুঃখের অন্ধকার, সুখের ঊষা, অগ্নিজিহ্বা মরুভূমি এগুলির প্রত্যেকটিকেই ভয়ের দৃষ্টিতে অথবা ভয়নিমুক্তির দৃষ্টিতে দেখেছিল ও দেখে থাকে। তাদের এই ধরণের ভীতম্মন্যতাই প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। এক অখণ্ড ব্রহ্মবাদের প্রেরণায় নয়, ছোট বড় সুবিধা–অসুবিধা তথা ভয়ভীতির মানসিকতাই তাদের গাছকে, অরণ্যকে, পাহাড়কে, সমুদ্রকে দেবতা রূপে পূজা করতে শিখিয়ে ছিল। তাই এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় শূদ্রের সমাজ–ব্যবস্থা ছিল নিছক ভয়–প্রসূত।

শূদ্রের সমাজ–ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কথা হ'ল–যে বেঁচে আছে তাকে আরো ভাল ভাবে বাঁচতে দাও, আর যে আধমরা তার মরণকে ত্বরান্বিত করে দাও। মুমূর্ষুকে বাঁচাৰার চেষ্টায় শক্তির অপচয় করো না। এই ধরণের মনোবৃত্তির ফলে একটা

বিশেষ প্রকারের স্বার্থপর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে যা আসলে সমাজও নয়, ব্যবস্থাও নয়। শূদ্র সেই ততটুকুই গড়েছিল ও গড়ে চলেছে।

নিষ্করুণ প্রকৃতির মত শূদ্র-সমাজেরও মূল কথা হ'ল survival of the fittest। দুর্বলের প্রতি যেখানে কোন মমতা নেই, কোন করুণা নেই, তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কোন সামাজিক প্রচেষ্টা নেই। বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কোন দায়িত্ব নেই। তাই এই শূদ্র-সমাজে অজস্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে মানুষ কোনক্রমে দিনগুলো হয়ত কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সামূহিক জীবনের সুখ, সকলের ভাবনার উদারতা সেখানে দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

শূদ্র ঘুমিয়ে থাকে। শূদ্রকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে অন্যে তাদের থেকে কিছু কাজ আদায় করে নেয়। কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শূদ্র আবার ঘুমিয়ে পড়ে। চাতুর্বর্ণক সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচাবার জন্যে শূদ্রকে দিয়ে কিছুটা কাজ করাতেই হয়। বৈশ্যের নৃশংস লোলুপতার হাত থেকে শূদ্রকে (শূদ্র বিপ্লবের প্রাকমুহূর্তে অবৈশ্য মাত্রেই শূদ্রত্বে পর্যবসিত হয়ে যায়) বাঁচাবার জন্য, তাদের মধ্যে চেতনা আনতে হবে। কিন্তু প্রকৃত

পক্ষে চেতনা বলতে যা বুঝি শূদ্রের মধ্যে তা আসা কি সম্ভব? শূদ্রকে যারা খাটিয়ে নেয়, শূদ্রকে যারা সাময়িক ভাবে বিপ্লবে উজ্জীবিত করে তারা ক্ষত্রিয়। তারা শূদ্রকে যেটুকু বা যতটুকু ও যেমন ভাবে কাজ করতে বলে, শূদ্র যন্ত্রবৎ তাদের আদেশ প্রতিপালন করে মাত্র। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সাধুতা অসাধুতা দুই- ই থাকে। এই অসাধুরাই দলে ভারী। আর তাই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লবে ক্ষত্রিয়-পরিচালিত শূদ্র পতঙ্গবৎ বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আগুনে তাদের পাখাই পোড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শূদ্রকে চরম ভাবে ঠকিয়ে নাম-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তি সবকিছু ক্ষত্রিয়ই লুটে নেয়। মূর্খ ও প্রতারিত শূদ্রদের মন ভোলাবার জন্যে কেবল তারা মুখে শূদ্রের জয় জয়কার ঘোষণা করে। এই ফাঁকা জয়ধ্বনি শূদ্রকে তার পরাজয়ের কথা ভুলিয়ে রাখে। বিপ্লবোত্তর কালে সৰক্ষেত্রেই তাই শূদ্র নিজের লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখার চেষ্টা না করে প্রতারক ক্ষত্রিয়ের পতাকা বাহকের কাজকেই জীবনের শ্রেয় রূপে গণ্য করে।

ব্যষ্টিমানস যেখানে ভোগের দুর্দান্ত কামনা নিয়ে ছুটে চলেছে কিন্তু জড়ের সে গোলাম হতে চায়নি, জড়কে সে আত্মসাৎ করতে চেয়েছে, জড়-তরঙ্গকে সে মানস-তরঙ্গের

দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। তার হাতে পড়ে জড় তাকে সেবাই দিয়ে যায়। এই জড়কে নিজের ইচ্ছায় পরিচালনা করবার অধিকার যার এসেছে, সেই সতত যুধ্যমান ব্যষ্টিমানসকেই বলা হয় ক্ষত্রিয়। তাই সংগ্রামই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। দুর্দমনীয় প্রাণ-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ ক্ষত্রিয় তাই অন্ধকারের কৃষ্ণত্বের প্রতীক নয়, সে তেজস্বিতার প্রতিনিধি, রক্তবর্ণই তার বর্ণ। শূদ্র পাহাড়ের বিরাটত্বের কাছে থমকে দাঁড়ায়, অভ্রস্পর্শী পর্বত তার কাছে দেবতা, তার সামনে সে মাথা নোয়ায়। ক্ষত্রিয়কে পর্বতারোহণে প্রতিনিবৃত্ত করবার অনুরোধ জানিয়ে বলে ওতে দেবতা রুষ্ট হৰে, ও কাজ কোর না। ক্ষত্রিয় এগিয়ে যায়। পর্বত-শিখরকে নিজের পদতলে রেখে সে বলে আমি পর্বতকে জয় করেছি। নিজের মানস-তরঙ্গের সাহায্যে, বুদ্ধিৰলে জড়শক্তি থেকে ডিনামাইট উদ্ভাবন করে পাহাড়কে উড়িয়ে দিয়ে সে তার চলার পথ করে নেয়, জড়কে নিজের দাসে পরিণত করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।

ক্ষত্রিয়-বৃত্তি সম্পন্ন মানুষদের মিলিত নামই ক্ষত্রিয় সমাজ। এদের সমস্ত সামর্থ্যই জড়কে নিয়ন্ত্রণ করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। জড়ের অতিরিক্ত কোন কিছুকে এরা ভাৰতে পারে না, বুঝতে পারে না। এরা রক্ত দিয়ে সমাজকে

ৰাঁচায়, সমাজকে বাঁচাবার জন্য অন্যের রক্ত নেয়। মানুষ জাতির ভূণাবস্থায় অবস্থার চাপে পড়ে যারা প্রকৃতির দাসত্ব করেছিল তারা সকলেই ছিল শূদ্র, কিন্তু এই শূদ্রদের মধ্যে যারা প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত কঠোর রূপের সংস্পর্শে এসেছিল ৰাঁচৰার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়বার সামান্যতম প্রচেষ্টাও করেছিল, সেদিনের সেই পৃথিবীতে তারাই ছিল ক্ষাত্র পিতা। এদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে পরবর্তী কালে যে সকল শূদ্রের মধ্যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়বার নেশা পেয়ে বসেছিল তাদের দ্বারাই ক্ষত্রিয় সমাজের ধারা প্রবাহ এগিয়ে চলেছিল, আজও চলেছে, ভবিষ্যতেও চলবে। বস্তুতঃ মানুষ জাতির শ্রেষ্ঠতার বীজ শূদ্রের মধ্যে ছিল সুপ্ত, ক্ষত্রিয়ত্বে হয়েছিল তার অঙ্কুরোদ্গম। জড় ও চেতনকে জয় করার প্রচেষ্টার জন্যে জীব-সমাজে মানুষ আজ যে ৰৱমাল্য পেয়েছে তার আভাস ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই প্রথম ফুটে উঠেছিল। ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা, ক্ষত্রিয়ের পৌরুষ, শূদ্রকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দিয়েছিল। ভীরু জড়বুদ্ধি শূদ্র ক্ষত্রিয়ের সাহস ও তেজস্বিতার কাছে মাথা নুইয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছিল, আর ক্ষত্রিয় নিজের পৌরুষের দ্বারা শূদ্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে তাকে দিয়ে জড়ের বিরুদ্ধে যুধ্যমানতায় নিজের আজ্ঞাবহ

ভৃত্যের মত ৰেশ কিছু কাজ আদায় করে নিয়েছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে জড়কে জয় করবার জন্যে ক্ষত্রিয়ের যে প্রয়াস তাতে শূদ্রের ভূমিকা আছে ও সে ভূমিকা গৌণও নয়। তবু মুখ্যতা ক্ষত্রিয়ই পায় কারণ শূদ্র যা করে তা ক্ষত্রিয়ের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে।

শূদ্র যেদিন থেকে ক্ষত্রিয়ের আশ্রিত হ'ল সেদিন থেকে বলতে পারি মানুষ সমাজে ক্ষত্রিয় যুগের যাত্রারম্ভ। কিন্তু এই ক্ষত্রিয় যুগ রাতারাতি আসেনি। বহুধা বিচ্ছিন্ন শূদ্রসমাজ ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য মেনে নিয়ে ক্ষত্রিয়ের অধীনে থেকে একত্রিত হতে চলেছিল। অর্থাৎ বহু শূদ্র-সমবায়ে যে নূতনতর সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল তার মিলনের প্রতীক রূপে দাঁড়িয়েছিল এক একটি ক্ষত্রিয়। শূদ্র-মিলনের প্রতীকরূপে এই যে ক্ষত্রিয়কে গ্রহণ করা-এটা যে বিবর্তনের ফলে ঘটেছিল সেটাই ছিল মানবেতিহাসে প্রথম ক্রান্তি। এক একটি ক্ষত্রিয়-প্রতীকের অধীনে মানুষ-সমাজে গড়ে উঠল এক একটি গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর রক্তগত বিশুদ্ধি ও পরিচিতি যাতে ঠিক ভাবে জানা যায় তজ্জন্য সাহসী ও তেজস্বিনী নারীরাই গোড়ার দিকে গোষ্ঠীর মাতা বা গোষ্ঠী-জননী রূপে স্বীকৃতা হয়েছিল। গোষ্ঠীর প্রতিটি পুরুষ ও নারী সেই গোষ্ঠী জননীর

নাম অনুযায়ী নিজেদের বংশ-পরিচয় বহন করে চলত। পিতা-মাতা উভয়ই এক গোষ্ঠী ভুক্ত হওয়ায় স্বতন্ত্র ভাবে পিতৃ বা মাতৃ-পরিচয়ের মূল্য উপলব্ধ হয়নি। একটি গোষ্ঠী-জননীর মৃত্যুর পর নূতন গোষ্ঠী-জননী নির্বাচনের কালেই, ধারা-প্রবাহ অনুযায়ী এক গোষ্ঠীকে একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করার সময়েই কেবল মাতৃ পরিচয় নির্ধারণের প্রয়োজন ঘটত অর্থাৎ গোড়ার দিককার ক্ষত্রিয়-সমাজ ছিল মাতৃ-শাসিত সমাজ। ক্ষাত্র যুগের এই গোষ্ঠী-ব্যবস্থাই হয়েছিল সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন।

এই ক্ষাত্রযুগে চলেছিল গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্তির সংগ্রাম, তাই ক্ষাত্র সমাজ-ব্যবস্থায় শূদ্রের চাইতেও গোষ্ঠী-প্রীতি বেশী করে দেখা দিয়েছিল, আর ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা, ক্ষত্রিয়ের অহমিকা কেৰল জড় স্বার্থ-বুদ্ধিতেই মানুষকে একত্রিত করে সমাজ গড়তে প্রেরণা জোগায়নি, মর্যাদা-ৰোধ তথা sentiment-ও এই ক্ষাত্র গোষ্ঠীগুলির দৃঢ়তা সাধনে খুব বেশী পরিমাণে কাজ করেছিল অর্থাৎ বাঁচার সংগ্রামটা মুখ্য হলেও ইজ্জতের সংগ্রামটাও গৌণ ছিল না। ক্ষাত্র যুগের এই sentiment বা মর্যাদাৰোধ জড়কে জয় করার

কাজে মানুষ-জাতকে প্রভূত পরিমাণে প্রেরণা যুগিয়েছিল- আজও যুগিয়ে চলেছে।

শূদ্র লড়েছে নিছক ৰাঁচৰার প্রয়াসে, আর ক্ষত্রিয় চেয়েছে বাঁচতে, বাঁচাতে ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। শূদ্রের লক্ষ্য ছিল যেন তেন প্রকারেণ নিজের আহার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আর ক্ষত্রিয়ের লক্ষ্য ছিল সসম্মানে জয় লাভ করা। ক্ষত্রিয়ের এই মর্যাদাৰোধ তার মধ্যে সূক্ষ্মতর মনীষার উদ্বোধন ঘটিয়েছিল, জাগিয়েছিল বিবেক, জাগিয়েছিল বিচারশীলতা। নিরস্ত্রকে হত্যা করা, নারী, শিশু, বৃদ্ধকে হত্যা করা, আত্মসমর্পণকারীকে হত্যা করা, পলায়নপরকে হত্যা করা ক্ষত্রিয়ের বিবেক বুদ্ধি সমর্থন করতে পারেনি। এক কথায় বলতে গেলে ক্ষত্রিয়ের পৌরুষ পশুর স্তর কাটিয়ে উঠে মানুষের মূল্য বুঝতেও শিখেছিল। তাই এই মূল্যৰোধই দাম্পত্য তথা পারিবারিক জীবনকে অনেকখানি মানবীয় স্তরে তুলে দিয়েছিল। দাম্পত্য সম্পর্ক ভোগ্য- ভোক্তার স্তরে সীমিত না থেকে কতকটা কর্তব্য ৰোধের স্পর্শও পেয়েছিল। দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার সাথে সাথে সন্তানের প্রতি পিতার কর্তব্যৰোধ জেগে ওঠার ফলে এই কাজে মাতার দায়িত্ব যখনই কিছুটা হ্রাস পেল তখনই নারী গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে

আংশিক ভাবে, বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় ও সদ্যপ্রসূতাবস্থায় পুরুষের অধীনা হয়ে পড়ল ও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থেকেও একটি দম্পতি-এক একটি পুরুষ-প্রধান পরিবারে গড়ে উঠতে লাগল। পরিবারগুলি পুরুষ-প্রধান হওয়ায় সামাজিক ভাবে গোষ্ঠীতেও ধীরে ধীরে পুরুষ-প্রাধান্য দেখা দিতে লাগল ও গোষ্ঠী মাতারা তাদের পূর্বেকার প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলল।

প্রাচীন কালের এই ক্ষত্রিয়-প্রধান সমাজে নর ও নারী স্বামী-স্ত্রী রূপে পরিচিত হতে আরম্ভ করল; যদিও তাদের সে সম্পর্কের মধ্যে কঠোর ৰন্ধন ছিল না। সমাজ পুরুষ-প্রধান হয়ে যাওয়ায় শূদ্র যুগের মত ক্ষাত্র যুগের শেষার্দ্ধেও পুরুষেরা বহু পত্নী রাখত। তবে শূদ্র-যুগের থেকে এ যুগের বহু-পত্নীকত্বে তফাৎ এতটুকুই ছিল যে, শূদ্রযুগ্রে পত্নীদের, পতিদের সঙ্গে কোন সামাজিক সম্পর্ক ছিল না আর ক্ষত্রিয় যুগের উত্তরার্দ্ধে পতি-পত্নীরা পারস্পরিক পরিচিতি বহন করত। ক্ষত্রিয় যুগের প্রথমার্দ্ধে যে সমাজ ব্যবস্থার গোড়া পত্তন হয়েছিল উত্তরার্দ্ধে তা আরও কতকটা দৃঢ় নিৰদ্ধ হলেও বিশুদ্ধ মানবিকতা বা শৃঙ্খলাৰোধের চাইতেও সে যুগে দাম্পত্য সম্পর্ক তথা গোষ্ঠী সম্পর্কের স্থায়িত্ব, গোষ্ঠী পিতাদের বা

পুরুষদের শারীরিক সামর্থ্য বা বীরত্বের ওপরেই নির্ভর করত। এই ক্ষত্রিয় যুগের শ্লোগান ছিল 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'।

মানুষ সংবেদনশীল জীব। সন্তানের প্রতি পিতা মাতার মমতা বোধের সাথে সাথে দায়িত্ব ৰোধও জেগে ওঠায় ক্ষাত্রযুগের উত্তরার্দ্ধে পিতা মাতার প্রতি সন্তানেরও কর্তব্যৰোধ কিছুটা জেগেছিল বৈ কি! এই কর্তব্য ৰোধে উদ্বুদ্ধ সন্তানেরা পিতার বীরত্ব, পিতার ঐতিহ্য তথা মর্যাদা রক্ষায়ও যত্নবান হয়ে উঠেছিল আর তাই পিতাও চাইত সন্তান বীরত্বের, পৌরুষের তথা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হোক। এই ভাবে জনকের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক যতই নিবিড়তর হতে থাকল, ততই সমাজে দৃঢ়নিৰদ্ধ ভাবও আসতে থাকল। বংশের বীরত্ব তথা ঐতিহ্যকে যথার্থ ভাবে রক্ষার জন্য বিবাহ কালেও উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দিল ও তারই ফলে ক্ষত্রিয়যুগে পুরুষ-নারীর অননুমোদিত সম্পর্কের পরিবর্তে ধীরে ধীরে একটা সমাজ- স্বীকৃত দাম্পত্য সম্পর্কের উদ্ভব হয়েছিল।

ক্ষাত্র সংস্কৃতি-সঙ্গীত, নৃত্য ও শিল্প-কলা যে ক্ষাত্র-সংবেদনেরই বাহকতা করত তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। জড় ভোগ-লালসার অভিব্যক্তির পরিবর্তে তাই

ক্ষাত্র শিল্পে বিশ্বকে জয় করবার দুরন্ত প্রয়াসই ফুটে উঠে ছিল। এই সংগ্রামী ক্ষাত্র সমাজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুঝবার জন্যে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্নটাকে সব সময়ই বড় করে দেখত। তাই পৌরুষদীপ্ত অথচ অমার্জিত-রুচি আদিম পৃথিবীর ক্ষত্রিয় নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতীক রূপে লিঙ্গ পূজার উদ্ভাবন করেছিল। আমেরিকায় মায়া সভ্যতা, ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতা, তথা বিশেষ ধরণের তন্ত্রীয় অনুষ্ঠান এই সুপ্রাচীন ক্ষাত্র মনোভাবকেই বহন করত। যোনি পীঠে শিব-লিঙ্গের পূজা আজ যে ধরণের দার্শনিক ব্যাখ্যাতেই ব্যাখ্যাত হোক না কেন তা আসলে প্রাচীন ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা ৰাড়ানোর মনোভাবেরই দ্যোতক।

ক্ষাত্র সমাজের যিনি গোষ্ঠী পিতা বা গণপতি (গণেশ) ছিলেন সে যুগে তিনি সমাজে দেবতারূপে পূজিত হতেন, সর্বশ্রেষ্ঠ জীব রূপে স্বীকৃত হস্তীর মুণ্ডই এই গণপতির পূজায় বিগ্রহের মুণ্ডরূপে ব্যবহার করা হ'ত। বস্তুতঃ এই গণপতিও (গণেশ) পরবর্তী কালে দার্শনিক ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হয়ে একটি দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছিল। বর্তমান যুগেও অর্থাৎ আজকের এই বৈশ্য প্রধান সমাজেও লিঙ্গ পূজা ও গণপতি পূজা উভয়েরই প্রচলন রয়েছে। কিন্তু এই পূজার পশ্চাতে যে

আদিম ক্ষাত্র সামাজিকতা লুকিয়ে রয়েছে অনেকেই তা জানতে চান না বা জেনেও ভুলে থাকতে চান। আজকের কোন দার্শনিক হয়ত বলবে যে "যস্মিন সর্বাণি লীয়ন্তে তল্লিঙ্গম্" অথবা "লিঙ্গতে গম্যতে যস্মাত্তল্লিঙ্গম্" অর্থাৎ সবকিছুই যাতে লয় প্রাপ্ত হয় তারই নাম লিঙ্গ, অর্থাৎ লিঙ্গ পূজার অর্থ পরমপুরুষের উপাসনা। কিন্তু এ ব্যাখ্যা যে গ্রহণের অযোগ্য তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই যে পরমপুরুষের কোন আধার হয় না কিন্তু এদের যে সাকার লিঙ্গ পূজা তা সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রতীকের স্বপক্ষেই রায় দেয়। গণপতিও ধীরে ধীরে একটি শাস্ত্রীয় দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছে। পুরাণকার তার পিতা-মাতারও সন্ধান দিয়েছেন ও দার্শনিক ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত লিঙ্গ-পূজা যে শিব ঠাকুরের নামে হয়ে চলেছে গণপতিকে সেই শিবঠাকুরের পুত্র করে দিয়েছে।

এতদুভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানেরও চেষ্টা রয়েছে অর্থাৎ ক্ষাত্র যুগের প্রাচীন সংবেদনকে বিপ্রের বৌদ্ধিকতার রঙে রাঙিয়ে দিয়ে নূতন ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঠিক উদর-উপস্থ-জীবী বলতে যা বোঝায় ক্ষত্রিয় তা নয়। তার উদর- উপস্থপরায়ণতা আদর্শের সঙ্গে প্রায় সমান মূল্যই বহন করে। কোথাও বা কিছুটা বেশী, কোথাও বা

কিছুটা কম। মানুষ জাতের পুরাণো অথবা নূতন যে কোন ইতিহাসের পাতা ওলটালেই দেখতে পাই যে ক্ষাত্রস্বভাবের মানুষ হাসতে হাসতে মরেছে, ফাঁসিতে গলা লটকে দিয়েছে, বন্দুকের সামনে ছাতি ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, অথবা চরম পরাজয়ের গ্লানি বহন করবার পূর্বেই নিজেই নিজের বুকে গুলি চালিয়ে অমর্যাদার সম্ভাব্য অবস্থা থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছে। শূদ্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষেরা গুণতিতে ধরা পড়ে না, ক্ষাত্র বৃত্তি সম্পন্ন মানুষেরা, বিশেষ করে যাদের মধ্যে ক্ষাত্র বৃত্তি উগ্রভাবে ছিল বা রয়েছে তারা কখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে না, স্বেচ্ছায় হোক অস্বেচ্ছায় হোক প্রকট তাদের হতেই হয়।

বৈদিক যুগ, মহাভারতের যুগ, প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন মিশর অথবা বর্তমানের প্রাগ্রসর বা অনগ্রসর সকল মানব গোষ্ঠীতেই এই ক্ষত্রিয়দের জয়গাথা আজও কীর্তিত হয়ে চলেছে। যারা তাদের ভাল বেসেছে তারা তো তাদের কথা ৰলেছেই, যারা ভালৰাসেনি, যারা নীতিগত কারণে তাদের ঘোর বিরোধিতা করেছে তারাও তাদের বীরত্বের ও বাহাদুরির পঞ্চমুখে প্রশংসা করে চলেছে।

ইংলণ্ডের অধিবাসীরাও নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বীরত্বের প্রশংসা করে। ফ্রান্সের অধিবাসীরাও হিটলারের পৌরুষকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতীয় রাজনীতিতে যারা দক্ষিণপন্থী তারাও প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, রাসবিহারী, সুভাষের বীরত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। যারা কেবল উদর-উপস্থ-জীবী অন্যের সাথে কেবল তাদের স্বার্থেরই সংঘাত হয়। অন্যের কাছে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের কোন যোগ্যতাই তাদের থাকে না। পৃথিবীতে কোটি কোটি উদর-উপস্থ-জীবী মানুষ রয়েছে, তারা জন্মায়, তারা খায়, তারা বংশ রক্ষা করে, তারা নিজের স্বার্থে সন্তান প্রতিপালন করে, তারা ভোগের দৃষ্টিতে প্রতিটি বস্তুকে দেখে, লোভের দৃষ্টি নিয়ে সৰাইকার কাছে ছুটে যায়। তাদের অতীতও অন্ধকার, ভবিষ্যৎও অন্ধকার আর বর্তমানের আলোককে তারা ক্ষুদ্র স্বার্থের কালিমায় ঢেকে অন্ধকার করে দেয়-তারাই শূদ্র। তারা অজান্তে এসে অজান্তে চলে যায়। অজান্তেই জীবনের ভার বহন করে বেড়ায়। মানুষের সামগ্রিক সত্তার কাছে এদের জন্মানো, থাকা ও মরা কোনটারই এমন কিছু দাম নেই। তারা নিজেদের কর্মের দ্বারা মানুষ জাতির মধ্যে কোন স্পন্দন জাগিয়ে দিতে পারে না। তারা তাদের বজ্রনির্ঘোষে ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে পারে না, তারা পৃথিবীতে

থাকে বটে, কিন্তু যাবার সময় পৃথিবীর বুকে কোন দাগ রেখে যেতে পারে না। এই কাজগুলো যারা পারে তারাই ক্ষত্রিয়। এদের অস্তিত্ব মানবেতিহাসে ছোটই হোক আর বড়ই হোক একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেই। এ আলোড়ন দেখেই ধরে নিতে হয় কৰে কোন ক্ষত্রিয় পৃথিবীতে এসেছিল। উদর-উপস্থ-জীবী শূদ্রদের কাছে তাই ক্ষত্রিয় দেবতা-তুল্য আর তাই সামাজিক ক্রান্তির সাথে অতি সহজেই আদিম পৃথিবীতে ক্ষাত্র যুগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

কালের তিনটি শাখা-ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। এর মধ্যে ক্ষত্রিয়ের কাছে আছে অতীত ও বর্তমান। ভবিষ্যৎ নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। আদর্শের প্রেরণায় ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়েই সে অগ্নির লেলিহান শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, উত্তুঙ্গ পর্বত শিখর থেকে লাফিয়ে পড়ে, রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহের পিছনে ছুটে যায়। সে কেবল চায় জয় করতে, জয়ী হতে, বেঁচে থাকতে নয়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কাছে অতীতও আছে। ঐতিহ্যকেও সে ভুলতে চায় না। অতীতের প্রেরণাই তাকে ভবিষ্যৎ গতির দ্রুতি নির্ধারণে সাহায্য করে। জনগোষ্ঠীর বা পূর্বপুরুষের বীরত্ব গাথা তাকে প্রেরণা যোগায়। পিতৃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে সে প্রবৃত্ত হয়।

তাই অতীতের ছোট- বড় প্রতিটি জিনিস খতিয়ে না দেখে তার কর্মধারা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

ধর্মের প্রকৃত অর্থ যাই হোক না কেন, চিত্তের উদারতা থাকায়, সেই উদারতা ভিত্তিক একটা ধর্মাচরণ ক্ষত্রিয়ের থাকে। সে যেমন তার কল্পিত দেবতার কাছ থেকে চায় পুল্ল-কলত্র-বিত্ত-নাম-যশ, সে তার রুদ্রের কাছে চায় প্রচণ্ডতা, চণ্ডশক্তির কাছে চায় নির্মমতা, ঠিক তেমনি বিশ্বপ্রকৃতির কাছে আকুতি জানিয়ে বলে "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশোদেহি, দিশো জহি।" সে তার কল্পিত দেবতার কাছে থেকে যা চায় তা কেবল নিজের জন্যে চায় না, নিজে পেয়ে নিজের আশ্রিতদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতে চায়। কিন্তু বন্টনের অধিকারটা নিজের হাতে রাখতে চায়। বস্তুতঃ ক্ষত্রিয়ের যে ধার্মিকতা তা জড়াতীত কোন কিছু নয় অর্থাৎ তার ধার্মিকতা জড়কে প্রাপ্তির বা জড়কে জয় করবার প্রয়াসেই সীমিত। আর আধ্যাত্মিকতা ৰলতে যা বোঝায় অর্থাৎ আত্মিক প্রগতি সেটা তার বুদ্ধিতে সহজে ধরা পড়ে না। আত্মিক সাধনের সংঘর্ষের জন্যে যে উষ্চমানের প্রয়োজন, অতিরিক্ত মনশ্চাঞ্চল্যের জন্যে অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই তার কিছুটা অভাব থাকে।

সমাজ বলতে বুঝি, যে মানব-গোষ্ঠী এক সাথে চলেছে। সংগ্রামজীবী ক্ষত্রিয়ের কাছে একতা তথা দল বাঁধার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। দল বাঁধাই নয়, দলের মধ্যে একটা উচ্চমানের শৃঙ্খলা রক্ষা করার দরকার তার রয়েছে। এই দল বাঁধা ও দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করা এ দু'য়ের মধ্য দিয়েই সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। তাই ক্ষত্রিয়ের হাত না লাগলে সমাজ তৈরী হ'তে পারে না।

সমাজ রাখতে গেলেই রাখতে হয় শাসন, রাখতে হয় শাসনের জন্যে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা। শূদ্রের শাসন কেউ মানতে পারে না। ক্ষত্রিয় তার জড় শক্তিতেই প্রথম শাসন-ব্যবস্থা চালু করে। শূদ্রেরা ও দুর্বল ক্ষত্রিয়েরা সৰল ক্ষত্রিয়ের জড়শক্তির কাছে মাথা নত করে, গোষ্ঠী-পিতাকে রাজার আসনে বসায় ও এই রাজার মাধ্যমে শাসনের দ্বারা সমাজের যথা রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরী হতে থাকে।

ক্ষত্রিয়ের যে সমাজ-ব্যবস্থা তাতে শৃঙ্খলাৰোধের দিকেই বেশী নজর থাকে। সাধারণ মানুষের মন সে শৃঙ্খলাকে কী নজরে দেখলো অথবা সে ধরণের শৃঙ্খলায় মানুষ-সাধারণের বাস্তব লাভ কী হ'ল, ক্ষাত্র শাসনে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন থাকে না।

ক্ষাত্র-পিতার নির্বাচন শারীরিক শক্তি, অস্ত্রৰল ও মনোৰল দেখে করা হ'ত। তাই স্বভাবতই তার পুত্রদের মধ্যে অথবা তদাশ্রিত গোষ্ঠীর মধ্যে যে পুরুষ উক্ত গুণ-সমূহে গুণী হ'ত তারাই এক ক্ষাত্র-পিতার মৃত্যুর পর পরবর্তী ক্ষাত্র-পিতা রূপে স্বীকৃতি পেত। এই ক্ষাত্র-পিতা বা সর্দারের যুগ কালক্রমে রাজার যুগে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটা হয়েছিল মূলতঃ শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে। এক ক্ষাত্র-পিতার মৃত্যুর পরে তার পুত্রদের মধ্যে তথা আশ্রিত গোষ্ঠীর যুবকদের মদ্যে উগ্রভাবে ক্ষমতার সংগ্রাম দেখা দিত। এই সংগ্রামে, যখন নূতন ক্ষাত্র-পিতা নির্বাচিত হ'ত তখন দেখা যেত যে, সংগ্রামের ফলে হয় সমগ্র গোষ্ঠীটি একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে অথবা একটি গোষ্ঠী একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। গোষ্ঠীকে এই বিভাজন ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য অধিকতর শৃঙ্খলা-ৰোধের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম এড়াবার জন্যে অধিকাংশ ক্ষাত্র-গোষ্ঠীতেই গোষ্ঠীপিতার পুত্রকে বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে পরবর্তী ক্ষাত্র পিতা রূপে স্বীকৃতি দেবার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। গোষ্ঠী-পিতার নির্বাচন ব্যবস্থা পুল্লগত, বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ-পুত্রগত হবার সাথে সাথে বলা যেতে পারে যে ক্ষাত্র-সমাজে

রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সাধারণতঃ রাজা বলতে যা বোঝায় গোড়ার দিকে রাজারা ঠিক সে ধরণের ছিল না। রাজত্ব প্রাপ্তি বংশানুক্রমিক ভাবে হবার ফলে অর্থাৎ রাজা ঠিক শারীরিক শক্তি, অস্ত্রশক্তি বা মানসিক শক্তির দ্বারা ক্ষাত্র পিতা বা রাজা রূপে স্বীকৃত না হওয়ার জন্যে তাকে কিছুটা সাধারণের মন যুগিয়ে চলতে হ'ত। এই মন যুগিয়ে চলাটা অবশ্যই স্থানীয় জনসাধারণের একতাৰোধ, বিচার ও ৰৌদ্ধিক মানের ওপর নির্ভর করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি যেমন ভারতের অধিকাংশ অংশে রাজা তার তাম্র-লিপিতে যখন কোন ব্যষ্টিকে কোন কিছু দান করতেন তখন প্রজাসাধারণের উদ্দেশ্যে লিখতেন যে, তোমরা আমার এই দান-ব্যবস্থাকে মেনে নেবে। কিন্তু ৰাঙলা দেশের দানপত্রগুলিতে লেখা হ'ত তোমরা আমার এই দান-ব্যবস্থাকে অনুমোদন কর। এই ধরণের ঘটনা থেকে এটাই মেনে নিতে হয় যে শেষোক্ত অঞ্চলের রাজা প্রজাদের মতিগতি বুঝে তাদের সাথে মানিয়ে নিয়ে চলার চেষ্টা করত ও ঠিক একনায়কত্বের ভাব নিয়ে কাজ করত না। ক্ষত্রিয়-সমাজে যখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল তারই ছত্র-ছায়ায় সমাজ-রচনার কাজও এগিয়ে চলতে লাগল। যেখানে দেরীতে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অথবা যেখানে অল্প

দিনের রাজতন্ত্রের পরেই গণতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেখানে মজবুত সামাজিক কাঠামো তৈরী হ'তে পারেনি।

পৃথিবীর যে দেশেই ঘন ঘন রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দিয়েছে অথবা রাজাদের রাজত্ব অল্পকাল স্থায়ী হয়েছে সেই সমস্ত দেশেই কঠোর রাষ্ট্রিক অনুশাসনের অভাবে দৃঢ়নিৰদ্ধ সমাজ ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি, সমাজ দেহে শৃঙ্খলার ভাবও ঠিকভাবে জেগে উঠতে পারেনি। অবশ্য এক্ষেত্রে রাজার রাজত্ব বলতে ক্ষাত্র-পিতার শাসনের কথাই বলতে চাইছি অর্থাৎ দীর্ঘ স্থায়ী ডিক্টেটারী শাসনও এ ব্যাপারে দীর্ঘ স্থায়ী রাজতন্ত্রেরই অনুরূপ জিনিস। ক্ষত্রিয়ের শৃঙ্খলাৰোধ সৈনিকের শৃঙ্খলাৰোধ ছাড়া আর কিছুই নয় অর্থাৎ সেখানে প্রাণ চাক বা না চাক, মন চাক বা না চাক, শত্রু যাতে দূর্গ ভেদ করতে না পারে তজ্জন্য কতকগুলো বিধিনিষেধ মেনে চলতেই হয়। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই ফ্রান্সে দীর্ঘস্থায়ী সরকার বড় একটা গড়বার সুযোগ পায়নি, তাই বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে জনসাধারণের ওপর রাজার শোষণ অথবা রাষ্ট্রিক দাপট কমে গেলেও জনসাধারণের যেটা সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে সেটা হচ্ছে

ক্ষত্রিয় যুগ দৃঢ়-নিৰদ্ধ সামাজিক কাঠামোর অভাব। পৃথিবীর নাম-করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ-ব্যবস্থা তথা সামাজিক শৃঙ্খলার রীতিমত অভাব আছে, যদিও সামাজিক শিক্ষার সেখানে অভাব নেই ও জনসাধারণের মধ্যেও সেবাপরায়ণতা ও একত্ববোধের কিছুমাত্র অভাব নেই। যে মানুষের আধ্যাত্মিকতা নেই তার ওপরে যদি রাষ্ট্রিক দাপট বা গোষ্ঠীর দাপট না থাকে তাহলে তার পক্ষে শৃঙ্খলা মেনে চলা ঠিকভাবে সম্ভব হয় না। সেকালে সমাজ-ব্যবস্থা বলতে পৃথিবীর কোন কোন দেশে জাতিভেদ-ব্যবস্থাকে বোঝাত। সেই সমস্ত দেশের যে অংশে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বা সরকার দুর্বল ছিল, সেখানে জাতি-ব্যবস্থা বা বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাও খুব কঠোরভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। ইসলামীয় শাসনের আগে পর্যন্ত পূর্ব বাঙলায় ও পূর্ব ভারতের কোন কোন অংশে রাষ্ট্রিক দুর্বলতার জন্যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাও সুদৃঢ়ভাবে তৈরী হ'তে পারেনি।

ক্ষত্রিয় সমাজের ধার্মিকতা বা শৃঙ্খলা-বোধের পেছনে ঠিক ভীতম্মন্যতা বলতে যা বুঝি তা কাজ করে না, তবে আত্মরক্ষার প্রয়াস তার ভেতরে রয়েছে বৈ কি! পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার অপবিত্র চুক্তি ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও থাকে; তবে সে

অপবিত্রতার মধ্যেও শূদ্রের ন্যায় নীচ মানসিকতার পরিচয় থাকে না। বুদ্ধিবৃত্তিতে ক্ষত্রিয় পশুর চেয়ে সত্যিই কি উঁচু ছিল বা নীচু? পশু জানে নিজের স্থূল দেহের অভাবপূর্তি, ব্যষ্টিগত জীবনে স্থূল আনন্দের উপভোগ ও নিজের সন্তান সন্ততির প্রতি ও আংশিকভাবে পতি বা পত্নীর প্রতি কিছুটা দায়িত্ব-ৰোধ। যেখানে অন্যকে বাঁচাবার প্রশ্ন ওঠে, যেখানে কোন আদর্শের খাতিরে ত্যাগ-স্বীকারের প্রশ্ন ওঠে, যেখানে মর্যাদা রক্ষার জন্যে বা অন্য কোন কারণে নিজের সবচেয়ে যা প্রিয় জিনিস সেই জীবনকেও বিলিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে, সে যে মানসিকতার বিচারে পশুর চেয়ে অনেক বড় এ কথা মানতেই হবে। বস্তুতঃ পশু-জীবনের চেয়ে যে জীবন সামান্যতর উন্নত তাকে ৰলি শূদ্র-সমাজের জীবন। তার চেয়ে যে জীবন উন্নত, যে মানসিকতা অধিকতর ব্যক্ত তাকেই ৰলি ক্ষত্রিয়। খুব সূক্ষ্ম বিচার করলে দেখা যাবে যে, পশু-জীবনের জড়-সংঘাতই শূদ্র-জীবনের নির্মাতা আর শূদ্র জীবনের জড়-সংঘাত তথা অনগ্রসর মানসিকতার সংগ্রাম (ভাব সংঘাত) ক্ষত্রিয়-ভাবের স্রষ্টা।

যুধ্যমান ক্ষত্রিয় প্রকৃতিকে দেখেছিল শক্তিসমূহের সমষ্টি হিসেবে। তার অস্পষ্ট ধারণায়, এই শক্তিসমূহের সংশ্লেষণ

অসম্ভবরূপে প্রতিভাত না হ'লেও এ নিয়ে অধিক দূর চিন্তা করা ছিল তার সামর্থ্যের বাইরে। ভোগ-দৃষ্টি শক্তি-সংঘর্ষের মাধ্যমে তার মানসিকতাকে কখনও নিয়ে গেছে বিশ্লেষণাত্মক ধারা-প্রবাহে স্থূলত্বের দিকে, আর কখনও সংশ্লেষণাত্মক ধারা-প্রবাহে সূক্ষ্মত্বের দিকে। বস্তুতঃ ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ এই সংশ্লেষণাত্মক ধারা-প্রবাহেরই একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পরিণতি। শূদ্র সমাজের বহু-দেবতাবাদ একদেবতাবাদে আশ্রিত, এই অস্পষ্ট ধারণা ক্ষত্রিয়-মানসেই প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল আর তাই বলা হয়েছিল ব্রহ্মবাদের প্রবক্তা ছিলেন ক্ষত্রিয়। ভারতের জনক নামধারী নৃপতি যে ব্রহ্মবাদের উপদেষ্টা ছিলেন তা থেকে ব্রহ্মবাদের এই ক্ষত্রিয়- নির্ভরশীলতাই প্রমাণিত হয়। ইতিহাসের ছাত্র মানেই জানে, ভারতে জনক নামে কোন একটি বিশেষ রাজা ছিলেন না, একাধিক রাজার ওটি ছিল একটি সাধারণ উপাধি। জনসাধারণ যাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সব সময়েই ৰলত, সেই জনসম্বর্ধিত ব্যষ্টিকে জনক বলা হ'ত। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের এই বেদাধিকার কোন সাধারণ বা সামান্য জিনিস ছিল না। একটু আগেই বলেছি, এটা ছিল একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পরিণতি অর্থাৎ এই ধরণের পরিণতি ৰড় একটা দেখা যায়নি, তবে হ্যাঁ, দেখা গিয়েছিল ক্ষত্রিয়েরই মধ্যে।

সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে ক্ষত্রিয়ের ধার্মিকতা, অধিক প্রাপ্তি তথা অধিক ব্যষ্টির মানসিকতাতেই নিহিত।

ভাব যেখানে গৌণ, লাভ বা লোভের ভাবই সেখানে মুখ্য। ক্ষত্রিয়ের এই লোভ-প্রসূত লাভের সম্ভাব্য পরিণতির আশাই পরবর্তী কালে বিপ্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। বিপ্রশক্তির নিরঙ্কুশতার কাছে শেষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয়কে তার বাহু বিকিয়ে দিতে হয়েছিল। ক্ষত্রিয়ের সমাজ- ব্যবস্থায় বাঁচা, বা বাঁচানো বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল ৰাঁচার মত বাঁচা। সামাজিক কাঠামোয় ক্ষত্রিয়ের মানসিকতা যেন বলতে চায়, "ফুলের পাপড়ির মত মানী ব্যষ্টি হয় সৰাইকার ওপরে থাকবার চেষ্টা করৰে নয় ঝরে পড়ে যাৰে। সৰাইকার নীচে থেকে বেঁচে থাকা ফুলের পাপড়ির ধর্ম নয়।" শক্তি-বৈচিত্র্যকে যে ভয় পায় সে এই বিচিত্রতার মর্ম বুঝতে পারে না। যে সংগ্রাম করে যায় সেই এই বিচিত্রধর্মিতাকে ধীরে ধীরে চিনতে শেখে ও একটা সঙ্কলিত অবস্থায় আসৰার সুযোগ পেতে থাকে।

সংগ্রামী গোষ্ঠীর জীবনে যে শৃঙ্খলার দাম অত্যন্ত বেশী একথা বোঝাবার জন্যে কালি-কাগজ খরচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ক্ষত্রিয়ের সমাজ তাই সমাজ হোক বা না হোক

সেটা যে একটা দৃঢ়-নিৰদ্ধ ব্যবস্থা হতেই হবে তাতে কোন সন্দেহ থাকতেই পারে না। হয়ত তাতে দুর্বলের ওপর শোষণের রথ অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকে, হয়ত তাতে সহস্র মানুষের বুভুক্ষা এক জনকে প্রাচুর্যের মধ্যে থাকতে সুযোগ দেয়, হয়ত তাতে মানুষে মানুষে ভাই-ভাইয়ের সম্পর্কের পরিবর্তে শাসক-শাসিতের সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবু সে একটা ব্যবস্থা। কোন ভাল মন্দ বিচার না করে সেই ব্যবস্থাকে দাঁড় করিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ক্ষত্রিয়ের স্বভাব।

ক্ষত্রিয়-সমাজের সংবেদন ঠিক নিষ্করুণ প্রকৃতির মত নয়, এতে সব চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় hero worship বা বীর-পূজা। দুর্বল সেখানে সৰলের নেতৃত্ব মেনে নেয়, সৰল দুর্বলকে তার আনুগত্যের বিনিময়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেয়। আর তাই ক্ষত্রিয়ের সমাজ-ব্যবস্থায় আশ্রয়প্রার্থী বিপন্নকে রক্ষা করা পুণ্যকর্মরূপে বিবেচিত হয় ও এই ধরণের কর্তব্যপরায়ণতাকে সমাজ-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিকতা রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অন্য কারণে নয়, ৰার্দ্ধক্যের জন্যে তথা শারীরিক অপটুতার জন্যেই স্বয়ংনির্ভরশীলতায় অসমর্থ পিতামাতাকে রক্ষার ও তাদের সেবার দায়িত্ব নেওয়া হয়।

ক্ষত্রিয় সমাজে মানুষ অজস্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত অবশ্যই থাকে ও গোষ্ঠীগুলি সর্বদাই একে-অন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কিন্তু জয়ের দুরন্ত পিপাসা জীবনকে কতকটা যেন দাবা খেলার মতই করে তোলে, সংগ্রাম তথা পৌরুষের আবেদন জীবনকে মূল্যবানও করে তোলে। তাই সেখানে জীবনের সমস্ত হতাশার বোঝা টেনে নিয়ে চলার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। সামুহিক জীবনের সুখ শূদ্রের তুলনায় ক্ষত্রিয় বেশী পায় বৈ কি, কারণ সংগ্রামী জনসাধারণ সুখে-দুঃখে এক সঙ্গে থেকে থেকে যে সামূহিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয় তা' সামূহিক জীবনের দুঃখকেও ব্যথা-মধুর করে তোলে।

ক্ষত্রিয় সৰ সময়ে জেগে আছে। কিন্তু সৰ সময়েই যে সে চক্ষুষ্মান এমন কথা বলা চলে না। যে জেগে আছে তাকে জাগাৰার হয়ত প্রয়োজন নেই কিন্তু যেদিকে তার তাকানো উচিত সে যদি সেদিকে না তাকায় তাহলে তাকে সেদিকে তাকাতে বলার প্রয়োজন থেকে যায়। ক্ষত্রিয় আলোক-অন্ধকারের ভেদ না রেখেই সর্বজয়ীর ভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। অন্ধকারে প্রতিপক্ষের শক্তি যাচাই না করে সে তাকে সংগ্রামে আহ্বান জানায় ও এর ফলে অনেক সময়েই তাকে ছিন্ন-বিছিন্ন, ক্ষতবিক্ষত হয়ে অকালে পৃথিবী থেকে

বিদায় নিতে হয়। ক্ষত্রিয়ের ইতিহাস রক্ত-রাঙ্গা ইতিহাস, কিন্তু সে ইতিহাস বুদ্ধি-দীপ্ত ইতিহাস নয়। তাতে পৌরুষ আছে, তেজস্বিতা আছে, সাহস আছে, কিন্তু বিচক্ষণতা নেই, সূক্ষ্ম বুদ্ধির সমর্থন নেই। তাই ক্ষাত্রযুগ কিছুকাল চলবার পরই বুদ্ধিজীবীরা তাদের বুদ্ধির প্রাখর্যে ক্ষত্রিয়কেই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দেয়। ক্ষত্রিয় যেদিকে তাকায়নি বুদ্ধিজীবী তাকে সেই দিকে তাকাতে ৰলে। সে যা বোঝেনি তাকে তা বুঝিয়ে দিতে থাকে। এই ধরণের অবস্থা কিছু দিন চলতে থাকলে ক্ষত্রিয় সেই বুদ্ধিজীবীর কাছে মাথা নোয়ায় ও তার শ্রেষ্ঠতা মেনে নিয়ে তারই নির্দেশ মত নিজের পৌরুষকে সঞ্চালন করতে থাকে।

এই বুদ্ধিজীবীরা ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয়ের হাত থেকে সমাজ পরিচালনার অধিকার কেড়ে নেয় ও ক্ষাত্র-শক্তির সাহায্যে সমাজে নিজেদের প্রাধান্য রক্ষা করে চলে। ক্ষত্রিয় ঘুমোয় না কোনদিনই কিন্তু বুদ্ধিজীবী বা বিপ্রের কাছে নতিস্বীকার করার সাথে সাথে ক্ষাত্র-যুগের মৃত্যু ঘটে। বুদ্ধিজীবী বা বিপ্ররা পুরাণ তৈরী করে, ক্ষাত্র গৌরবের ইতিকথা রচনা করে ও সেই ইতিহাসের পাতাতেই জানিয়ে দেয় যে বিপ্রের পূজা করাই এই শক্তিশালী ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আর শক্তিপ্রধান ক্ষত্রিয়

এই কৌশল ধরতে পারে না। সে সরল বিশ্বাসে বিপ্রের বুদ্ধি, চালাকি ও প্রবঞ্চনার কাছে নিজের দাসখত লিখে দেয়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে চাতুর্বণিক সমাজ-ব্যবস্থা মানুষ জাতের মধ্যে সর্বত্রই ছিল, আর সেটা হয়েছিল বা হয়ে চলেছে সমাজ- চক্রে বিশেষ ধরণের পরিক্রান্তির হিসেৰ অনুযায়ী। এতে সব চাইতে মজার জিনিস হল এই যে অব্যবস্থিত শূদ্র-যুগের পরে যখন প্রথম ক্ষাত্র যুগের উদ্ভব হয় তখন শূদ্ররা সেটাকে তাদের কাছে একটা খুব বড় রকমের আশীর্বাদ রূপেই গণ্য করে। ক্ষত্রিয়ের শোষক রূপটা বা সম্ভাব্য শোষক রূপটা তার চোখে তখন ধরা পড়ে না। ঠিক তেমনি ক্ষত্রিয়ের সমস্ত শক্তি যখন বুদ্ধিজীবী বিপ্রের কাছে বিকিয়ে যায় তখনও ক্ষত্রিয় বুঝতে পারে না যে সে বিকিয়ে যাচ্ছে, সে বুঝতে পারে না ধীরে ধারে সে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। আরও পরবর্তী কালে যখন প্রি বৈশ্যের টাকায় বিকিয়ে যায়, সরস্বতী যখন লক্ষ্মীর দাসীতে পরিণত হয়, তখন গোড়ার দিকে বিপ্র ৰোঝেনা যে তার দাম টাকার অঙ্কে ধরা পড়তে চলেছে। বিপ্রের ৰৌদ্ধিক শোষণ ক্ষত্রিয়কে শক্তিশালী জানোয়ারের স্তরেই নামিয়ে দেয় আর বিপ্রের মস্তিষ্ক তার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ইতিহাসে বড় বড় রাজরাজড়ার কাহিনী পড়ি। পড়ে মনে হয় হয়ত এগুলোর সবকটিই ক্ষত্রিয় প্রধান যুগের ঘটনা। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই ছিল? একটু ভালভাবে খোঁজ নিলেই দেখতে পাই এই সকল রাজ- রাজড়াদের প্রায় সকলেই বিপ্র-মন্ত্রীর অঙ্গুলি হেলনে উঠতেন-বসতেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই সত্যটা নির্মমভাবে দেখা দিয়েছে যে, প্রৰল প্রতাপান্বিত নরপতি, তিনিও বিপ্রমন্ত্রীর হাতের পুতুল মাত্র। বস্তুতঃ রাজতন্ত্রের ইতিহাসকে যদি বলি মন্ত্রীতন্ত্রের ইতিহাস তাহলে তাতে ভুলের পরিমাণ খুৰ কমই থেকে যাৰে। বিশৃঙ্খল ক্ষাত্র নৃপতিতন্ত্রের যথেচ্ছাচারের হাত থেকে তথা সাময়িক শৃঙ্খলার হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করে কতকটা জনসমর্থিত শৃঙ্খলাৰোধ এই বিপ্র মন্ত্রীদের দ্বারাই এসেছিল, তাই সুশৃঙ্খল রাজ্য আসলে বোঝায় রাজশক্তির বিপ্রানুগত্য। বল্লালী সমাজ-ব্যবস্থায় অনিরুদ্ধ ভট্টের দান অনস্বীকার্য; হোসেন শার রাজত্বের শান্তিশৃঙ্খলার পেছনে কাজ করে গেছে পুরন্দর খাঁর বুদ্ধিমত্তা; চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন চাণক্যের হাতের কাঠের পুতুল। ক্ষত্রিয় বিপ্রতন্ত্রের কাছে একবার আনুগত্য স্বীকার করার পরক্ষণে বিপ্র তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়নিৰদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছে। রাজাকে শাসনযন্ত্রের

সর্বশ্রেষ্ঠ ৰলে স্বীকৃতি দিয়েও সে সমাজ-ব্যবস্থায় তাকে বিপ্রদাস ৰলে ঘোষণা করেছে। ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার রাজাকে দেয়নি কারণ এই ধর্মীয় কাঠামোর মধ্য থেকেই বিপ্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায়। তাই বিপ্র-সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয়-রাজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মের রক্ষক ও বিপ্রের ভৃত্য।

জনসাধারণ বিপ্র-সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থায় একবার আসবার পরে যখনই দেখা গেছে যে রাজা বিপ্রের শাসন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে তখনই বিপ্র তার ৰৌদ্ধিক শক্তি প্রয়োগ করে নিজে জন-সমর্থন আদায় করে নিয়েছে ও রাজার গর্বোন্নত শিরকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে সিংহাসনে নোতুন রাজাকে বসিয়ে নিজের রাজত্ব অব্যাহত রেখেছে।

বিপ্রের প্রভাব থেকে চেতনা-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের বাঁচবার যে চেষ্টা তাকে বলতে পারি ক্ষত্রিয়-সৃষ্ট বিক্রান্তি বা প্রতিবিপ্লব।

ক্ষত্রিয়ের তুলনায় বিপ্রে অসাধুরা আরও বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা তাদের ৰৌদ্ধিক সামর্থ্যের অধিকাংশই অন্যের কষ্টার্জিত অন্নের অংশভাগী হবার কাজেই লাগিয়ে দেয়। ক্ষত্রিয় শূদ্রকে যন্ত্রে পরিণত করে আর বিপ্র তার সূক্ষ্ম

শক্তির দ্বারা ক্ষাত্রশক্তির প্রাণসত্তাকে ইচ্ছামত স্তম্ভিত ও ইচ্ছামত কর্মায়িত করে। তাই ক্ষাত্রযুগের পরে যখন বিপ্রযুগের সূচনা দেখা দেয়, ক্ষত্রিয় যখন চরম বিশ্বাসে বিপ্রের পদতলে তার অস্ত্র সমর্পণ করে তখন সে ভাবতেও পারে না যে, সে প্রতারকের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। ইহলোকের দুর্দৈব খণ্ডন ও পরকালের স্বর্গপ্রাপ্তির মোহ তার সহজ বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দেয়। ক্ষাত্র মানসের সমস্ত বৈশিষ্ট্য, সমস্ত দোষগুণ, সঙ্গতি ও অসঙ্গতি বিপ্রবৃদ্ধির নখদর্পণে; তাই তাদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ও সরলতাকে অনুগৃহীত প্রোৎসাহন দিয়ে বিপ্র নিজের কাজ হাসিল করতে থাকে। ক্ষত্রিয়ের প্রাণীন সম্পদের সাহায্যেই সে ক্ষত্রিয়ের প্রাণরসকে শোষণ করে নিজের ভোগবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার সুযোগ খুঁজে পায়। ক্ষত্রিয়ের বাহুৰলের চাইতে বিপ্রের বাক্যৰল ও বুদ্ধিবল অনেক সূক্ষ্ম, তাই ক্ষত্রিয়ের পেশীকে বিপ্রের অবস্থার চাপে ফেলে গোলামে পরিণত করতে বিশেষ কোনই অসুবিধা হয় না। শৌর্য প্রকাশের মাধ্যমেই যার প্রতিষ্ঠা শৌর্যের অহংকার তার থাকেই। ক্ষত্রিয়ের এই শৌর্যগত দুর্বলতাকে বিপ্র বুদ্ধিবলে কাজে লাগায়। তাকে প্রশংসা করে তার বুদ্ধির অবশেষকেও ধ্বংস করে দিয়ে ক্ষত্রিয়ের শৌর্যকে বিপ্র অঙ্গুলি হেলনে

পরিচালনা করে। দুর্দান্ত হাতীকে ছোট্ট একটি মাহুত যেমন পরিচালনা করে ঠিক তেমনি শৌর্যাহঙ্কারী ক্ষত্রিয়ের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাটুকু বুঝে নিয়ে বিপ্র তার মাথায় চড়ে বসে। ক্ষত্রিয়ের শিরোপা বিপ্রের পদতলে স্থান লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করতে থাকে।

বিপ্র যুগ

সূর্যের আলো যেখানে প্রবেশ করতে পারে না বুদ্ধিমানের বুদ্ধি সেখানেও প্রবেশ করে। জড়কে সে ভোগ করতে চায় জড়ের গোলামে পরিণত না হয়ে অর্থাৎ জড়কে সে নিজের মানস তরঙ্গে সঞ্চালিত করতে চায়। যারা তা করে তারা যে শুধু ক্ষত্রিয়ই তা নয়, তারা বিপ্রও হতে পারে, তবে ক্ষত্রিয়ত্ব ও বিপ্রত্ব এই দু'য়ের মূলগত পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ক্ষত্রিয়ের অহংবুদ্ধি তার জড়শক্তির সাহায্যে ভোগ্য-বস্তুকে নিজের কাছে টেনে আনে সমস্ত বিরোধী শক্তির সঙ্গে জড়-সংঘাতের মাধ্যমে। আর বিপ্রের অহংবুদ্ধি বা ভোগ লিপ্সা জড়কে

নিজের কাছে টেনে আনে অন্যের জড়শক্তির সাহায্যে জড়-সংঘাতের মাধ্যমে অথবা জড়-সংঘাতকে বর্জন করে সোজাসুজি ভাব- সংঘাতের মাধ্যমে অথবা সুবিধে-মত কোথাও জড়-সংঘাত, কোথাও বা ভাব- সংঘাতের দ্বারা অথবা যুগপৎ উভয়বিধ সংঘাতের দ্বারা।

বিপ্র-জীবনের সব চাইতে বড় কথা হ'ল এই যে, এতে জয়ের গৌরব পাওয়া যায়, পরাজয়ের গ্লানিও এড়ানো যায়। আর ব্যষ্টিগত জীবনের বড় রকমের ঝুঁকি না নিয়েই ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করা যায়। ক্ষত্রিয়ের মত বিপ্রও সতত যুধ্যমান তবে তার যুদ্ধ ৰৌদ্ধিক রণাঙ্গনে সীমিত থেকে যায়। বিপ্র তাই বুদ্ধিজীবী। এই ৰৌদ্ধিক বিকাশ কেবল যে জড় সম্পদ আহরণেই ব্যস্ত থাকে তা নয়, সূক্ষ্ম মানস-সম্পদ আহরণের যোগ্যতাও তাই তারই সৰ চাইতে বেশী থাকে। বৌদ্ধিক উপকার তথা ৰোধিচিকীর্ষা তাকে অগ্র্যাবুদ্ধির জাগরণে বিশেষভাবে সাহায্য করে। জড় ভোগলিপ্সু বিপ্রের সঙ্গে মানসিক গতিগত বিচারে ক্ষত্রিয়ের আদর্শগত পার্থক্য না থাকলেও অগ্র্যাবুদ্ধির অনুশীলনকারী বিপ্র ক্ষত্রিয়ের থেকে অনেকখানি অন্য ধরণের। অগ্র্যাবুদ্ধির উদ্বোধন তথা সেই ৰৌদ্ধিক গতিধারা সূক্ষ্মত্বের চরম ভাবটুকুকে প্রায় ছুঁয়ে চলে

আর তাই তার গতি সরল রেখাকার। সে গতিতে দ্রুতি আছে, সর্বানুস্যূত ভাব আছে, সর্ববর্ণের সমাবেশ আছে তাই বিপ্র শুভ্রত্বের প্রতীক, সে শ্বেতবর্ণ। এই ধরণের বিপ্রের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কর্মেন্দ্রিয়গত অভিপ্রকাশের মাত্রাল্পতা থাকায় তেজস্বিতার প্রতীক রক্তবর্ণ তার বর্ণ হ'তে পারে না। কিন্তু এই যে অগ্র্যাবুদ্ধির অনুশীলনকারী শুভ্রবর্ণ বিপ্র-এরা সংখ্যায় ক'জন? অধিকাংশই তো পরগাছার মত অন্যের জড়শক্তির সাহায্যে ভোগোপাদান আহরণেই ব্যস্ত, তাই আমি বিপ্র বল্লে এই প্রবন্ধে এই নিকৃষ্ট বিপ্রদি'কেই ৰোঝাতে চাইছি। অগ্র্যাৰুদ্ধির সাধক শুভ্রবর্ণ উৎকৃষ্ট বিপ্র বা সদ্বিপ্রের কথা - পরে ৰলৰ।

বিপ্র করে যায় নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি শূদ্রের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম আর ক্ষত্রিয়ের পৌরুষের সাহায্যে। মানুষ জাতিকে শ্রম দিয়ে গড়ে শূদ্র, পৌরুষ দিয়ে গড়ে ক্ষত্রিয় আর তাদের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে শ্রম আদায় করে নেয়, পৌরুষ কিনে নেয় বিপ্র। সমাজের গতিপথের সামনেকার অভ্রভেদী পর্বতকে দেখে শূদ্রের মত সে হতাশ হয়ে বসে পড়ে না বা ৰাধাকে দেবতা জ্ঞানে, রোগকে দেবী জ্ঞানে পূজো করে প্রকারান্তরে নিজের অসহায়তার পূজো সে করেনা, ক্ষত্রিয়ের মত সাহসের সঙ্গে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেও সে পারে না। সে

বুদ্ধির সাহায্যে শত্রু জয়ের থিয়োরী তৈরী করে দেয়, ক্ষত্রিয় আর শূদ্ররা সেই থিয়োরীকে নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে কার্যান্বিত করে দেয় আর ক্ষত্রিয়-শূদ্রের মৃতদেহের ওপর দিয়ে বিপ্র এগিয়ে যায়, দুনিয়াকে জানায়-"ওগো! আমি এইভাবে গড়েছি, এইভাবে জয় লাভ করেছি"। বিপ্রের এই ধরণের পরস্মৈপদী সংগ্রামের দৃষ্টান্ত ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে। ক্ষত্রিয় ও বিপ্রের স্বভাবগত সমতা ও বিসমতা জীবনে ছোট বড় প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালভাবে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। তাদের সমতা দেখে তাদি'কে চেনা যায় না, চেনা যায় তাদের বিসমতা দেখে। এই বিসমতার সৰচেয়ে বড় কথা হ'ল যে, ক্ষত্রিয় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারা জড়কে নিজের দাসে পরিণত করতে চায় আর বিপ্র বৌদ্ধিক সংগ্রামের দ্বারা জড়-জয়ী ক্ষত্রিয়কে নিজের দাস করে রাখতে চায়। ক্ষত্রিয়ের পন্থা সরল ও তাতে কুটবুদ্ধির অবকাশ নেই; বিপ্রের পথ আগাগোড়াই কুটিলতাপূর্ণ, তাতে সরলতার অবকাশই নেই, আপাতঃদৃষ্টিতে তাতে যে সরলতাটুকু আছে তা' কুটিলতার ওপর সরলতার চুনকাম মাত্র।

এই বিপ্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষদের মিলিত গোষ্ঠীকে ৰলৰ বিপ্র-সমাজ। এখানে ভাল করে মনে রাখা দরকার, এই শূদ্র-

ক্ষত্রিয়-বিপ্র শব্দগুলির সঙ্গে সনাতনী হিন্দু-সমাজের বর্ণাশ্রম ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, বৌদ্ধিক বিচারে এককালে যারা বিপ্র হয়েছিল তারাই সমাজে নিজেদের অধিকার কায়েম রাখবার জন্যে বিপ্রকে একটি জন্মগত বর্ণ বা জাতে পরিণত করে নিয়েছিল ও তাদেরই পায়ে মাথা বিকিয়ে দেওয়া পরাজিত ক্ষত্রিয়ের প্রতি কিছুটা কৃপা বর্ষণ করে (আসলে এটা কৃপা-বর্ষণ নয়, ভবিষ্যতে এই ক্ষত্রিয়গণকে কাজে লাগাবার জন্য) তা'দিকে ঠিক বিপ্রের নীচে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

বিপ্রের সমস্ত সামর্থ্যই বৌদ্ধিক শোষণে (intellectual exploitation) ব্যয়িত হয়। মানব মনের দুর্বলতাগুলোকে কেন্দ্র করে পৌরাণিক কথা-কাহিনী রচনা করে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করে, জন-সমাজে বিপ্রের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করে ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যেও রেলিজনের আবিলতা ঢুকিয়ে বিপ্র নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চায় ও অর্জিত প্রতিষ্ঠা কায়েম রাখতে চায়। এই প্রতিষ্ঠা অর্জনের ফন্দি-ফিকিরে ও প্রতিষ্ঠা সামলাবার কূটচক্রেই তার মূল্যবান জীবনের সমস্ত মানসিক সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়, যে কোন সম্প্রদায়ের তথাকথিত ধর্মগ্রন্থ

(religious scripture) খুললেই এর ভুরি ভুরি প্রমাণ মিলবেকৃষ্ণসাধন, ব্রত-উপবাস; তীর্থ যাত্রা বা পবিত্র নদী-কুণ্ড-স্নান অথবা হোম-যাগ-যজ্ঞ বা শাস্ত্র পাঠ- যাই হোক্ না কেন, বিপ্রকে দক্ষিণান্ত না করলে ফল পাওয়া যাবে না; লৌকিক দেব-দেবী সম্বন্ধে লেখা মামুলি ধরণের পাঁচালিও বিপ্রের মুখ থেকে শুণতে হবে, অন্যের মুখ থেকে নয়। বলা বাহুল্য মাত্র, দক্ষিণা-প্রত্যাশা না রেখে বিপ্র নিশ্চয়ই পাঁচালি পাঠ করতে আসবে না। কোথাও কোথাও এমনও হয় যে, পাপাচারী, সমাজ-বিরোধী ব্যষ্টিগণকে বলা হয়, তারা যদি তাদের পাপক্রিয়া অকপটে তাদের কাছে ব্যক্ত করে তাহলে বিপ্রের বিশেষ প্রচেষ্টায় তারা তাদের কর্মফলের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে। বুদ্ধিমান ব্যষ্টিমাত্রেই বুঝবে যে বিপ্র নিশ্চয় অবৈতনিকভাবে ঈশ্বরের দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় না। ভাবুন দেখি, এতে করে কীভাবে পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে। তবু ক্ষত্রিয়ের তুলনায় বিপ্রের বাহাদুরিও রয়েছে। ক্ষত্রিয় কেবল জড়-ভোগেই সুখ চায়। কিন্তু বিপ্রের কিছুটা মানস-ভোগও রয়েছে, তা' সে যত নগণ্য, যত তুচ্ছই হোক না কেন।

মানুষের শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে বৌদ্ধিক পরিশ্রমের যেখানে অসঙ্গতি দেখা দেয় সেখানেই ঘটে একটা বিপর্যয় আর এই অসঙ্গতি যাদের মধ্যে রয়েছে তারাই যদি মিলিতভাবে সমাজের লাগামকে ধরে থাকে তাহলে বিপর্যয়ের জের গোটা সমাজটাকে ভুগতে হয়। শূদ্রের মধ্যে দৈহিক পরিশ্রমের মাত্রার তুলনায় ৰৌদ্ধিক পরিশ্রম নগণ্য। ক্ষত্রিয়ের কাছে ৰৌদ্ধিক পরিশ্রম মূল্যহীনভাবে না থাকলেও কর্মক্ষেত্রে তার অধিক মূল্যায়ন হয় না। বিপ্রের শাসনও, সে নিজে বিপর্যয় ডেকে না আনলেও বেশীদিন ধরে বিপর্যয়কে আটকে রাখতে পারে না। বিপ্রের বেলায় হয়ে থাকে এমনই একটা জিনিস যে, কোন জড়শক্তি সম্প্রয়োগের চাইতে মূল্যায়নের মাত্রাটাই বেশী অর্থাৎ বিপ্র-শাসনে অন্যে মেহনৎ করে যাবে বিপ্রের মান-ইজ্জতের জন্যে ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে আর বিপ্র কেবল তার বৌদ্ধিক সাহায্যে অন্যের প্রাণরস শোষণ করবে আর পরগাছার মত নিজের সামঞ্জস্যবিহীন জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাবে।.

জীবনে জড়-সংঘাত বেশী থাকলে জড়শক্তি যে গতিতে বাড়ে intellect বা বুদ্ধির বিকাশ সে গতিতে হয় না, ঠিক তেমনি অতিরিক্ত ভাব-সংঘাত থাকলে ঘটতে থাকে কেবল

বুদ্ধিরই বিকাশ, শারীরিক অকর্মণ্যতা ক্রমশঃ উৎকটভাবে দেখা দিতে থাকে। এই জাতীয় বুদ্ধিপ্রধান মানুষেরা মানসিকতার বিচারে ক্রমশঃ হীন থেকে হীনতর হ'তে থাকে, তাই বিপ্র-প্রধান যুগে গোড়ার দিকে বিপ্রের যেটুকু মানসিক উদারতা থাকে শেষের দিকে সেটুকুও থাকে না। তার এই উদারতার অভাবই শেষ পর্যন্ত সমাজ- দেহে বৈশ্য-প্রাধান্য ডেকে আনে, তাই বিপ্রযুগের গোড়ার দিকে সমাজকে বাঁচাৰার জন্যে ও সমাজকে শোষণের জন্যে দুই কাজেই বিপ্র বুদ্ধি দেয়। অন্যকে বাঁচাবার জন্যে তথা অন্যকে শোষণের জন্যে অন্যের কাছ থেকে বুদ্ধি নেয়ও কিন্তু বিপ্র-প্রাধান্যের শেষের দিকে বিপ্র কেবল বুদ্ধি প্রয়োগ করে- গ্রহণ করে না। আর যেটুকু সে প্রয়োগ করে তা করে কেবল অন্যকে শোষণের জন্যে।

ক্ষাত্র প্রাধান্যের যুগে দৈহিক ৰলে ও অস্ত্র-বলে যারা হেরে যেত তাদের মধ্যে চলত কৌশলে জয়ী হবার প্রয়াস। জয় লাভের এই পরিচ্ছেদহীন দীর্ঘকালীন প্রয়াস তাদের অন্তর্দেহে যে ভাব-সংঘাত জাগাত সেই ভাব-সংঘাতই - ঘটিয়ে দিত তাদের ৰৌদ্ধিক উৎকর্ষ। এই ৰৌদ্ধিক উৎকর্ষ সৰলের শক্তিকে শোষণের কাজে প্রথম যারা লাগিয়েছিল তারাই ছিল আদিম বিপ্র-পিতা। যে সকল অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিমান বিপ্র,

ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এই সকল বিপ্র-পিতার বৌদ্ধিক শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল তারা এই সকল বিপ্র-পিতাকে নিজেদের গোত্র-পিতা বা প্রৰৱ-পিতারূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই গোত্র-প্রবর-ব্যবস্থা পৃথিবীর কোথাও কোথাও মানুষ-সমাজে আজও চলছে।

বিপ্রের বৌদ্ধিক আশ্রয়ে থেকে ভাব-সংঘাতের ফলে যে সকল ক্ষত্রিয় বিপ্রোচিত ৰৌদ্ধিকতা লাভ করেছিল বিপ্র-প্রাধান্যের ধারাবাহিকতা তারাই টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় সমাজের ধারাবাহিকতা যেমন ক্ষত্রিয়- প্রভাবিত শূদ্রদের কৃতি ঠিক তেমনি বিপ্র-সমাজের ধারাবাহিকতা বিপ্র-প্রভাবিত ক্ষত্রিয়দের কৃতি। অতীতে দেখা গেছে, ক্ষত্রিয়দের ধারাবাহিকতা থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী যখনই সামাজিক প্রাধান্য ক্ষত্রিয়ের হাত থেকে খসে গিয়ে বিপ্রের কুক্ষিগত হয়েছে তখন তার প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষত্রিয়-সমাজের ক্ষত্রিয় নামধারী শূদ্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ঠিক তেমনি বিপ্রের ধারাবাহিকতা থাকা সত্ত্বেও বিপ্রের আধিপত্য নষ্ট হবার সময় দেখা গেছে যে বিপ্র-সমাজে তখন বিপ্র অর্থাৎ সত্যিকারের বুদ্ধিজীবীর চাইতে বিপ্র নামধারী অবিপ্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এমনটা কেন হয়? যদিও সমাজচক্রের রীতিটাই

এই অর্থাৎ শূদ্রযুগের পরে আসৰে ক্ষত্রিয় যুগ, ক্ষত্রিয়ের পরে বিপ্রযুগ ও বিপ্রের পরে বৈশ্যযুগ ও তারপর সামাজিক বিপ্লব- এই ধরণের সামাজিক বিবর্তন প্রকৃতির অমোঘ বিধান।

ক্ষত্রিয় বা বিপ্ররাও নিজেদের প্রাধান্যের যুগে অন্ততঃ পক্ষে এই তথ্যটা বোঝে যে, পৃথিবীতে কোনো জিনিসই যখন অপরিবর্তনীয় নয় তখন তাদের প্রাধান্যও একদিন শেষ হবে আর শেষ হৰে যোগ্যতার অভাবে। এইজন্যে তাদের অযোগ্য বংশধরদের ললাটে যাতে থেকে যায় ক্ষাত্র গরিমার জয়-তিলক, যোগ্যতা থাক বা না থাক রাজার ৰেটা যাতে রাজা হ'তে পারে অথবা যতই মূর্খ হোক না কেন, বিপ্রের বংশধর যাতে বিপ্ররূপে সমাজে- পূজিত ও সুবিধাভোগী হ'তে পারে তার জন্যে ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও বৈশ্যেরা মানুষের ব্যষ্টিগত যোগ্যতার চাইতেও জন্মগত অধিকারকেই বড় করে দেখত, জন্মগত অধিকারের পক্ষে জয়ঢাক পেটাত। পরবর্তীকালে বৈশ্য-সমাজেও ওই দশাই হয়েছিল। ক্ষাত্র-প্রাধান্যের যুগে দেখা যায়, ধীরে ধীরে কেবল বংশ প্রাধান্যের দোহাই পেড়ে ক্ষত্রিয় নামধারী অক্ষত্রিয়ের হাতে ক্ষমতা যায় বা বিপ্র নামধারী অবিপ্রের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। তবে এই সকল অনুপযুক্ত

ব্যষ্টিদের পক্ষে ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব ব্যাপার। ঠিক এই ধরণের অবস্থায় ক্ষত্রিয়ের হাত থেকে ক্ষমতা বিপ্রের হাতে চলে যায় ও পরবর্তীকালে বিপ্রের হাত থেকে চলে যায় বৈশ্যের হাতে ও সমাজে অত্যাচারী বৈশ্যের প্রাধান্য যখন অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায় তখন জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ-চক্রের নূতন এক অঙ্কের সূচনা করে।

মানুষ-জাতের যে বিকাশ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রাণের উচ্ছলতা নিয়ে দেখা দিয়েছিল বিপ্রের মধ্যে সে প্রাণীন বিকাশ অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। প্রাণীনতা মননশীলতার কাছে ক্রমশঃ আত্মসমর্পণ করতে থাকে। ক্ষত্রিয় জড়-চেতনকে জয় করবার কাজে যেভাবে শক্তি ও নিষ্ঠা নিয়ে বাস্তব-ভূমিতে অবতীর্ণ হয় বিপ্রের মধ্যে ঠিক তেমনটি দেখা যায় না। ৰৌদ্ধিক ভূমিতে চেতনের সাথে পরিচিত হবার প্রচেষ্টা তার অবশ্যই থাকে কিন্তু জড়কে সে জয় করতে চায় নিজের শক্তিতে নয়-এখানেও সে নিজের বুদ্ধিটুকুকে পুঁজি হিসেবে কাজে লাগায়। বুদ্ধির সাহায্যে ক্ষত্রিয়ের শক্তিকে সে জড়কে জয় করবার কাজে নিয়োগ করে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দেশে দেশে বিপ্রের অঙ্গুলি হেলনে ঘটে যায় বড় বড় যুদ্ধ। বিপ্র নিজে লড়ে না-রাজার কাণে যুদ্ধের মন্ত্রণা দিয়ে, ক্ষত্রিয় সেনাপতিকে যুদ্ধে নামায়।

ক্ষত্রিয়-সৈনিক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, জল-স্থল অন্তরীক্ষ তোলপাড় করে বেড়ায় আর বিপ্র তাদের শারীরিক অথবা মানসিক দুর্বলতাকে বুঝে নিয়ে অর্থ বা খাদ্যের লোভ দেখিয়ে অথবা আদর্শবাদের ফাঁকা বুলি আউড়ে তাদি'কে এই মহামারণ যজ্ঞে নামিয়ে দেয়। বিপ্র-প্রধান যুগে তাই লড়ে মরে ক্ষত্রিয়, জয়ের বরমাল্য পরে কূটনীতিবিদ্ বিপ্রমন্ত্রী।

বিপ্র-প্রধান সমস্ত দেশের একই চিত্র। ইতিহাসের পাতায় বিপ্র-মন্ত্রীদের নাম জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা থাকে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ক'টা সৈনিক মরেছে, ক'টা সৈনিক তোপের মুখে দাঁড়িয়ে মুহূর্ত মধ্যে নিজের সোণালী স্বপ্নকে অন্ধকারে মিলিয়ে দিয়েছে ইতিহাস তার খবর রাখে না। বিপ্রমন্ত্রী মরলে, খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপান হয়, শোক সভা হয়, হাজারে হাজারে শোক বাণী আসতে থাকে, রাষ্ট্রের পতাকা অর্ধনমিত হয়, পার্কের মোড়ে মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয় কিন্তু যে ক্ষত্রিয়ের রক্তে ধরণী সিক্ত হওয়াতে জয়ের ফসল ফলেছিল খবরের কাগজওয়ালা কোনদিন তাদি'কে চিনৰে না। সত্যিই তো, এত লোকের নাম কি খবরের কাগজে ছাপান যায়! পৃথিবীর বড় বড় যুদ্ধৰাজ, বড় বড় রাজনীতিক-এরা সবাই এই শয়তান-বুদ্ধি বিপ্র দলের লোক। এদের অঙ্গুলি হেলনে, এদের অগ্নিবর্ষী

ভাষণে, এদের কূটনৈতিক চক্রান্তে লাখে লাখে বুদ্ধিহীন শূদ্র মরেছে আর তাদের এই মারণ-যজ্ঞে যন্ত্রের কাজ করেছে হাজারে হাজারে তপ্ত-শোণিত ক্ষত্রিয়।

পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখি, মধ্য যুগের যত ক্রুস্তে, যত জেহাদ সৰই এই শয়তান বিপ্রদের কারসাজি। এই কারসাজির প্যাঁচে পড়ে শূদ্ররা পড়ে পড়ে মার খেয়েছে আর ক্ষত্রিয়রা মুজাহিদ্ হয়ে লড়ে গেছে। কার জন্যে লড়েছে তা' তারা তলিয়ে ভাবেনি।

শুধু কি মধ্যযুগে? পুঁজিবাদী বৈশ্যের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে বৈশ্যের দালাল হিসেৰে এই শয়তান বিপ্ররা আজকের পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোককে মরণের পথে ঠেলে দিয়েছে ও দিচ্ছে- বৈশ্যের রাক্ষুসে ক্ষুধার অগ্নিকুণ্ডে শয়তান-বিপ্রেরা আজও ঘৃতাহুতি দিয়ে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুসমস্যা, রণক্ষেত্রে নিহত সৈনিকের মাতা-জায়া-পুত্র-কন্যার গগনভেদী আর্তনাদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান শিখা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতীয়তা [Nationalism] জাতিবাদ [Casteism], এইগুলোর জন্যে শূদ্র জনসাধারণ তো দায়ী নয়ই, সংগ্রামী ক্ষত্রিয়ও দায়ী নয়- দায়ী মুষ্টিমেয় কয়েকজন কূটনীতিবিদ বিপ্র যারা ক্ষুদ্র-স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এই ধরণের

পাশবিক কার্যে ক্ষত্রিয়-শূদ্রকে প্রেরণা যুগিয়ে যায়। তাদের এই হীনতা, তাদের এই পাশবিকতা যেন তাদের বুদ্ধিকেই ব্যঙ্গ করতে শ্মশানে পিশাচের নৃত্য চালিয়ে যায়। বিপ্র-প্রাধান্যের যুগে এই পাশবিকতা বিপ্রের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়। চাঁড়ালের হাড়ের ভেল্কি দেখিয়ে বিপ্র সমাজের মাথার মণি হয়ে বসে, আর বৈশ্য-প্রাধান্যের যুগে ঠিক এই ধরণেরই পাপ কাজ করে বিপ্র বৈশ্যের জরি বসানো জুতোর মত শোভা পেতে থাকে।

বিপ্র কি কেবল শোষণই করেছে? হয়ত বা তার শোষণ সেবাকে সব সময় ছাপিয়ে উঠেছে, হয়ত বা শোষণের উদ্দেশ্যে সেবা করেছে তবু সে সেবার ফিরিস্তিটা খুব ছোট নয়। ক্ষত্রিয় তার সংগ্রামের মারফত বস্তুর বাইরের দিকটা জয় করেছে আর বিপ্র তার বুদ্ধিকে প্রবিষ্ট করিয়েছে ক্ষত্রিয়ের বিজিত সম্পদের অভ্যন্তরে, তাই ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধিতে বস্তু যেখানে কেবলমাত্র গৃহীত হয়েছে, বিপ্র-যুগে বিপ্রের বুদ্ধিতে তাকে হজম করা হয়েছে। তবে বিপ্রের এই হজম করাতেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে আর এই বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে সৰাইকার কর্মক্ষেত্রে একটা করে গণ্ডি টেনে দেবার পরে সেই গণ্ডির ভেতরে বিকাশের কিছুটা সুযোগ করে দেওয়া। তাই বিপ্র ক্ষত্রিয়কে শোষণ

করলেও বা ক্ষত্রিয়কে নিজের দাসে পরিণত করলেও ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্র-ধর্ম বা বীরত্ব প্রকাশের সুযোগে হস্তক্ষেপ করে না। শূদ্রকে মানুষ বলে স্বীকার করতে কুন্ঠিত হলেও তার বাঁচবার সুযোগ অব্যাহত রেখেছে। মানবেতিহাসে প্রগতি তথা জড়ের ওপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলবার সময় বিপ্র যুগের এই বৈশিষ্ট্যের কথা না বললে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে উপেক্ষা করা হবে।

বিপ্রের বরমালা বয়ে এনেছিল তার ৰৌদ্ধিকতা, ক্ষত্রিয়কে শুধু সে বুদ্ধির লড়াইয়ে হারায়নি, তাকে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল। আদিম মানুষের যে দুর্বলতাগুলো ক্ষত্রিয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি বিপ্র সেগুলির সুযোগ নিয়ে সমাজের বাকি অংশকে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও শূদ্রকে শোষণ করে চলেছিল, আজও চলেছে। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি যেখানে হার মেনেছে বিপ্র সেখানে কৌশলে অলৌকিকত্বের আমদানী করে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। মানুষ মরে কোথায় যায়-এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনগ্রসর মানুষ মনের মধ্যে ভূতের আমদানি করেছে। লৌকিক জগতে যে সমস্ত ভীতিপ্রদ বা বিড়ম্বনাদায়ক ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে সে পারেনি সেগুলোকে সে ভূতের কাজ বলে মনে করেছে আর বিপ্র

মানুষের এই ভয়কে কাজে লাগিয়ে ভূতের রোজা সেজে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গালে চড়টি মেরে দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে।

বুদ্ধিমান বিপ্র কি একথা বুঝতো না যে ভূত যখন মনের তৈরী, ভূতে ধরা একটা মনেরই রোগ আর ভূতুড়ে ঘটনাগুলোর কারণ জানা থাক বা না থাক সেগুলো আদপেই ভূতুড়ে নয়! ভূতে ধরা মনের রোগ, স্নায়ুপুঞ্জের রোগ, এটা জেনেই ভূতের রোগীর স্নায়ুপুঞ্জকে চাঙ্গা করবার জন্যে তাকে প্রহার করেছে, হুঁস্ ফিরিয়ে আনার জন্যে নাকের কাছে তার লঙ্কার ধোঁয়া ধরেছে ও তার মানসিক ব্যাধি সারাবার জন্যে আরো বিভিন্ন প্রকারের মানসিক চিকিৎসার সাহায্য নিয়েছে কিন্তু আসল ব্যাপারটি কারো কাছেই ভাঙ্গেনি; বরং লোক ঠকাবার জন্যে বিড় বিড় করে অর্থহীন মন্ত্র আউড়ে গিয়ে আজও জনসাধারণকে বোঝাতে চাইছে যে তার মনের জোরে অথবা তথাকথিত তন্ত্র সাধনা বা প্রেতসিদ্ধির বা পিশাচসিদ্ধির জোরে এই সকল দানাদোত্যি, ভূত-প্রেত, শাকচুন্নি, ব্রহ্ম-দৈত্যেরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। গয়ায় পিণ্ড দেওয়া বা প্রেতের ওই ধরণের কোন ঊর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়ার কথা ৰলা আসলে রোগীর মনকে একাগ্র করার জন্যেই করে হয়ে থাকে ও এই একাগ্রতা- প্রাপ্ত মনের শক্তিতে ছাদের আলসে বা

গাছের ডাল ভেঙ্গে যায়, বিপ্র- রোজা বোঝাতে চায়-তার মন্ত্রের জোরে ভূত পালাল, এইটাই নিদর্শন। আসলে ভূত কখনো কারও ঘাড় মটকায় না-ঘাড় মটকায় বিপ্র।

ধর্মাধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে বিপ্র জনসাধারণের কাছ থেকেও কম টাকা টানে না। ভূতে ধরার মত দেবদেবী বা তথাকথিত সেন্টদের ভর হওয়া একই ধরণের জিনিস। দেবস্থান বা দরগাহতে ধর্না দিয়ে ঔষধ বা প্রত্যাদেশ পাওয়া আসলে যে সংশ্লিষ্ট ব্যষ্টিরই বোধির খেলা একথা বিপ্র পুরোহিতেরা কি সত্যি সত্যিই জানে না? যদি না জানত তাহলে তারা এই ধরণের ক্ষেত্রে রোগীর কাণে বিশ্বাসের মাহাত্ম্য এত বেশী করে কেন শোণাত? তারা জানে বিশ্বাসে স্থূলবুদ্ধি সূক্ষ্মবুদ্ধিতে ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি যখন বোধির মণিকোঠায় পৌঁছে যায় তখন অনন্ত জ্ঞানের সহজ আধার সেই ৰোধি সত্য ঘটনাটি বুদ্ধিকে জানিয়ে দেয়-সংশ্লিষ্ট ব্যষ্টি তার পছন্দমত দেবতার মুখ থেকে সত্য ঘটনাটি বা রোগের ঔষধ পাচ্ছে বলে মনে করে। যেখানে বিশ্বাসের তাল্পতা সেখানে একাগ্রতার অভাব, তাই সেখানে বুদ্ধি অহং-এর চউকাঠ ডিঙ্গিয়ে বোধির ঘরে ঢুক্তে পারে না; সুতরাং তথাকথিত দেবতার কাছ থেকে ঔষধ ও প্রত্যাদেশ পাওয়া তার পক্ষে

সম্ভব হয় না। বিপ্র পুরোহিতেরা এটা বোঝে তাই তারা অল্প বিশ্বাসীদের বলে –আপনি চলে যান। আপনার কার্য সিদ্ধি হবে না, দেবতা যদি সত্যি জাগ্রত হ'ত তাহলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠত না। ঔষধ বা প্রত্যাদেশ সকলেই পেত।

বুদ্ধি জড়শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই বুদ্ধি ও শক্তি দু'য়ের অধিকারী ক্ষত্রিয় তার অঙ্গুলি হেলনে বা সঙ্গীণ উচিয়ে শূদ্রকে দিয়ে তার ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নেয়, আর ক্ষত্রিয়ের চেয়ে অল্পশক্তি কিন্তু অধিক বুদ্ধির অধিকারী বিপ্র তার ৰৌদ্ধিক প্রাখর্যে ক্ষত্রিয়ের অঙ্গুলি সঞ্চালন আর সঙ্গীনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। বিপ্রের জয় ৰৌদ্ধিক জয় কিন্তু ক্ষত্রিয়ের তরবারি আর শূদ্রের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম এই দু'য়ের সহযোগিতা না থাকলে বিপ্রের জয় নিরর্থক হয়ে যেত। বস্তুতঃ বিপ্র যখন সংগ্রাম করে সে সংগ্রামের প্রায় সৰটুকুই ঘটে থাকে তার স্নায়ুকোষে-স্নায়ুতন্তুর কাজ সে খুব সামান্যই করে থাকে। স্নায়ুতন্তুর কাজ করে দেয় তার আজ্ঞাবহ ক্ষত্রিয় আর শূদ্র। পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে গেছে অনেক বড় বড় যুদ্ধ, যুদ্ধে মরেছে লক্ষ লক্ষ অল্পবুদ্ধি শূদ্র, হাজার হাজার অল্পবুদ্ধি বীর ক্ষত্রিয়, আর জয়ের মাল্য পেয়েছে বিপ্রমন্ত্রী; যুদ্ধক্ষেত্র সে দূর থেকে উঁকি মেরেও দেখেনি। যে কোন

ঐতিহাসিক পর্যালোচককে জিজ্ঞাসা করা যাক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনকে কে জিতিয়ে দিয়েছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে, ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল; সে বলবে না, লাখে লাখে টমিসৈন্য বুকের রক্ত ঢেলে ব্রিটেনের হয়ে লড়েছিল, হাজার হাজার বিজ্ঞানী, শিল্পী, কারিগর, কেরানী, ডাক্তার যুদ্ধবিশারদ অফিসার অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্রিটেনের ইজ্জৎ রক্ষা করেছিল। এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিলিত শ্রম, এই যে অগুন্তি মানুষের স্নায়ুপেশীসঞ্চালনা এগুলো সৰই যেন চার্চিলের বুদ্ধির কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

ইতিহাসের সেই মধ্যযুগে যেদিন শূদ্রের শাসক ক্ষত্রিয় তার ধনুর্বাণ বুদ্ধিমান বিপ্রের পায়ের তলায় রেখে দিয়ে নিজেকে তার দাস বলে ঘোষণা করল, সেদিন তার সমস্ত পৌরুষ বিপ্রের কূটবুদ্ধির টানাজালে ধরা পড়ল। মানব-ইতিহাসে সেইদিন থেকে শুরু হয়েছিল বিপ্র-প্রাধান্যের যুগ বা বিপ্রের যুগ। কিন্তু ক্ষত্রিয় তার সমস্ত পৌরুষ, তার সমস্ত শস্ত্রবুদ্ধি কি একদিন আচমকা বিপ্রের পায়ে বিলিয়ে দিয়েছিল? না, এতেও লেগেছিল ৰহুদিন সময়। তিলে তিলে নিজের বৌদ্ধিক শক্তিতে বিপ্র অপেক্ষাকৃত স্থূলবুদ্ধি ক্ষত্রিয়ের কর্মধারাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। বিপ্রের বৌদ্ধিক চাপে যে অবস্থাটিতে এসে ক্ষত্রিয়ের

সমস্ত তেজ স্তম্ভিত হয়েছিল, ঠিক সেই অবস্থাটিতে সে করেছিল আত্মসমর্পণ। যে সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা প্রাকৃতিক শুভ সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিক মননের অধিকারী বিপ্র আগে থাকতে জানতে পারত সেগুলোকে সে তার অলৌকিক শক্তির অভিব্যক্তি হিসেবে ক্ষত্রিয়ের সামনে উপস্থাপিত করত। ক্ষত্রিয় পরম বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে থাকত, আর ভাবত, এই যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বিপ্র, এর অভিশাপে হয়ত তার সর্বনাশ হ'তে পারে, এর আশীর্বাদে হয়ত সে দিগ্বিজয়ী হতে পারে, এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে সে তার সমস্ত সামর্থ্যকে বিপ্রের ৰৌদ্ধিক শক্তির কাছে ৰিকিয়ে দিয়েছিল।

সেকালের ইতিহাসে দেখি, বিপ্রের সঙ্গে যখন অল্প বুদ্ধিমানের সংঘর্ষ হয়েছে, বিপ্র হয়ত জ্যোতিষিক গণনায় জেনেছে যে, খানিক বাদে সূর্য-গ্রহণ হবে, সে তার এ জ্ঞান প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কাজে লাগিয়ে বলেছে- আমার অভিশাপে খানিকবাদে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে। খানিক বাদে যখন গ্রহণের ফলে সত্যসত্যই পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেছে, প্রতিপক্ষ তখন সেটাকে বিপ্রের অভিশাপের প্রতিক্রিয়া বলে মনে করেছে ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এই রকম অজস্র প্রকারে বিপ্র ক্ষত্রিয়কে ঠকিয়েছে।

কোথাও বা সাধারণ জাদুর খেলা দেখিয়ে, কোথাও বা মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে অভিভূত করে বিপ্র তার কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। এই ধরণের ছল- চাতুরী শিখতে বিপ্রের বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল, তাই বিপ্র-প্রাধান্য রাতারাতি আসেনি।

ক্ষাত্র-প্রাধান্যের সূচনায় এক একজন ক্ষত্রিয়কে কেন্দ্র করে যেমন দানা বেঁধে' উঠেছিল এক একটি শূদ্র-গোষ্ঠী ঠিক তেমনি বিপ্র-প্রাধান্যের সূচনায় দেখা গেল এক একজন বিপ্রকে কেন্দ্র করে বা তথাকথিত বুদ্ধিমানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক একটি ক্ষত্রিয়-গোষ্ঠী। বলা বাহুল্য মাত্র, এই ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে আবার দাঁড়িয়েছিল অগুন্তি শূদ্র-গোষ্ঠী। যে বিপ্রকে কেন্দ্র করে এই গোষ্ঠীগুলি দাঁড়িয়েছিল, সে গোষ্ঠীগুলির বিপ্র-নেতার নামানুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষত্রিয়গোষ্ঠীকে বলা হ'ত অমুক গোত্র, আর বিপ্র উপনেতার নামানুযায়ী বলা হ'ত অমুর প্রৰর। বর্তমান হিন্দু-সমাজে প্রচলিত গোত্র- প্রবর ব্যবস্থায় উদ্ভব এইভাবে। এই গোত্র-প্রৰর ব্যবস্থায় গোষ্ঠী-রচনায় বিপ্রের পরিচিতি গ্রহণ করা ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের অবসানেরই সূচনা করে। বিপ্রের প্রাধান্য স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল একটা নূতন ধরণের বিপ্রাশ্রয়ী সমাজ

ব্যবস্থা। এই সমাজ-ব্যবস্থায় বিপ্রের শোষণ-যন্ত্র পুরোদমে ছুটিয়ে দেওয়া হ'ল, আর শাসন-যন্ত্র রেখে দেওয়া হ'ল বিপ্র-পদলেহী ক্ষত্রিয়ের হাতে।

গোড়ার দিককার ক্ষত্রিয়-সমাজে ছিল মাতৃগত কুল-ব্যবস্থা (Matrilineal order)। তারপরে এল পুরুষ-প্রাধান্যের সাথে সাথে পিতৃগত কুল-ব্যবস্থা- একথা আগেই বলা হয়েছে। কালক্রমে যখন বিপ্র-প্রাধান্য দেখা দিল তখন এল গোত্র-প্রৰর ব্যবস্থা। বিপ্রের প্রাধান্য ছিল সম্পূর্ণরূপে ৰৌদ্ধিক প্রাধান্য। এই প্রাধান্যকে জিইয়ে রাখার জন্যে বিপ্র করেনি এমন কাজ নেই। অথচ তার এই সকল কর্মের ওপরেই ছিল একটা লোক দেখানো সাধুতা বা আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ, ছিল একটা বিরাট অভিনয়। সাধারণ মানুষের সহজাত দুর্বলতাগুলিকে বড় বড় বুলি কপ্চে বিপ্র ৰেশ ভাল ভাবেই কাজে লাগাত।

বিপ্র যদিও পাণ্ডিত্যের অহমিকা নিয়ে সমাজে শীর্ষে বসে থাকতে চাইত তবু তার আভিজাত্য শীর্ষে বসে থাকার প্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয়নি। শারীরিক পরিশ্রম বিমুখ হওয়ায় যদিও তার অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কতকটা সমাজের পরগাছার মত

তবু জনস্বার্থ তথা জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমেই সে নিজের প্রতিষ্ঠার পথ খোঁজৰার চেষ্টা করত। মুষ্টিমেয় বিপ্রের এই সদ্গুণ ক্ষত্রিয় তথা শূদ্রদের মনে একটা বিশেষ ধরণের বিপ্রপ্রীতি জাগিয়ে দিত যার ফলে শোষিত হয়েও শোষণটাকে বড় চোখে দেখত না, ভাবত, সাহস-শক্তি- বুদ্ধি-পরিশ্রমের মাধ্যমে যা উপার্জন করি তার একাংশ বিপ্র নিলেই বা ক্ষতি কি! তাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল যে, বিপ্রের সেবা স্বর্গ-প্রাপ্তির সোপান ও ভালই হোক, মন্দই হোক এই ধরণের একটা ভাবনা সমাজ-নির্মাণে তথা সমাজের স্থায়িত্ব-বিধানে কিছুটা সাহায্য করেছিল বৈ কি! এই বিপ্র-মহিমা প্রচার করে বিপ্ররা নিশ্চিতভাবেই নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে ও শোষণ-কার্য অব্যাহত রাখতে চেয়েছিল কিন্তু জন-সাধারণের একটা বৃহৎ অংশ এই তথ্যটা তলিয়ে বুঝতে না পারলেও বিপ্রভক্তি বা বিপ্র- প্রচারিত অধ্যাত্মবাদ-ব্যবস্থায় তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে তথা অন্তর্মুখী ভাব- গ্রহণের প্রেরণায় তা অবশ্যই সাহায্য করেছিল। বিপ্রের প্রতি আক্রোশ বশতঃ কেউ যদি এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা অস্বীকার করতে চান সেটা নিশ্চয় সঙ্গত কাজ হবে না।

ক্ষত্রিয় লড়েছিল নিজেকে বাঁচাতে, অন্যকে বাঁচাতে ও একটা সামাজিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে, আর বিপ্র সমস্ত ৰৌদ্ধিক শক্তিকে লাগিয়ে দিয়েছিল বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর ক্ষত্রিয়-শূদ্রকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের সাহায্যে নিজেকে বাঁচাতে, তাদের সাহায্যে নিজের কাজ, গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা ও নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে সমাজের শিরোমণি হয়ে বসে থাকতে। বিপ্রের এই ৰৌদ্ধিক শক্তির অভিপ্রয়োগ তাকে তার্কিক, নৈয়ায়িক ও তর্কাশ্রয়ী দার্শনিক করে তুলেছিল, তার মননে এই ধরণের বিকাশ প্রেয়-মুখী বা শ্রেয়-মুখী কোনটাই ছিল না। তর্ক ও বান্জালের সাহায্যে নিখুঁত ধার্মিকতার অভিনয় করে একদিকে যেমন সে সমাজকে শোষণ করে চলত অন্যদিকে তেমনি তার দার্শনিকতা শূদ্রজনতার শিষ্ট জড়-ভাবকে খণ্ডন করে মানুষকে সূক্ষ্মতর লোকের পানে চলতেও উৎসাহ দিত। যারা এই সূক্ষ্মতর লোকের দিকে চলার কাজে রত হয়েছিল তারা শূদ্র, ক্ষত্রিয় বা বিপ্র যাই থাকুক না কেন, তারাই মানুষ-জাতকে দিয়েছিল আধ্যাত্মিক প্রেরণা, তারাই গড়ে দিয়েছিল অধ্যাত্ম-দর্শন। অতীতে দেখা দিয়েছিল, বর্তমানে দিচ্ছে ও ভবিষ্যতে দেবে। তাদের মধ্য থেকেই সত্যিকারের সদ্বিপ্রের অভ্যুদয়। মনের চরম বিকাশ, মানুষের সৌভ্রাত্র,

বিশ্বানুস্যূত ৰুদ্ধি ও বৈষয়িক প্রভাব এই বিপ্র-যুগেরই পরিণতি, বিপ্রের সমালোচনা করতে গিয়ে একথা যেন আমরা না ভুলি। মনে রাখা দরকার, ক্ষত্রিয়-যুগ যেমন মানুষকে মানুষ হিসাবে ভাবতে আরম্ভ করেছিল, বিপ্র-যুগ তেমনি মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করতে গিয়ে তার স্থূল অস্তিত্বের চাইতে মনীষার মূল্যায়নের দিকে বেশী প্রবণতা দেখিয়েছিল। মনীষার অগ্রগতি ক্ষত্রিয়-সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থাকে সামূহিক কল্যাণের ভিত্তিতে দাঁড় করাবার চেষ্টায় বারে বারে তার কাঠামো ভেঙ্গেছে ও গড়েছে।

পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক চাহিদা, মানুষের মনোবৃত্তি, যুদ্ধোত্তর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর রক্ত সংমিশ্রণ প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্বের ভিত্তিতে এই বিপ্ররা বারে বারে নবতর সংহিতা রচনা করেছে। যে তথাকথিত ধর্মশাস্ত্রকে ভিত্তি করে বিপ্রের শোষণ-যন্ত্র গড়ে উঠেছিল সেই ধর্ম-শাস্ত্রসমূহকে অপৌরুষেয় (মানুষের তৈরী নয়, খোদ ভগবানের তৈরী) তথা অপরিবর্তনীয় ঘোষণা করে নিজের শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখার ব্যবস্থা করলেও যুগের দাৰী মেটাতে গিয়ে সমাজ-ব্যবস্থাতে পরিবর্তন আনতে হয়, এই তথ্য বিপ্র স্বীকার

করেছিল। এই ব্যাপারে ক্ষত্রিয়ের তুলনায় বিপ্র যে অনেক বেশী উদার- এই কথা মানতেই হবে।

ক্ষত্রিয় তার সমাজ-ব্যবস্থায় এক ধরণের নির্বোধ ডিক্টেটর সুলভ গোঁয়ার্তুমির পরিচয় দিয়ে এসেছে কিন্তু বিপ্র অন্ততঃ সে ধরণের ভুল করেনি। এর কারণও বেশ স্পষ্ট। সমাজে নিজের ডিক্টেটরির ওপরে ক্ষত্রিয়ের প্রতিষ্ঠা, তাই যেন তেন প্রকারেণ ক্ষত্রিয় সেই ব্যবস্থাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু বিপ্রের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধিক শ্রেষ্ঠত্বের ওপর। আর তাই বৌদ্ধিক শোষণের পথটুকু খুলে রেখে যুগের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে চলাই বিপ্র উচিত কাজ বলে মনে করে। ধর্মশাস্ত্র বা scripture কে পৌরুষেয় (মনুর সৃষ্ট) বলে কবুল করলে শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তাই বিপ্র তা করেনি। কিন্তু সমাজ শাস্ত্রকে (social code বা স্মৃতিশাস্ত্র) অপৌরুষের ৰলে ঘোষণা করলে যুগ-সম্মত পদ্ধতিতে শোষণের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠিক এই কারণে বিপ্র সমাজ-সংহিতাকে পরিবর্তন-সাপেক্ষ বলে মেনে নেয়।

বিপ্র চেয়েছিল ৰৌদ্ধিক শোষণ। সে যা কিছু ভেঙ্গেছে বা গড়েছে শোষণের পথ খুলে রেখেই করেছে। যুক্তির পথ ঠিক শোষণের পথ নয় এটা বুঝে বুদ্ধিমান বিপ্র যুক্তির পথ না

মাড়িয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে অন্ধভাবে বিশ্বাসের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছে। তাই সমাজ-শাস্ত্রে সে যখন হাত লাগিয়েছে নিজের সুবিধের দিকে চেয়েই তা' করেছে। তার স্বপক্ষে যুক্তি না দেখিয়ে শুণিয়ে গেছে ধর্মীয় অনুশাসনের বড় বড় বুলি। তাই ক্ষত্রিয়ের সমাজ-ব্যবস্থায় তথা ক্ষত্রিয়ের দাম্পত্য-ব্যবস্থায় আসলে মানবতার মাত্রা বাড়েনি, লেগেছে কেবল একটা গোঁড়া ধর্মান্ধতার পোঁচ। নারী-পুরুষের সুবিধার কথা ভেবে ক্ষত্রিয় সমাজ-ব্যবস্থা রচনা তথা দাম্পত্য সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়াস করেছিল আর বিপ্র নারীকে তথা অজ্ঞ অবহেলিত মানুষকে স্থায়ীভাবে শোষণের ব্যবস্থাটাই সুকৌশলে পাকা-পোক্ত করে রাখতে চেয়েছিল, পাছে অবহেলিত মানুষেরা ও নারীরা মানুষ হিসেৰে সকলের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করে বসে সেই ভয়ে সমস্ত শক্তি একটি দল বিশেষের হাতে রাখবার জন্যে কোন কূটবুদ্ধি প্রয়োগের কসুর করেনি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্ষত্রিয়ের অভ্যুত্থান বিভিন্নভাবে হয়েছিল কিন্তু বিপ্রের অভ্যুত্থানের ধরণধারণ প্রায় সব দেশেই একই। ধার্মিকতা বা আধ্যাত্মিকতা নয়, ধর্মের নামে নিজেদের সুবিধেমত কতকগুলো গালগল্প তৈরী করে নিয়ে বিপ্র তার উদ্দেশ্য হাসিল করে নিয়েছে। বিপ্র-যুগে নারীর পুরুষ-

নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়ায় বিপ্রৰুদ্ধি নারীকে বিনা পয়সার ক্রীতদাসীতে পরিণত করল। নারীকে সর্বতোভাবে পঙ্গু করে দেবার ষড়যন্ত্রে সে তৈরী করল দেবতাদের প্রত্যাদেশ সহ অজস্র প্রকারের শাস্ত্রীয় বিধিবিধান, অজস্র রকমের কু-যুক্তি ও পাপ-পুণ্যের কাল্পনিক কথা-কাহিনী। সেগুলো শুণলে বা পড়লে মনে হয় পুরুষই, বিশেষ করে, বিপ্র পুরুষই ঈশ্বরের একমাত্র কৃপাপাত্র, বাকীরা জন্মেছে তাদের কেবল সুখভোগের উপকরণ জোগাবার জন্যে।

ক্ষত্রিয়-যুগের দাম্পত্য-ব্যবস্থায় নারী ছিল পুরুষের সাহায্যকারিণী তথা সহকর্মিণী আর বিপ্রযুগে কাগজে-কলমে তাকে করে দেওয়া হ'ল সহধর্মিণী কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে সে হয়ে দাঁড়াল চাকরাণী বা বাঁদী। পুরুষ তাকে যতটুকু সময় ৰিৰি সাজিয়ে রাখৰে ততটুকু সময়ে তার যা কিছু সামাজিক ইজ্জৎ। যে সকল দেশে নারীরাই মেহনত করে অর্থাৎ যে সকল দেশে পুরুষেরা অলসভাবে বসে বসে খায় সে সকল দেশেও নারী-ব্যবস্থা ঠিক একই ধরণের অর্থাৎ সেখানকার নারীরা পুরুষের দাপটে অস্থির। পৃথিবীর যে সকল প্রাগ্রসর দেশে নারীকে fair sex ৰলে ভাষায় বা আদপ-কায়দায় বেশ একটা ইজ্জৎ

দেখানো হয়, সে সকল দেশেই যেখানে অধিকার ভোগের প্রশ্ন সেখানে নারীকে স্বীকৃতি দিতে পুরুষ-সমাজ নারাজ।

বিপ্র-যুগের এই পুরুষের দাপট পরবর্তী যুগে অর্থাৎ বৈশ্য যুগে অপরিবর্তিত থেকেছে। ক্ষত্রিয়-যুগে নারী ছিল পুরুষের ছায়া অর্থাৎ সমান সুখ-দুঃখের সমান সামাজিক মর্যাদার অধিকারিণী কিন্তু বিপ্র-যুগে নারীর বৌদ্ধিক পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেল তার সামাজিক মর্যাদা। তখন নারীর ইজ্জৎ হয়ে দাঁড়াল পুরুষের খেলনা। কখনও বা পুরুষ তাকে নিয়ে শুরু করল আদিখ্যেতা, কখনও বা অবহেলা।

তাই দেখি, বিপ্র-যুগে বিশেষ করে বৈদিক যুগের মধ্যাবস্থায় যখন বুদ্ধিজীবীরা হয়ে দাঁড়াল সমাজের সর্বেসর্বা তখন পুরাতনের জের টেনে কেউ কেউ জায়ারূপে সমান মর্যাদা বা অধিকার পেতে থাকল- ৰটে কিন্তু অধিকাংশের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণরূপে একটা ভোগোপাদানের মত। সন্তান-ধারণ, সন্তান-প্রতিপালন ব্যতিরেকে তার আর কোন যোগ্যতা যে আছে সমাজ তা অস্বীকার করল। তাকে বলা হ'ল ভার্যা। সুবিধাবাদীরা স্মৃতি শাস্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় বললে, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' (Women are child-producing

machines.)। এই ধরণের প্রাচীন-পন্থী মতবাদের জের টেনে আনা বিপ্র যুগেরই লক্ষণ বহন করে চলেছে, অবশ্য সেই বিপ্র-যুগে বুদ্ধিহীনা নারীকে এই ৰলেও সময়ে সময়ে বোঝান হত যে সে শুধু ভার্যা বা জায়াই নয়, গৃহিণীও বটে অর্থাৎ সমান সামাজিক অধিকার বা মর্যাদা তার তো আছেই অধিকন্তু আধ্যাত্মিক অধিকার তার রয়েছে, যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে এই অধিকার কোথাও বড় একটা মানা হত না। যে দু'-একটি ক্ষেত্রে নারীকে এই আধ্যাত্মিক অধিকার ভোগের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয় সে ক্ষেত্রে তাঁরা আসলে অধিকার পাননি, নিজেদের বিরাট ব্যষ্টিত্বের সাহায্যে এক রকম জোর করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার সাধনার জন্যে সেকালের পণ্ডিত সমাজ কাগজে-কলমে ৰাধা দিতে পারেন নি ৰটে কিন্তু জিনিসটাকে তাঁরা নিশ্চয়ই ভাল চোখে দেখেন নি, অবশ্য ওই সকল নারী পরবর্তী কালে যথেষ্ট শ্রদ্ধা পেয়েছেন, আজও পাচ্ছেন। যদিও সৰ ক্ষেত্রে এই কথাটা সত্য যে অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, স্ব-শক্তিতে অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। তবু কথাটা বিশেষ করে ৰললুম এইজন্যে যে বিপ্র-সমাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নারীর অধিকার মানতে চায়নি।

ক্ষত্রিয় যুগে গোষ্ঠী-মাতার প্রাধান্য বিপ্র-যুগে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল। ক্ষত্রিয়-যুগে মানব-সমাজে জ্ঞানের প্রাথমিক উন্মেষ কালে জ্ঞানের কথা নারীরাও শিখিয়েছে। তারা রচনা করেছে মন্ত্র, দিয়েছে যজ্ঞে পুরুষের পাশে বসে আহুতি, কিন্তু বিপ্র-যুগে সে তার মর্যাদা খুইয়ে বসল। সমাজে তার দাসীত্ব পাকা করে তোলার কোন ব্যবস্থারই কসুর করা হল না। তার যজ্ঞাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হ'ল। সমাজে গোষ্ঠীমাতার পরিবর্তে দেখা দিল গোষ্ঠী-পিতা। শাস্ত্রপাঠের সুযোগ হয় কেড়ে নেওয়া হ'ল অথবা তাকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করা হ'ল। মূর্খ নারীর পক্ষে মুখ বুজে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা মানা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

বিপ্র-যুগ সুবিধাবাদী পুরুষের যুগ। তাই এই যুগে পুরুষের ইচ্ছামত পত্নী পরিত্যাগের অথবা চারিত্রিক শিথিলতার সুযোগ থাকলেও নারী সম্বন্ধে ব্যবস্থা করে দেওয়া হ'ল অত্যন্ত কঠোর। নারীর মধ্যে ওই জাতীয় কোন দোষ ত্রুটি দেখা গেলে সমাজে নারী হিসেবে কোন সম্মান পাওয়া তো দূরের কথা মানুষ হিসেবে তার কোন সম্মান থাকল না। অথচ ঠিক একই অপরাধে অপরাধী পুরুষ, সমাজের নেতা সেজে বুক ফুলিয়ে মাতব্বরী আরম্ভ করল। বিপ্র যুগের পর বৈশ্য

যুগ এসেছে। কিন্তু এই বিপ্র যুগের জের টেনে তাই পরবর্তী বৈশ্য যুগেও আমরা দেখেছি যে পতি-পরিত্যক্তা নারীর সমাজে মোটেই সম্মান নেই। যেখানে সমাজের ওপর শূদ্র-অভ্যুত্থানের কোন প্রভাব নেই সেখানে এই বিপ্র-যুগীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী আজও সমাজ খোলা মনে বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকার করতে চায় না। সেখানে নারীকে কাগজে-কলমে কিছুটা সুযোগ দিলেও আসলে তাকে অত্যাচারী পুরুষের কৃপার ওপরেই ফেলে রাখা হয়েছে।

এই বিপ্র যুগে সামাজিক অমর্যাদা, অর্থনৈতিক দুর্গতি ও আরও কয়েকটি লৌকিক কারণে গণিকাবৃত্তি প্রথম দেখা দিয়েছিল। মনে রাখা দরকার এই গণিকাবৃত্তি শূদ্র বা ক্ষত্রিয় যুগের জিনিস নয়। হীন বৃত্তির প্ররোচনায় পুরুষের মধ্যে, নারীর মধ্যে অল্পবিস্তর দুশ্চরিত্রতা দেখা দেওয়া সম্ভব কিন্তু তাতে করে একটি বৃহৎ পতিতা-সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। পতিতা-বৃত্তির পাপ স্বার্থপর বিপ্রের সৃষ্টি। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

ক্ষত্রিয়-যুগে নারীকে পুরুষের একটি মূল্যবান সম্পদ ৰলে বিবেচনা করা হ'ত। নারী পুরুষের সমান অধিকার ঠিক ভাবে না পেলেও সামাজিক সম্মান তার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু

বিশ্ব-যুগে নারীর অবস্থা হয়ে দাঁড়াল গোরু, ভেড়া ছাগলের মত, গৃহস্থালীর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গমাত্র। তাই ক্ষত্রিয়-যুগে নারীকে যেমন বীরভোগ্যা বলে মনে করা হ'ত ও সৰলে অপহরণ করা পুণ্যকর্ম বলে মনে করা হ'ত, বিপ্র-যুগে জিনিসটার ধারা একটু পালটে গেল। এই যুগে নারী হ'য়ে দাঁড়াল পণ্ডিত-ভোগ্যা। স্বামী ব্যাতিরেকে সমাজে তার কোন অস্তিত্ব রইল না। ছলে কৌশলে কোন কোন দেশে একাধিক নারীকে একই পুরুষের অনুগামিনী হতে বাধ্য করা হ'ত। নরকের ভয় দেখিয়ে, সামাজিক শাসনের লৌহদণ্ড উঁচিয়ে তুলে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে দিয়ে নারীকে এমন ভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা হ'ল যে বহুপত্নীকত্ব যে একটি ত্রুটিপূর্ণ জিনিস-এই ৰোধটাও নারীদের মন থেকে সরে গেল। নারীদের কুমারী জীবন যাপন করা পাপ এই ধরণের বিচিত্র যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন দেশে অনূঢ়া ৰালিকাকে মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধকে বিবাহ করতে ৰাধ্য করা হ'ত। কোথাও বা তা'দিকে কল্পিত দেবতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে দেবদাসী নামে অভিহিত করা হ'ত।

ৰলা ৰাহুল্যমাত্র, এই ধরণের বিবাহ পরোক্ষ ভাবে সামাজিক অনাচারেরই মাত্রা বৃদ্ধি করত।

এই ধরণের অবিচার দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকায় নারীদের মনে জেগেছে একটা হীনম্মন্যতা-একটা হতাশার মনোভাব। এই প্রতিকারহীন অত্যাচারে কত লক্ষ লক্ষ নারী যে বিনিদ্র রজনীর অন্ধকারে গুমরে কেঁদে মরেছে, কে তার হিসেৰ রাখে! বিপ্র শাসনের ষ্টীম রোলারের কাছে নরম মাটির ঢেলার মত সে গুঁড়িয়ে গেছে। অনেক দেশের সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে মেয়েলি ছড়া, ব্রতকথায়, তাই দেখি, প্রতিকারের জন্য কোন উপায় না থাকায় শিশুকাল থেকে মায়েরা মেয়েদের শিখিয়েছে তাদের ব্রতের ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাতে যেন তাদের সতীনে পড়তে না হয়। অথবা যেন তাদের সতীন অল্পায়ু হয়। বিপ্র-যুগে দাম্পত্য ৰন্ধন যেন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে পরিণত হল।

শুধু দাম্পত্য ৰন্ধন কেন, সমাজের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই দেখা গেল একটা বজ্র-কঠোর ব্যবস্থা। ক্ষত্রিয়-যুগে সে সমাজ ছিল, ইটের পাঁজার মত সাজানো একটা স্তূপ মাত্র। বিপ্র যুগে তাতে মশলা দিয়ে ইটের মজবুত গাঁথনী তৈরী করে দেওয়া হ'ল। পাঁজার সাজানো ইটের প্রয়োজন বা অভিরুচি অনুযায়ী দেহ থেকে পাপকে সমূলে বিনাশ করবার জন্যে তাকে কর্মযোগীও হতে হৰে, প্রয়োজন হলে নির্মমভাবে আত্মীয়ের বিরুদ্ধে

অস্ত্রধারণ করতে হবে। স্বার্থপরতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন সাধারণ মানুষের জন্যে। গুরু তন্ত্রের, পুরোহিত তন্ত্রের সমস্ত শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ালেন মাথা উঁচু করে। ঘোষণা করলেন তাঁর মনোবিজ্ঞানসম্মত কর্মবাদ। বর্ধমান মহাবীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে খাড়া করতে চাইলেন একটি নূতন জীবনাদর্শকে। কুসংস্কারের পঙ্কিল আবর্তে যারা পাক খেয়ে মরছিল সেই অজ্ঞ নিপীড়িত মানুষের সামনে হজরৎ মহম্মদ তুলে ধরলেন একটি নূতন ধরণের জীবনবাদ। স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন- দুনিয়ার মানুষ একজাত। যে জাতিভেদ-ব্যবস্থা ভারতের সমাজকে পঙ্গু করে রেখেছিল, সমাজের একটি অংশের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল অভ্রংলেহী অহম্মন্যতা আর অন্য অংশের মনে তৈরী করে দিয়েছিল দারুণ হীনম্মন্যতা, সেই জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কবীর আর মহাপ্রভু শুরু করেছিলেন প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ। প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও এই জাতি-ভেদের বিরোধিতা করায় মহাপ্রভুকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। তবু তিনি তাঁর আদর্শে অটল ছিলেন। ধর্মের নামে নিরীহ নারীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা-হিন্দুরা এককালে মনে করত এটা তাদের ধর্ম-জীবনেরই

একটা অঙ্গ। রাজা রামমোহন এর বিরোধিতা করলেন–এই প্রথা বন্ধ করে তবে ছাড়লেন। তাঁর জীবন নাশের কি কম চেষ্টা হয়েছিল? বিদ্যাসাগর স্থানীয় হিন্দু–সমাজকে দিয়ে বিধবার বিবাহ–ব্যবস্থা স্বীকার করিয়ে তবে ছাড়লেন।

ইতিহাসবেত্তা মাত্রেই জানেন, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাপ্রভু, মহাবীর এদের কারুরই চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা। এমন কি কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা আজও এদের ভাল চোখে দেখে না। আপাতঃ দৃষ্টিতে যাঁদের রাজনৈতিক নেতা বলা হয় তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থা বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন–যেমন লেনিন, বার্নার্ড শ, মানেবন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি তাঁদি'কেও বয়ে বেড়াতে হয়েছে মিথ্যা অপবাদের বোঝা। এঁরা পেয়েছেন পদে পদে ৰাধা আর অহেতুক অভিশাপ। এদের একমাত্র অপরাধ ছিল বিপ্রের শোষণ–যন্ত্রের ওপর আঘাত হানা। বিপ্রের সমাজ–ব্যবস্থার সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মানুষের স্বার্থ বা মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের পানে চেয়ে এই ব্যবস্থা তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু যেখানে মানুষের সুবিধা বা মানুষের কল্যাণ ভাবনা বিপ্রের ৰৌদ্ধিক শোষণের সঙ্গে খাপ খায়নি সেখানে বিপ্রের শোষণ–

ব্যবস্থার পক্ষেই রায় দেওয়া হয়েছিল। তাই ক্ষাত্র-যুগে 'বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা' নীতি পালটে গিয়ে নূতন নীতি এল-

"বুদ্ধির্যস্য ৰলং তস্য
নির্ৰুদ্ধেস্তু কুতো ৰলম্।"

বুদ্ধিজীবী বিপ্র ক্রমাগত ৰৌদ্ধিক কর্ষণের ফলে একদিকে যেমন শ্রমবিমুখ তথা দুর্বল-শরীর হয়ে পড়েছিল অন্যদিকে তেমনি মানবীয়তার সমস্ত মাধুর্যই তার মধ্যে ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। পিতা-মাতার স্নেহ-মমতার প্রতিদানে কিছু করা উচিত এই ৰোধের উন্মেষ জেগেছিল ক্ষাত্র-যুগে, আর পিতা-মাতার সেবার মাধ্যমে প্রাপ্ত মানসিক পরিতৃপ্তিই যে মানুষকে উন্নততর অনুভূতির পানে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এই তথ্যটা হৃদয়ঙ্গম করেছিল ৰিপ্র, তাই পিতা-মাতার সেবা বিপ্র যুগে প্রতিদানের স্তরে সীমিত না থেকে ধর্ম-সাধনার অঙ্গরূপে গণ্য হয়েছিল, শুধু পিতা-মাতার সেবাই বা কেন? যে সকল ব্যষ্টির কাছ থেকে মানুষ যা কিছু আধ্যাত্মিক, মানসিক তথা জাগতিক সম্পদ স্নেহের দান

হিসেৰে-বাৎসল্যের অভিপ্রকাশ হিসেৰে পেত তাদের সকলকেই এই বিপ্র গুরু বলে মেনে নিল। আর এই গুরুর প্রতি কর্তব্য নিছক একটা জাগতিক কর্তব্য হিসেৰে রইল না, হয়ে দাঁড়াল জৈব-ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ সাধনা। পিতা-মাতার সঙ্গে পুত্র-কন্যার মাধুর্যময় সম্পর্ক বিপ্রযুগে পারিবারিক জীবনকে ক্ষাত্রযুগের চাইতে অনেক বেশী সুন্দর করে তুলেছিল। ক্ষাত্রযুগের সন্তানেরা যেক্ষেত্রে পিতার বীরত্ব, ঐতিহ্য তথা মর্যাদা রক্ষার দিকে কেবল যত্নবান ছিল, বিপ্র-যুগে সন্তানেরা তার চেয়ে আরও বেশী ভাবতে শিখেছিল। বিপ্রযুগের পিতা-মাতা বা অন্যান্য গুরুজনেরা যেমন কামনা করতেন- "পুল্লাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্ বা শিষ্যাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্", সন্তানেরা তেমনি পারিবারিক বা গুরুকুলের শুধু ঐতিহ্যের পানে তাকিয়ে তাদের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করত না, তারা আদর্শকে সামনে রেখে

বিপ্রের সমাজ ক্ষত্রিয়ের তুলনায় অনেক বেশী দৃঢ় নিৰদ্ধ। ক্ষত্রিয়- সমাজে সামাজিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে বিবাহকালে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল ৰটে, কিন্তু পাত্র-পাত্রীর ব্যষ্টিগত মতামতকে সেখানে উপেক্ষা করা হয়নি, পাত্র-পাত্রীর

মতামতকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েই ঘর বর নির্বাচন করা হ'ত, কিন্তু বিপ্রযুগে তেমনটি আর রইল না। সেখানে ঐতিহ্যের ধারবাহিকতা রক্ষাই বড় কথা হয়ে দাঁড়াল, আর তাই কখনও ঘরকে আর কখনও বরকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে স্বাধীনভাবে দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ নষ্ট করে দেওয়া হ'ল।

বিপ্রের সংস্কৃতিতে সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্প-কলা সবকিছুই ছিল, আর এই সংস্কৃতি মানুষের মনের ভাবকে যতটা বহন করে বেড়াত তার চাইতে বেশী করে তাতে থাকত বিপ্রের বুদ্ধিমত্তার প্রাখর্য, তাই এতে ক্ষাত্র-সংস্কৃতির লোকায়ত ভাবটি অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেল। বিপ্রের সংস্কৃতি গণমানসের জন্যে নয়। তা জনসাধারণের এক মুষ্টিমেয় অংশের স্নায়ুকোষগুলোকে কার্যান্বিত করে তুলত বটে, কিন্তু জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলতে পারত না। বিপ্রশিল্পী নিজের বৌদ্ধিকতার দ্যুতিতেই বিশ্বজয় করতে চেয়েছিল। তার কাব্যে, তার নাটকে, তার লেখায়, তার রেখায় জনসাধারণকে এই বুদ্ধিজীবীর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে চলবার নির্দেশই দেওয়া হ'ত। অবুঝ জনসাধারণ বড় বড় জিনিস বুঝত না। "যা বুঝিনে তা শ্রেষ্ঠ" এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে বিপ্রের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ত।

জনসাধারণকে বিপ্রের মহিমা বোঝাবার জন্যে ৰৌদ্ধিকতাপূর্ণ শিল্প-সাহিত্য যেখানে অসফল হ'ত সেখানে তারা জনসাধারণের চোখে চমক লাগিয়ে তাদের বুদ্ধিকে বিমূঢ় করার জন্যে অজস্র কল্পলোকের পুরাণ, বিপ্রসমর্থনধন্য অজস্র দেব-দেবীর আখ্যান, অজস্র রঙচঙে মাইথোলোজি লিখল, আর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল- এইগুলোকে না মানলে বা এইগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় প্রকাশ করলে 'দোজখ'-বাস বা রৌরব নরক অনিবার্য।

বৈবহারিক জগতের সবকিছুই দোষে-গুণে মেশান। তাই ক্ষত্রিয় যেমন তার স্বভাব-ধর্মের অনুশীলনে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাটা গভীরভাবে ভেবেছিল ও তার ফলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে মানব-সভ্যতার বিরাট হর্য্যের শুধু শিলান্যাসই নয়, তার দেওয়ালের গাঁথনিগুলোকেও মজবুত করার কাজে লেগে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি বিপ্রের স্বভাব-ধর্মী অনুশীলন তাকেও তার সংখ্যাবৃদ্ধির প্ররোচনা যুগিয়েছিল, আর সেই কারণেই শিষ্যের সংখ্যাধিক্যই বিপ্রের অন্যতম নিদর্শন ছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াসে বিপ্রকে যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জনও করতে হ'ত ও তার এই প্রয়াস মানব-সভ্যতার

হর্ম্যটিকে সুন্দর একটি আচ্ছাদন যোগাবার কাজও করে চলেছিল।

অমার্জিতরুচি আদিম প্রকৃতির ক্ষত্রিয় নিজের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে যে লিঙ্গ-পূজার উদ্ভাবন করেছিল তাকে মার্জিতরুচি বিপ্র নূতন ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত করেছিল। সে লিঙ্গকে নিয়েছিল পরমপুরুষের প্রতীক হিসেবে, আর পীঠকে প্রকৃতির প্রতীক হিসেবে। সে ব্যাখ্যা দিয়েছিল, "লিঙ্গতে গম্যতে যস্মাদ তল্লিঙ্গম্" অথবা "যস্মিন্ সর্বাণি লীয়ন্তে তল্লিঙ্গম্।" লিঙ্গ-পূজার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবার সময় কেবল ক্ষত্রিয়-মনোভাবের দিকে তাকালেই চলবে না, বিপ্র-মনোভাবকেও যথোচিত মর্যাদা দিতে হবে, যদিও বাস্তবতার সঙ্গে এই বিপ্র-মনোভাবের কোন সম্পর্কই নেই।

লিঙ্গ-পূজা আদিম ক্ষাত্র সমাজেরই পূজা। শুধু লিঙ্গ-পূজাই নয় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত যে সকল দেবদেবী রয়েছে তাদের বেশীর ভাগই ছিল ক্ষাত্র-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যষ্টি। ভয়ে, ভক্তিতে ক্ষাত্র-যুগের মানুষেরা তাদের পূজা করত। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, প্রভৃতিরাও ছিলেন এক-একজন জবরদস্ত ক্ষাত্র-নেতা। বিপ্র যুগে তারাই ধর্মশাস্ত্রের সমর্থন পেয়ে হয়ে দাঁড়ালেন এক একজন জাগ্রত দেবতা। অনগ্রসর

ক্ষাত্ররা তাদের প্রিয় আহার্য দিয়ে ওই সকল নেতা বা দেবতার পূজা করত তাদের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্যে। নেতাদের মৃত্যুর পরে তাদের স্বর্গলোকবাসী আত্মার তৃপ্তির জন্যে ওই সকল খাদ্যই আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করত।

বিপ্র যুগেও ওই সকল কাল্পনিক দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে সুখাদ্য ও সুপেয় বস্তুসমূহ আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা তো হ'তই, অধিকন্তু তাতে দালালি বাবদ বিপ্রেরও একটা কমিশন নির্দিষ্ট হয়ে গেল। আরও পরবর্তীকালে বিপ্র-প্রাধান্য যখন সমাজের ঘাড়ে ভালভাবে চেপে বসল তখন বিপ্রেরা কমিশনের অতিরিক্ত আরও কিছু পেতে শুরু করল। যে সকল বস্তু যজ্ঞের নামে পুড়িয়ে দেওয়া হ'ত তারও একটা মোটা অংশ না পুড়িয়ে, বিপ্রের পুঁটলিতেই বেঁধে দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'ল অর্থাৎ সে সময়ে শূদ্র ও ক্ষত্রিয়রা পুরোপুরি বিপ্রদাসে পরিণত হ'ল। নিজের এই দোর্দণ্ড প্রতাপ তথা বুদ্ধিমত্তার সুযোগ নিয়ে বিপ্ররা শোষণের সবরকম ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করে তুলেছিল।

ধর্ম-সাধনা, দান-ধ্যান, বিদ্যাভ্যাস, শস্যোৎপাদন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ অথবা অন্য যে কোন জাগতিক অনুষ্ঠান কর না কেন, বিপ্রকে তার একটা ফল দিতেই হবে, নইলে কর্মসিদ্ধি

হবে না। ব্রাহ্মণ-ভোজন তথা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণান্ত না করালে ফললাভ হবে না। বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী, যেগুলোর সৃষ্টি শূদ্র বা ক্ষাত্র যুগে হয়েছিল জন-সাধারণের ভীতম্মন্যতার ফলে (যেমন, দক্ষিণ বঙ্গের কুম্ভীর-দেবতা বা ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণ রায়, সর্পবহুল অঞ্চলে বিষহরি বা মনসা, বসন্তের দেবী শীতলা বা কলেরার দেবী ওলাই চণ্ডী) সেগুলোকেও বিপ্র যুগে বিপ্র পুরোহিতেরা নিজেদের করায়ত্ত করে নিল। দেব-দেবীগুলোর জন্যে তৈরী করে নিল বিভিন্ন ধরণের ধ্যানমন্ত্র, নিজের প্রয়োজন পূর্তির দিকে নজর রেখে তৈরী করে নিল বিভিন্ন ধরণের পূজার ফর্দ, আর সময়ে-অসময়ে দেব-দেবীদের উদ্ভট প্রত্যাদেশের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে জন-সাধারণের ঘাড় ভেঙ্গে আদায় করতে লাগল দান, দক্ষিণা, সিধা ও রকমারি পূজোপকরণ।

এক্ষেত্রে আরও একটা মজার কথা হচ্ছে এই যে, শূদ্র ও ক্ষত্রিয়ের ভীতম্মন্যতা তাদের কল্পিত, দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে জনগণের প্রচলিত ভাষারই ব্যবহার করেছিল, কিন্তু বিপ্ররা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার জন্যে তথা তাদের বুদ্ধিমত্তা, বৈদগ্ধ্য ও ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জাহির করবার জন্য প্রাচীন ভাষাই ব্যবহার করে এসেছে। এরা সব সময়েই

জনসাধারণকে বোঝাতে চেয়েছে যে সোজাসুজি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার অধিকার জনগণের নেই; বিপ্রের মাধ্যমেই তাদের তা করতে হৰে, অর্থাৎ এই ব্যাপারে দালালির অধিকার তাদেরই একচেটিয়া।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে শোষণের জন্যে বিপ্রের দল রকমারি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল বা করেছে, কোথাও বা মানুষের সামনে দেখানো হয়েছে অনন্ত স্বর্গের প্রলোভন ও তার সঙ্গে অনন্ত নরকের ভয়। কোন বিশেষ বিপ্র প্রধানের মতবাদকে ঈশ্বরের বিধান বলে ঘোষণা করে মানব-মনীষার স্বাভাবিক স্ফূর্তি রুদ্ধ করে দিয়ে তাদের ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া করে দেওয়া হয়েছে। সুদীর্ঘকালের জন্যে নিজের আসন সু-উচ্চে রাখবার মতলব নিয়ে কোন কোন বিপ্র-প্রধান নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলে ঘোষণা করেছে, আর নিজের ঘোষিত তথাকথিত শাস্ত্রের মাধ্যমে জন-সাধারণকে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছে যে তার স্থান ঈশ্বরের যত নিকটে আর কোন মানুষ ঠিক সেখানটিতে পৌঁছাতে পারৰে না, অর্থাৎ জন-সাধারণের মনে চিরদিনের জন্যেই থেকে যাৰে একটা হীনম্মন্যতা, আর এই হীনম্মন্যতার ফলেই তারা ওই সকল বিপ্র-প্রধানের উক্তিকে

ভয়ে-ভক্তিতে মেনে চলতে থাকৰে। ৰুদ্ধিবাদী মানুষকেও তাই তাদের পাল্লায় পড়ে বলতে হয়েছে "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর" বা "মজহব মে আকল কা দখল নহী হৈ"। এক শ্রেণীর বিপ্রের দল যে আজকের দিনেও 'ধর্ম-শিক্ষা ধর্ম-শিক্ষা' বলে চিৎকার করে বা 'ধর্মরাষ্ট্র ধর্মরাষ্ট্র' বলে আকাশ ফাটায় তারা আসলে চায়, বুদ্ধিধর্মী শিশুমন বৌদ্ধিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্মের কুসংস্কারের টানা-জালে বাঁধা পড়ুক ও উত্তরকালে তারাই বিপ্রশোষকের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হোক।

ভগবানকে আদর্শ পুরুষরূপে মানতে গেলে অবশ্যই বলতে হৰে যে, তিনি ন্যায় বিচার করেন। ভাল হয়ত সৰাইকে ৰাসেন, সে ভালবাসা সত্ত্বেও পাপীকে পাপের শাস্তি দেন। তবে হ্যাঁ, এতটুকু বলা যেতে পারে যে পাপীকে শাস্তি দেবার সময়ে তাকে ক্লেশ দেবার উদ্দেশ্য থাকে না, উদ্দেশ্য থাকে শোধরাবার। ভগবান সম্বন্ধে এই মনোভাবটাকেই আমি খুব উদার মনোভাব ৰলে মনে করি। ভগবান যদি হন বিশ্ব-পিতা সেক্ষেত্রে তাঁর কাছে জাতিগত, রাষ্ট্রগত, সম্প্রদায়গত বা অন্য কোন প্রকারের একদেশদর্শিতা থাকতে পাৰে না। জিনিসটা যদি এরকমেরই হয়, তাহ'লে কোন মৃত ব্যষ্টিকে স্বর্গে

পৌঁছিয়ে দেবার ঠিকা বিপ্ররা কিভাবে নিতে পারে? শুণতে পাই, কোন কোন সম্প্রদায়ের বিপ্রদের কাছে স্বর্গলোকের সীলমোহরও থাকে। এমনও শুণতে পাই যে, থোক কিছু অর্থদান করলে ওই দাতার নামে অখণ্ড কীর্তনও করে দেওয়া হয় ও দাতাকে স্বর্গলোকের টিকিট দিয়ে দেওয়া হয়, বলা হয় অন্যে তার নামে যে ভজন-কীর্তন করছে তার ফলেই ওই অর্থদাতার স্বর্গগতি হবে।

পাপকে প্রশ্রয় দেবার কি সুন্দর দর্শন! যাই হোক, মানুষের দুর্বলতার কোন সুযোগ নিতেই এই বিপ্রের দল ছাড়েনি ও আজও ছাড়ে না।

উদর-উপস্থজীবী বলতে ঠিক যা বোঝায় ক্ষত্রিয় তা নয়, বিপ্রও তা নয় কারণ আদর্শ-পরায়ণতা ৰলে একটা জিনিস এদের দু'য়ের মধ্যেই আছে। নীচতা-হীনতা উদর-উপস্থপরায়ণতার তমিস্র ভ্রুকুটির পাশে ক্ষত্রিয়ের যেমন থাকে একটা আদর্শনিষ্ঠ তেজোদৃপ্ত রক্তিমাভা, বিপ্রের মধ্যেও তেমনি থাকে একটি শুভ্রোজ্জ্বল ৰৌদ্ধিক দ্যুতি যা আদর্শনিষ্ঠার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের জন্যে বিচ্ছিন্ন হলেও তা পুনঃ সংযুক্ত হয়ে যায়, কারণ আদর্শনিষ্ঠাহীন ৰৌদ্ধিকতা দীর্ঘকাল নিজেকে দ্যুতিমান করে রাখতে পারে না। তা

ব্যষ্টিস্বার্থের অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তাই ইতিহাসের পুরোনো পাতায় এমন অজস্র দৃষ্টান্তই পাই যেখানে দেখেছি আদর্শনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় নিজের মান-সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করে মরেছে ঠিক সেখানে আদর্শনিষ্ঠ বিপ্র নিজের মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করেছে, জয়ী হয়েছে অথবা হেরে গিয়ে আত্মগ্লানিতে মরেছে। রাজনৈতিক চাপে অথবা প্রতিপক্ষের অস্ত্র-প্রদর্শনে ভীত না হয়ে যেসকল ব্যষ্টি নিজেদের ধর্মমত (religion) বাঁচাতে চেয়েছে বা চেয়ে থাকে অথবা বাঁচাতে গিয়ে যারা মরেছে বা বাঁচাবার জন্যে যারা মরতে প্রস্তুত- তাদের মধ্যে ৰৌদ্ধিক স্তর উন্নত হোক বা না হোক, মানসিকতার বিচারে তারাও বিপ্রপদবাচ্য।

কেবল ধর্মীয়ই নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা কোন সামাজিক মতবাদ-যা হয়ত ব্যষ্টিবিশেষের পৌরুষের ওপর (ক্ষত্রিয়ের ওপর) আঘাত হানে না তাও যদি জোর করে কোন মানুষ বা গোষ্ঠীর ওপর চাপাবার চেষ্টা করা হয় সেক্ষেত্রে জনগণের যে অংশ থেকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা প্রতিশোধের বৃত্তি জেগে উঠৰে সেই অংশও বিপ্রপর্যায়ভুক্ত।

শূদ্র-স্বভাবের মানুষেরা নেতৃত্বের জন্যে যাদের মুখের পানে চেয়ে থাকে এককথায় বলতে গেলে তারাই ক্ষত্রিয়। শূদ্রেরা ক্ষত্রিয়ের নির্দেশে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়ে যদি কোন মহৎ কর্মে অংশভাগীও হয়, তবু তারা সম্পূর্ণভাবে অথবা প্রায় সম্পূর্ণভাবে অখ্যাতই থেকে যায়। যুদ্ধের সেনাপতিদের তথা বড় বড় বীর সৈনিকের নামও ইতিহাসে লেখা থাকে। চারণ-কবিরা তাদের নিয়ে সঙ্গীত-গাথাও রচনা করে কিন্তু ওই যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কাজে যে শূদ্রেরা বুকের রক্ত ঢেলে-দেয় তারা অজ্ঞাত থেকে যায়। ক্ষত্রিয় তার বীরত্ব ও পৌরুষের দ্বারা যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তা' সে যুগের মানুষের কাছে অজ্ঞাত-অশ্রুত থাকে না, কারণ আলোড়নটা যে সেই যুগেই হয়েছে। কিন্তু শূদ্র অজ্ঞাত থাকে, কারণ তার সেবা মহাকালের পাতায় লেখা থাকলেও তার রেখা জনগণের মনে আঁকা থাকে না, তাই খবরের কাগজের পাতায় তার মৃত্যু সংবাদ ছাপাবার জায়গা পাওয়া যায় না, তার জন্যে স্থায়ী কৰর গড়ে তুলে স্মারক ফলক প্রতিষ্ঠা করা অনাবশ্যক বিবেচিত হয়, একটা লোকের জন্যে অতখানি জমি ছেড়ে দেওয়া সম্ভব কি! গাদার মড়া হিসেবেই তাদের পুঁতে ফেলা হয় বা আধ-পোড়া অবস্থায় নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

শূদ্র (বেঁচেও) থাকে অখ্যাত, শূদ্র মরেও থেকে যায় অখ্যাত। কিন্তু বিপ্র? বিপ্রের অবস্থাও কতকটা তারই মত নয় কি? ক্ষত্রিয় বিক্রমাদিত্যকে বাদ দিয়ে তার বিপ্র নবরত্নকে ভাবতে পারি কি? না, তা পারি না বটে তবু বিপ্রের ৰৌদ্ধিকতা অজ্ঞাত বা অশ্রুত থাকে না বা থাকতে পারে না। যে যুগে যে বিপ্র যে ক্ষত্রিয়ের আশ্রিত সে যুগে বিপ্রের সম্মান হয়ত বা ক্ষত্রিয়ের তুলনায় ম্লান, কিন্তু বিপ্র যুগে এই ধরণের ব্যাপার হয় না। বিপ্র যুগে যে বিপ্রের অভ্যুদয় হয়েছিল বা হয়েছে সে যুগে তাকে সম্মান বা স্বীকৃতি পেতে দেরী হয় না। ক্ষাত্র যুগে যে বিপ্রের অভ্যুত্থান হয়েছিল তার প্রতিভা পরবর্তী বিপ্রযুগে অবশ্যই যথাযথ স্বীকৃতি পেয়ে থাকে।

হ্যাঁ, একথা অবশ্যই ঠিক যে, ক্ষাত্রযুগে সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের যে প্রতিষ্ঠা, বিপ্রযুগে অর্থনৈতিক মনীষা, ৰৌদ্ধিকতা বা বৈদুষ্যের চক্রে বিপ্রের প্রভাব তার চেয়েও বেশী। তবে একথাও ঠিক যে, কোন বিপ্রই নিজের প্রতিভার স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না ও ঠিক এই সময়টিতে তাকে নানান ধরণের ৰাধাই পেতে হয়– নানান ধরণের নিন্দা, গ্লানি, অপবাদ সহ্য করতে হয়। এর

কারণও খুৰ সোজা। পুরাতনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ মজ্জাগত। তাই যখন কোন বিপ্র-মনীষার মাধ্যমে নূতন ধরণের কোনকিছু ব্যক্ত বা স্ফূর্ত্ত হয় অবশিষ্ট মানুষেরা-তা' তারা শূদ্র, বিপ্র বা ক্ষত্রিয় যাই হোক না কেন-তাকে সহজ মনে নিতে পারে না। এই নোতুন ধরণের গতির ছন্দে তাল রেখে তারা চলতে পারে না, তারা পুরোনো তালেই চলতে চায়, আর তাই ৰাধে সংঘর্ষ, তাই হয় কটূক্তিবর্ষণ, অযথা নিন্দাবাদ। কিন্তু ওই বিপ্রেরই প্রচারিত কোন মতবাদ অথবা সৃষ্ট নূতন কোন কিছু বৈদগ্ধের নিদর্শন যখন কিছুটাও পুরোনো হয় (এই পুরোনো হ'তে দু'-চার মাসও লাগতে পারে, আবার দু'-চার শতাব্দীও লাগতে পারে) তখন স্বাধীন বিচারশীল বিপ্রদের একাংশ তার ওই সৃষ্টিকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, তারিফ করে ও তার প্রতিষ্ঠার জন্যে যত্নশীল হয়। ঠিক এই কারণেই প্রখ্যাত দার্শনিক কার্ল মার্কস নিজের যুগে সম্মান পান নি, পেয়েছেন অনেক দিন পরে।

সেক্সপীয়র, গ্যালিলিও প্রভৃতিরা নিজেদের যুগে প্রায় অখ্যাতই ছিলেন অথচ আজকের বিদগ্ধ সমাজ তাঁদের নিয়ে মাতামাতি করে। রবীন্দ্র-প্রতিভার যখন প্রথম স্ফূরণ হয় তখন ৰাঙলার কবি-সাহিত্যিকেরা তাঁকে দাবিয়ে রাখার-তাঁকে

হেনস্থা করার কোন চেষ্টারই কসুর করেনি অথচ আজ সেই **রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ** কবি হিসেবে সর্বত্র পূজ্য, সর্বত্র বরেণ্য। শুণতে পাই, ৰাঙলার প্রখ্যাত কবি চণ্ডীদাসকে (ইনি পাঠান আমলের পূর্বেকার কবি) তাঁর সময়ের লোকেরা অকথ্য ভাবে নির্যাতন করেছিল। শোণা যায় তারা না কি তাঁর বাড়ী ঘরে আগুন লাগিয়ে তাঁকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেছিল। অথচ তার অনুমানিক ২০০/২৫০ বৎসর পরে মহাপ্রভু চৈতন্যের সময় সেই চণ্ডীদাসই ৰাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিরূপে পূজিত হতে লাগলেন। তাঁর গ্রামের লোকেরা এখন তাঁকে নিয়ে গর্ব বোধ করে, তাঁর নামে স্মারক মন্দিরও তারা গড়েছে বা গড়তে চায়। তাই বলছিলুম বিপ্ররা অখ্যাত থাকে না। বিপ্রের খ্যাতি অনেক সময় দেশ-কাল-পাত্রের সীমা ছাপিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

শূদ্রের সঙ্গে শূদ্রের সংঘাত কেবল স্বার্থেরই সংঘাত, অন্যান্য জন্তু জানোয়ারদের ন্যায় এই উদর-উপস্থজীবী মানুষগুলো কেবল ব্যষ্টিগত বা পারিবারিক ধান্ধাতেই ব্যস্ত থাকে। মানুষের সামাজিক প্রগতিতে এরা কোন উল্লেখযোগ্য স্পন্দন জাগাতে পারে না বলে সমাজে স্বাভাবিক নিয়মেই এদের দাম খুব কম। ক্ষত্রিয়ের সংঘাত পৌরুষের সংঘাত, তরবারির সঙ্গে

তরবারির সংঘাত, আর বিপ্রের সংঘাত বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির সংঘাত, কৌশলের সঙ্গে কৌশলের সংঘাত, কূটনীতির সঙ্গে কূটনীতির সংঘাত। এই সংঘাতে সাধুতা থাক বা না থাক এর আলোড়ন অত্যন্ত প্রচণ্ড। এই আলোড়নে সমাজের ভিত্তিমূল নড়ে ওঠে, আর তাই প্রকৃত বিপ্র বা বিপ্র-নেতা যখন পৃথিবী থেকে চলে যায় তখন তার যাত্রাপথের পদচিহ্ন দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী বুকে আঁকা থেকে যায়। ক্ষত্রিয়ের পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করে বিপ্রের মনীষা, ক্ষত্রিয়ের শৌর্যকে শুকিয়ে কুঁকড়ে মেরে ফেলে দেয় বিপ্রের কূটনীতি। তাই ক্ষত্রিয়ের কাছে বিপ্র দেবতা, তাই ক্ষত্রিয় বিপ্রের পদতলে লুটিয়ে পড়ে, বিপ্রের অঙ্গুলি-হেলনে ওঠাবসা করে, বিপ্রের ইশারায় তার তরবারির গতি নির্ধারিত হয়। ক্ষাত্রযুগের পর বিপ্রযুগের প্রতিষ্ঠা সহজ হয় না বটে, কিন্তু যখন হয় তখন তা অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষত্রিয় সমাজকে অক্টোপাসের বজ্র- ৰন্ধনে বেঁধে' ফেলে।

শূদ্রের আছে কেবল বর্তমান, ক্ষত্রিয়ের আছে অতীত ও বর্তমান দুই-ই, আর বিপ্রের আছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনই। তাই কখনো দেখি, বিপ্র অতীত নিয়ে বেশী মাথা-ঘামিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করে চলেছে, আর কখনও বা ভবিষ্যৎকে নিয়ে বেশী মাথা-ঘামিয়ে অতীত ও

বর্তমানকে উপেক্ষা করছে। বিপ্রের তিনটি কাল থাকলেও তিনকালের ভারসাম্য নেই। অতীতের স্মৃতির রোমন্থন করে, অতীতকে অযথা গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান-ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করে বিপ্র শুধু নিজেরই ক্ষতি করেনি, সমাজের সকলেরই ক্ষতি করেছে ও করে থাকে। নূতন কোন ভাবধারা বা মতবাদ বা জীবনাদর্শ সামনে এসে গেলে শূদ্রেরা গোড়ার দিকে তার বিরোধিতা করে আর পরে দলবদ্ধভাবেই তাকে গ্রহণ করে কিন্তু বিপ্রের বেলায় তেমনটি হয় না। এক শ্রেণীর বিপ্র অতীতের মোহে অন্ধ হয়ে দীর্ঘকাল ধরে তার বিরোধিতা করে চলতে থাকে। হয়ত বা তার ফলে সমাজের এক একটা অঙ্গই খসে পড়তে থাকে, তবুও বিপ্রের হুঁস হয় না, যেমন হুঁস হয়নি আজকের যুগেও মোল্লা-পাদ্রী বা এক শ্রেণীর গুরু-পুরোহিতের দলের। হিন্দু সমাজের যখন এক একটা অঙ্গ খসে পড়েছিল তখনও তাদের কাউকে কাউকে আমি বলতে শুণেছি যে, সনাতন-ধর্ম ভগবানের তৈরী- এই ধর্ম অনাদি কাল থেকে চলে এসেছে ও অনাদি-কাল চলবে, কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না।

রাজনৈতিক কারণে সনাতন ধর্মকে বাঁচাবার প্রচেষ্টায় যারা ভিটামাটি ছেড়ে ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তাদেরও কারো

মুখ থেকে আমি এ-ধরণের কথা শুনেছি, অর্থাৎ তাদের এখনও চোখ ফোটেনি, এখনও আক্কেল হয়নি। ভারতে যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তন হয় তখনও চতুষ্পাঠীর ব্যাকরণ- সর্বস্ব-শিক্ষার স্তাবকতা করতেও এক শ্রেণীর পণ্ডিতকে এগিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল। অতীতের অন্ধ-মোহে তারা নিজের ছেলেদের ইংরেজী স্কুলে পাঠাতে চান নি, কিন্তু এর ফলে তাদের কি কল্যাণ সাধিত হয়েছিল? দু'পুরুষ পরে সেই ইংরেজী-শিক্ষাকেই গ্রহণ করতে হ'ল, মাঝ থেকে সামাজিক প্রগতি কিছুটা পেছিয়ে গেল। ঠিক সেই যুগেই এক শ্রেণীর কাঠ-মোল্লা ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করলেন যে, ওটা নাকি না-পাক ভাষা, বাঁ থেকে ডান দিকে লেখা হয়, ও ভাষা শিখলে মোছলমানের মোছলমানত্ব থাকৰে না, সৰাই খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। মুসলিম বিপ্রদের এই মনোভাব ভারতে মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল ও পরে আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সেই ক্ষতির খেসারতের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

অত্যধিক ভবিষ্যৎ চিন্তাও কোন কোন বিপ্রের একটি বড় দুর্গুণ। কল্পিত স্বর্গ-নরকের ভাবনা জন-সাধারণের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে অন্যকে শোষণ যেমন বিপ্র করেছিল,, তেমনি

নিজেরাও ওই মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে বর্তমান ও অতীতকে উপেক্ষা করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কল্পিত স্বর্গ-নরকটাই বড়, আর অতীতের ঐতিহ্য, বর্তমানের মাটি মিথ্যা-মায়া, এই মতবাদ সমাজের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এই ধরণের বিপ্র-মনোভাবের অন্যতম অভিব্যক্তি হ'ল অদ্বৈতবাদাশ্রয়ী মায়াবাদ, যাতে অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্যরূপে মেনে নিয়ে জীব ও জগতের অস্তিত্বটাকেই নস্যাৎ করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূলতঃ বুদ্ধিজীবী হওয়ায় ৰৌদ্ধিকতা-ভিত্তিক একটা ধর্মাচরণ বিপ্রের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকে। অন্যকে শোষণের উদ্দেশ্যে যে একটা লোক-দেখানো ধার্মিকতা আমি এখানে সেটার কথা বলছি না। লোক দেখানো ধার্মিকতা তো শোষক বিপ্রের শোষণের অঙ্গ, কিন্তু বৈয়স্টিক জীবনে তার যে একটা ধর্ম-ভাবনা আমি এখানে সেটার কথাই বলছি। বৃদ্ধি-প্রধান ব্যষ্টি যখন বুদ্ধির সাহায্যে জটিল কোন সমস্যার কূল-কিনারা পায় না তখন সে ঈশ্বরের কাছ থেকে মুক্তি চায়। এটা একটা হেরে যাওয়ার মনোভাব-পলায়নী বৃত্তি। বিপ্রের ধর্ম-ভাবনা কতকটা এই ধরণের। অবশ্য ভয়-মিশ্রিত ধর্ম-ভাবনা যা শূদ্রের মধ্যে প্রকটভাবে থাকে অথবা ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের

মধ্যেও মোটামুটি রকমের থাকে, বিপ্রতেও তার অভাব থাকে না। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে ঈশ্বরনিষ্ঠা হয়ে থাক বা না থাক এক ধরণের রুটিন-মাফিক ধর্মাচরণের প্রতি বিপ্রের ঝোঁক দেখা যায়। "যজেৎ যষ্টব্যমিতি" অর্থাৎ নিয়মমত পূজা, অর্চনা, মালা ঘোরানো বা নিয়মমত প্রার্থনা দিনে অতবার অমুক সময়ে করা উচিত, তাই করে যাচ্ছি, এই মনোভাবের পেছনে মনের যে বৃত্তি কাজ করে তা' হ'ল ভীতন্মন্যতা।

বিপ্রের ধর্মাচরণে ধর্মের আত্মিক দিকটা অস্পষ্ট হলেও একেবারে নেই নয়। কিন্তু আত্মিকতা তাতে যাই থাক তা ৰৌদ্ধিক শাসনের, ৰৌদ্ধিক শোষণের অথবা প্রতিষ্ঠালাভের ভাবনায় একেবারেই ঘোলাটে হয়ে যায়। যুক্তিগত বিচারে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম-ভাবনা যেখানে সোজাসুজি জাগতিক বাসনা-কামনার অভিব্যক্তি অর্থাৎ রাজসিকী, সেই বিচারে বিপ্রের ধর্ম-ভাবনা সাত্ত্বিকী পর্যায়ভুক্ত নয়। তাতে শূদ্রোচিত তামসিকী ও ক্ষত্রিয়োচিত রাজসিকী ভাবনার খাদ মেশানো থাকে। ধর্ম-জীবনে যে সংযমের প্রয়োজন বিপ্র তা ৰোঝে ও আংশিকভাবে তাতে প্রতিষ্ঠিত হ'বার চেষ্টাও করে, কিন্তু এই

খাদ-মেশানো ভাবনার জন্যে সে তার সংযম-লব্ধ ধর্ম-বুদ্ধিকে ৰৌদ্ধিক প্রতিষ্ঠার কাজেই বেশীটা লাগিয়ে ফেলে।

শৃঙ্খলা ও একতাৰোধের দ্বারা সমাজের শিলান্যাস হয়, আর এই কাজ করে ক্ষত্রিয়। একতা ও শৃঙ্খলা সমাজের ভিত্তিরূপে গণ্য হলেও সমাজের সেটা সবকিছু নয়, কারণ একতা বা শৃঙ্খলা-ৰোধও দাঁড়িয়ে থাকে একটা সাধারণ মানসিকতার ভিত্তিতে। ক্ষত্রিয়ের পৌরুষ-আশ্রয়ী মানসিকতা দৃঢ়- নিৰদ্ধ সমাজ গড়তে পারে না। তার জন্যে দরকার বিপ্রের বৌদ্ধিকতাশ্রয়ী মানসিকতার অর্থাৎ একটি নীতি-ভিত্তিক সমাজচেতনা। এই চেতনা বিপ্রযুগে বিপ্রের কাছ থেকে পাওয়া যায়, আর তাই বস্তুতঃ সমাজ ৰলতে যা' বুঝি সেটা ঠিকভাবে উপলব্ধ হতে থাকে বিপ্রযুগে। ক্ষত্রিয়ে-ক্ষত্রিয়ে যেমন থাকে পৌরুষে-পৌরুষে সংঘাত, বিপ্রে বিপ্রে তেমন থাকে মতের সংঘাত, শাস্ত্রগত সংঘাত। এই মতের সংঘাত ও শাস্ত্রগত সংঘাতের পরিণামে সৃষ্ট হয় বিভিন্ন ধরণের দর্শন। দর্শন শাস্ত্রগুলোর মধ্যে যুগোপযোগী মনীষার যথেষ্ট অভিব্যক্তি ঘটলেও তাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপ্রের স্বার্থ-প্রণোদিত ভাবটুকুও চাপা থাকে না। তবু শোষণের সুযোগ যতই থাক না কেন বিপ্রের শোষণাত্মক দর্শন কখনও মনীষার গলায়

ছুরি বসায় না। বিপ্র-দর্শনের ফলে কোথাও কোথাও পরোক্ষভাবে বৈশ্যের কিছুটা সুবিধে হয়ে গেলেও সে দর্শন বৈশ্যের শোষণকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। হিন্দু ষড়দর্শন ও প্রাচীন ইয়ুরোপীয় দর্শনগুলি মূলতঃ বিপ্রদর্শন। বিপ্রদর্শনের বিরুদ্ধে অথবা বিপ্র শোষণের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ তাকে সূক্ষ্ম বিচারে জড়বাদী দর্শন না বললেও তারা যে নাস্তিক্য-দর্শন তাতে কোন সংশয় নেই। এই দর্শনগুলির 'বিরুদ্ধে যুঝবার জন্যে বিপ্রযুগে কিছু সংখ্যক বিপ্র পুরাতন দর্শনের ওপরে নূতন নূতন টীকা-টিপ্পনী লিখে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। বৌদ্ধ নাস্তিক্যবাদকে পরাস্ত করার জন্যে শঙ্করের উদ্ভাবিত মায়াবাদ এর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

সমাজ রাখতে গেলে শাসনের দরকার, আর শাসন রাখতে গেলে দরকার রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার। ক্ষত্রিয় তার জড়শক্তির সাহায্যে যে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা চালু করে বিপ্রযুগে তা ঠিকই থাকে, কেবল জড়শক্তির ওপরে স্থান লাভ করে ৰৌদ্ধিকতা। ৰৌদ্ধিক শক্তিই জড়শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাগজে-কলমে অথবা আপাতঃদৃষ্টিতে সে সময়েও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষত্রিয়ের হাতে থাকলেও আসলে কিন্তু সে ক্ষত্রিয় বুদ্ধিজীবী বিপ্রমন্ত্রীর

অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়। বিপ্র- মন্ত্রী বা বিপ্র রাজ-গুরুর পরামর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে বিপ্রযুগীয় ক্ষত্রিয় রাজা নিজের অনর্থ ডেকে আনতে চায় না। যদি সে তা চায় সেক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে তা করতে পারে না বা পারলেও তার সে কাজ বিক্রান্তি বা প্রতিবিপ্লবের অঙ্গ হওয়ায় খুবই অল্পস্থায়ী হয়। পৃথিবীর অনেক দেশেরই মধ্যযুগীয় রাজারা এই ধরণের কাজ করেছিলেন বা করার চেষ্টা করেছিলেন, তাদের কারুরই পরিণাম ভাল হয়নি। কারণ সেটা ছিল বিপ্র যুগ। বিপ্র চাণক্যের বিরুদ্ধে যাওয়ায় মগধের নন্দ-বংশকে শোচনীয় পরিণামের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। আর বিপ্রানুগ চন্দ্রগুপ্তকে বিপ্রের দাস হিসেবেই রাজত্ব চালিয়ে যেতে হয়েছিল যদিও তার মধ্যে শৌর্য, বীর্য বা জনপ্রিয়তা কোনটারই অভাব ছিল না। বস্তুতঃ রাজার খেয়ালখুশীর পরিবর্তে একটা আইনের কাঠামো তৈরী করে তার দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থাৎ লিখিত বা অলিখিত সংবিধানের দ্বারা রাষ্ট্রিক কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করা বিপ্র মনীষারই অবদান।

শৃঙ্খলার খাতিরেই শৃঙ্খলা অথবা সংগ্রামের সাফল্যের জন্যেই শৃঙ্খলা- এটাই হচ্ছে ক্ষত্রিয় সমাজে শৃঙ্খলা-বোধের আসল কথা। বিপ্র সমাজেও শৃঙ্খলা থাকে কিন্তু সেই শৃঙ্খলা

নীতিৰোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক কাঠামো বজায় রাখবার জন্যে তথা তার বিকাশের জন্যেই এই শৃঙ্খলা, তাই বিপ্র- শৃঙ্খলা কখনো সমাজ-চেতনার বিরুদ্ধে যেতে পারে না ও দেশ-কাল পাত্রাদি ভেদে সেই শৃঙ্খলার ধরণ-ধারণও পালটে যায়। শৃঙ্খলা যদি সমাজের ক্ষতির কারণ হয়, বিপ্র-সমাজ তাকে উৎসাহ দেয় না। মহাভারতে এক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের বলছেন- "কথা দিয়ে কথা রাখতে হয় কারণ সেটাই ধর্ম, কিন্তু যদি দেখা যায় কথা রাখতে গেলে অনর্থ ঘটৰে সেক্ষেত্রে কথা না রাখাই ধর্ম।" এটা ক্ষাত্র যুগের কথা নয়, বিপ্র যুগের কথা। বিপ্র বলে সমাজের মানুষ শাসন তথা শাসনাশ্রয়ী শৃঙ্খলাকে বড় করে দেখৰে না, বড় করে দেখৰে অনুশাসনকে আর এই অনুশাসনের অর্থ হচ্ছে- "হিতার্থে শাসনম্ ইতি অনুশাসনম্।"

আদিম ক্ষাত্র যুগে ক্ষাত্র পিতা বা সর্দারের নির্বাচন ক্ষাত্রোচিত যোগ্যতার ভিত্তিতেই করা হ'ত ও এই নির্বাচন যে সর্বদা শান্তিপূর্ণ উপায়ে হ'ত তা নয় ও পরবর্তী কালে মূলতঃ সংঘর্ষ ও বিভেদ এড়াবার জন্যেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রধান উত্তরাধিকারী রূপে স্বীকার করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। বিপ্র যুগেরও পটপরিবর্তন ঘটেছিল কতকটা এই ভাবেই।

গোড়ার দিকে বিদ্যা, বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যতাই ছিল যোগ্যতার মাপকাঠি ও তারই ভিত্তিতে বিপ্র- পিতা নির্ধারিত হ'ত, আর যারা এই বিপ্র-পিতার প্রাধান্য স্বীকার করে নিত তাদের আশ্রয়ী বা তদ্গোত্রীয় বলা হ'ত ও এই কারণে গোত্রান্তরণ ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল অর্থাৎ এক বিপ্রের আশ্রয় ত্যাগ করে, তার প্রভুত্বের আওতার বাইরে গিয়ে অন্য বিপ্রকে শ্রেষ্ঠরূপে গ্রহণ করাকেই গোত্র ত্যাগ বলা হত। ধর্ম বা সাধনাগত কারণে যারা বৈদিক আচার ত্যাগ করে অনার্য তান্ত্রিক আচার গ্রহণ করতো তাদেরও তাই বলা হ'ত "আত্মগোত্রং পরিত্যজ্য শিবগোত্রং প্রবিশতু"। সেকালের এশিয়ায় কাশ্যপ (কাশ্যপ সাগর বা Caspian Sea এঁরই নামে) নামে একজন খুব বড় আর্য বিপ্র ছিলেন। অনার্য বা অবৈদিকদের অনেকেই তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিল-তাঁর আশ্রয় নিয়েছিল। তারা সবাই হয়ে গিয়েছিল কাশ্যপ গোত্রীয়। তাই আর্যই হোক, অনার্যই হোক পরবর্তীকালে একটা প্রথাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে যার গোত্র জানা নেই বা যাঁর গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ আছে সে-ই কাশ্যপ গোত্রীয় নামে পরিচিত হতে পারবে।

পৃথিবীর যে সকল সমাজে বহিঃশত্রুর চাপে অথবা বিরুদ্ধ প্রকৃতির উৎপীড়নে মানুষ জাতকে খুব বেশী একতাবদ্ধ হয়ে

থাকতে হ'ত, ক্ষাত্রযুগে ও বিপ্র যুগে তাদের মধ্যে মাতৃগত কুল ব্যবস্থাই প্রচলিত থেকে গিয়েছিল। আর্যের সংস্পর্শে এসে গোত্র-প্রৰর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও মাতৃ-প্রাধান্য তাতে নষ্ট হয়নি। মাতৃ-প্রাধান্য ধাক্কা খেয়েছিল অনেক পরবর্তীকালে বৈশ্যযুগের শেষাংশে। মাতৃগত কুল ব্যবস্থা যে সব মানবগোষ্ঠীর ছিল, পিতৃকুল-প্রধান আর্য তথা অন্যান্য মানব-গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসায় বিপ্র যুগে তাদের মধ্যে বড় রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল ও বিপ্র মাতৃগত কুল ব্যবস্থা ত্যাগ করেছিল অথবা পিতৃগত ও মাতৃগত কুলব্যবস্থা দু'টির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করে নিয়েছিল, পিতৃ-প্রধান আর্যের প্রভাব অপেক্ষাকৃত দেরীতে পড়ায় ও তার প্রভাবের মাত্রাও খুব অল্প থাকায় খাসিয়া ও আরও অনেকগুলি আদিম জাতির মধ্যে এখনও মাতৃভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ায় মালয়ালী সমাজে এখনও অল্প- বিস্তর মাতৃ-প্রাধান্য রয়েছে। *

** বাংলা ও কেরলের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে বটে কিন্তু সমাজ জীবনে আর্য-প্রভাব অত্যন্ত অল্প, তার কারণ হচ্ছে মানসিকতায় আর্যদের সঙ্গে তাদের মূলগত পার্থক্য। আচার-ব্যবহার ও আকৃতি-প্রকৃতিতে ৰাঙালী-*

মালয়ালীদের নিকট-সাদৃশ্যের ফলে অনেকেই এমন কথাও ভেবে থাকেন যে বাঙলার লোকেরাই কেরলে গিয়ে বসবাস করে ও মালয়ালী সমাজের পত্তন করে। এনিয়ে পণ্ডিতেরা গবেষণা করে দেখতে পারেন।

অনুরূপ ভাবে মূলতঃ দ্রাবিড় হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত আর্যের সংস্পর্শে আসার ফলে ৰাঙালীরা পিতৃ-প্রাধান্য মোটামুটি ভাবে মেনে নিয়েছে, যদিও বাঙালীর সমাজ-ব্যবস্থা পিতৃগত ও মাতৃগত কুলব্যবস্থার একটি সমন্বয়।

সমাজ জীবনের অন্তরালে ৰাঙালী এখনও মাতাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে-পিতাকে নয়, কিন্তু সমাজের বাইরের খোলসটা পিতৃ-প্রধান। বিপ্র- সমাজেও কিন্তু বংশগত ভাবে বিপ্র-পিতা নির্বাচনের ব্যবস্থা কালক্রমে প্রচলিত হয়েছিল ও এটা হবার কারণ ছিল মূলতঃ দু'টো। প্রথমতঃ বিনা পরিশ্রমে অর্থোপার্জনের সুযোগ বিপ্ররা পেয়েছিল। সে সুযোগ তারা তাদের বংশধরদের জন্যেও কায়েম রাখতে চেয়েছিল ও বংশধরেরাও বসে বসে খাবার সুযোগ পেয়ে সে সুযোগ ছাড়তে সম্মত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বিপ্রের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবশতঃ তাদের ক্ষত্রিয় ও শূদ্র অনুগামীরা তাদের সন্তান-সন্ততিগণকেও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত ও সম্মানের

আসনে বসাতো। যোগ্যতা থাক বা না থাক বিপ্রের সন্তানও কতকটা বিপ্রের মতোই সম্মান পেতে আরম্ভ করলো। অযোগ্য বিপ্রের এই বংশগত কারণে খ্যাতি লাভই শেষ পর্যন্ত হিন্দু-সমাজে জাতিভেদ ব্যবস্থাকে কায়েম করে দিয়েছিল।

বিপ্রযুগে সিংহাসনে বসে থাকত রাজা কিন্তু আসলে রাজত্ব করত বিপ্রমন্ত্রী। রাজা যেখানে বিপ্র-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গেছে মন্ত্রীরা সেখানে জনসাধারণের সাহায্যে বা অন্য কোনো ক্ষত্রিয়-গোষ্ঠীর সাহায্যে নিজের পছন্দমত লোককে সিংহাসনে বসিয়েছেন কাঠের পুতুলের মত তাঁরা মন্ত্রীর অঙ্গুলি-হেলনে ওঠা বসা করেছেন। ঠিক গণতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় বিপ্র তা চায়নি বা চাইত না। এই সম্ভাবনা যখনই সাময়িকভাবে দেখা দিয়েছে তখনই বিপ্র নিজের পছন্দমত একজন কাঠের পুতুল ক্ষত্রিয়কে টেনে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। অল্পবুদ্ধি ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রৰলের সাহায্য নিয়েই বিপ্র তার শোষণের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছে। বিপ্রযুগের গোড়ার দিকে ধর্মে-ধর্মে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বা রাজায়-রাজায় যে সংঘর্ষ সেটা বিপ্রেরই সৃষ্টি। নিজেদের শোষণ অব্যাহত রাখবার জন্যেই বিপ্রেরা ধর্মীয় (রেলিজন) জিগির তুলে রকমারি ধরণের ফতোয়া দিয়ে

মানুষ-জাতের মতিচ্ছন্ন ঘটিয়ে দিয়েছিল ও এক গোষ্ঠীর মানুষকে অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, এক রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজের শোষণের ভূমি প্রসারিত করতে চেয়েছিল ও তা' করেও ছিল। ক্ষত্রিয়ের শাসন-লিপ্সার ফলে পৃথিবীতে যত বড় যুদ্ধ, যত বড় বড় রক্তপাত ঘটেছিল তার চেয়ে অনেক বড় যুদ্ধ অনেক বেশী রক্তপাত ঘটে গেছে- মধ্যযুগীয় পৃথিবীতে ধর্মের ধ্বজাধারী বিপ্রদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্কানিতে।

সমাজ দেহে বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যেখানেই বিপ্রের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে সেখানেই তার আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরণের ধার্মিক মজৰ অথবা নৈতিক দর্শন। বিপ্রেরা গোড়ার দিকে শোষণের উদ্দেশ্যেই ধর্মের (রেলিজন) অবতারণা করেছিল ও ৰড় বড় বুলি কপচিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন মতবাদপন্থী বিপ্রের সংঘর্ষের ফলে যে সকল নবতর দর্শনের জন্ম হয়েছিল সেগুলোতে শোষণের ভাবনা থেকে যেত প্রচ্ছন্নভাবে আর তার ধরণ-ধারণটা হয়ে দাঁড়াতো কতকটা যেন আধ্যাত্মিক ভাবের। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের মত এই ধর্মীয় ধাঁচ জিনিসটাও ছিল আসলে একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি! এতে করে সোজাসুজি

জনতা-যজমানকে শোষণ না করে একটা মনস্তত্ত্বসম্মত নিস্পৃহতা যা নির্লিপ্ততার মুখোশ পরে এই বিপ্র-শয়তানরা (intellectual satans) তাদের শোষণের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করে তুলত।,

শাদা-মাঠা ধরণের বিপ্রদর্শন সেখানে বলত "তোর বাপকে স্বর্গে পৌঁছিয়ে দিতে তো হবে, সুতরাং আমাকে দিয়ে শ্রাদ্ধ করা, অথবা তোর বাপের আত্মার জন্যেও তো সূক্ষ্ম খাদ্য দরকার, আমাকে স্থূল খাদ্য দে, আমি সেটাকে সূক্ষ্মভাবে তোর বাপের কাছে পৌঁছিয়ে দৌৰ।" কিন্তু পরবর্তী কালের ধড়িবাজ বিপ্ররা অর্থাৎ যাদের আমি বিপ্র শয়তান বললুম তারা তাদের আজগুৰি দর্শনের দ্বারা জনসাধারণের মনের মোড় বাস্তবতা থেকে ঘুরিয়ে দিয়ে এক কাল্পনিক শূন্যতার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করত। তাদের মোটা মোটা দর্শনের, লম্বা লম্বা সূত্রের টন টন ওজনের ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনীর মোদ্দা কথা ছিল- এই জগৎটা মিথ্যা-মায়া, সুতরাং এই জগতের সব কিছুই ত্যাগ কর। এই জগতের মোহে আকৃষ্ট হয়ো না। তোমার সম্পদ তাই বিপ্রের পায়ে ঢেলে দিয়ে নিষ্কাম নির্লিপ্ত ত্যাগী হও। অবশ্য দান-গ্রহীতা বিপ্রদের কাছেও যে জগৎটা মিথ্যা-মায়া

এই ধরনের কথা ওই সকল দর্শনে বলা হ'ত না। কারণ ওগুলো উহ্য রাখাতেই বিপ্রের জাগতিক প্রতিষ্ঠা।

যেখানে বিপ্রদের মধ্যে যে কোন কারণেই হোক ৰৌদ্ধিক সংঘর্ষ কম হয়েছে সেখানে তাদের দর্শনটা ছিল খুবই শাদা-মাটা। সেখানে জনসাধারণকে সোজাসুজি বলা হয়েছে যে আমি দেবদূত বা ঈশ্বরের অবতার। আমি যা বলছি সেটা মানুষের কথা নয়-ঈশ্বরের কথা বা আমি এই ধরণের প্রত্যাদেশ পেয়েছি যে তোমরা এই খাবে, এই খাবে না, এই ভাবে প্রার্থনা করবে- এইভাবে করবে না, এই জিনিসটা দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে, আমার কথাটা মানলে তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাৰে, স্বর্গে যাবে, না মানলে নরকের আগুনে পুড়ে মরৰে অর্থাৎ জনসাধারণকে ঠকানো হ'ত খুব সরল সহজ ভাবে। সাধারণকে কল্পিত স্বর্গের প্রলোভন ও কল্পিত নরকের ভয় দেখিয়ে এরা নিজেদের কাজ হাসিল করে নিত, বিপ্রের শোষণও ভালভাবে চলত, আর এই ভীতম্মন্যতাসৃষ্ট sentiment মানুষকে ধর্মোন্মাদ (fanatic) করে তুলত।

পৃথিবীতে এখন যে সকল ধর্মোন্মাদ সম্প্রদায় দেখতে পাই, বুঝতে হৰে তাদের বিপ্রদের মধ্যে পারস্পরিক ৰৌদ্ধিক সংঘর্ষ কম হয়েছে। এই ধর্মোন্মাদ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যেখানে

সামাজিক বিধি-নিষেধের ব্যবস্থাও ছিল অর্থাৎ সামাজিক কাঠামো তৈরী করবার কোনো প্রচেষ্টা ছিল তাদের সমাজ-ব্যবস্থা সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের অনুগামী সমাজগুলির চাইতে অথবা ক্ষত্রিয় সমাজের চাইতে দৃঢ়তর হয়েছিল। বিপ্রদের মধ্যে যেখানে ৰৌদ্ধিক সংঘর্ষ ছিল সেখানে প্রত্যেক বিপ্রের কিছু কিছু সমর্থকও ছিল ও এই সমর্থকেরা কোনো মতেই নিজেদের এক গোষ্ঠীর লোক বলে' ভাবতে চাইত না, তার ফলে তারা মজবুত সামাজিক কাঠামোও তৈরী করতে পারত না। দর্শনের মধ্যে ভাল জিনিস থাক বা না থাক সূক্ষ্ম মানসিকতার যথেষ্ট পরিচয় ছিল বলেই হিন্দু ও বৌদ্ধেরা কোন দৃঢ় সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করতে পারেনি।

যুধ্যমান পরস্পর-বিরোধী ভাবগুলির জন্যে সামাজিক একতা বিপ্রযুগে যদিও কম থাকে তবুও বিপ্র-শোষক পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার খাতিরে নিজেদের মধ্যে অপবিত্র চুক্তিও করে থাকে, আর সে চুক্তি ক্ষত্রিয়ের ওই ধরণের চুক্তির চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক।

যখনই কোনো শোষণ-বিরোধী আদর্শবাদ মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে তখনই কায়েমী স্বার্থবাদীর দল তার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু এই আদর্শবাদ যেখানে বিপ্র

শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে সেখানেই তাকে ৰাধা পেতে হয়েছে সব চেয়ে বেশী, কারণ সেই বিরোধিতায় থেকে যায় বৌদ্ধিকতার সমর্থন। পরস্পর যুধ্যমান বিভিন্ন বিপ্র-গোষ্ঠী বিপ্র শোষণবাদী আদর্শের বিরোধীর বিরুদ্ধে সহজেই হাত মেলায়। মহাপ্রভু চৈতন্যের বিরুদ্ধে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল গোঁড়া মুসলমান; রাজা রামমোহনের বিরুদ্ধে গোঁড়া খ্রীষ্টানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল গোঁড়া সনাতনী। তাই দেখা যায় পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন যেখানে, সেখানে বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিপ্ররা সহজেই হাত মেলায়। অন্ততঃ এই বিষয়ে ক্ষত্রিয়ের তুলনায় বিপ্রেরা যে বেশী একতার পরিচয় দেয় তাতে সন্দেহ নেই।

আগেই বলেছি বিপ্রসমাজে শৃঙ্খলাবোধের অভাব আছে, অন্ততঃ ক্ষত্রিয়ের তুলনায় তার শৃঙ্খলাবোধ অনেক কম, তবে আদর্শগত কারণে এক ধরণের অস্পষ্ট একত্ব বোধ তাদের মধ্যে থাকে। অবশ্য শূদ্র ও ক্ষত্রিয় সমাজের ওপর বৌদ্ধিক শোষণ চালাতে হলে তাদের মধ্যে কিছুটা একত্ববোধ তথা শৃঙ্খলাৰোধ থাকা দরকার ও সেটুকু থাকেও। ক্ষত্রিয়ের মতো বুদ্ধিজীবী বিপ্র শত্রুকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করে না, হত্যা করে ৰৌদ্ধিক প্যাঁচে ফেলে। তাই এদিক দিয়ে বিচারে তাদের

মানসিকতাকেই হীনই ৰলব কারণ ক্ষত্রিয় শত্রুকে তার হাব-ভাবে-আচরণে চিনে নিতে খুৰ বেশী অসুবিধা হয় না কিন্তু বিপ্র- শত্রু মনের মধ্যে কী ধরণের প্যাঁচ কষে চলেছে তা বোঝা সহজ নয়। পারিবারিক শৃঙ্খলাবোধ ক্ষত্রিয়ের তুলনায় বিপ্রের হয়তো বেশীই, তার সামাজিক কাঠামো আরও বেশী মজবুত, কিন্তু সাম্য ও মানবিক প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়- কূটনৈতিক কৌশলে তাতে নির্বোধের ওপর বুদ্ধিমানের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ক্ষত্রিয় অস্ত্রৰলে যে ধরণের প্রতিষ্ঠা লাভ করে, বিপ্র বুদ্ধিৰলে ততোধিক প্রতিষ্ঠা লাভ-করে। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রযুদ্ধে যে শূদ্র বা ক্ষত্রিয় হেরে যায় সে বুঝতে পারে "আমি হেরে গেছি”। কিন্তু বিপ্রের সঙ্গে ৰৌদ্ধিক যুদ্ধে যে বিপ্র, শূদ্র অথবা ক্ষত্রিয় হেরে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে বুঝতেও পারে না যে সে হেরে গেছে। আদর্শগত সংঘর্ষে ক্ষত্রিয়েরা নিজেদের মর্যাদাকেই বড় করে দেখেন। আর এই মর্যাদাকে বড় করে দেখতে গিয়ে তাদের মনে যে ভাবগত সংঘর্ষ উৎপন্ন হয় সেই সংঘর্ষই একদিন সমাজে বিপ্রের আগমন বার্তা ঘোষণা করে। সমাজ-চক্রে বিপ্রের উৎপত্তির প্রধান কারণ এই ক্ষত্রিয় সমাজের ভাব-

সংঘাত। তবে ক্ষত্রিয় অথবা শূদ্রের জড়-সংঘাত অথবা শূদ্রের ভাব-সংঘাত যে এই ব্যাপারে একেবারেই কাজ করে না-এই কথা হলপ করে বলা চলে না।

প্রকৃতি-পূজক ক্ষত্রিয় প্রকৃতিকে যুধ্যমানা শক্তির সমষ্টি রূপে ভেবেছিল আর তার এই সমষ্টি ভাবনারই নামকরণ হয়েছিল ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের সমষ্টি-প্রকৃতি ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না। প্রাকৃত উপাধিমুক্ত সকল বস্তুই তাই ছিল তার ব্রহ্মের অভিব্যক্তি। বিপ্র প্রাকৃত উপাধিযুক্ত আর এই সত্তার অস্পষ্ট কল্পনা করেছিল ও তার নাম রেখেছিল আত্মা বা পরমাত্মা বা নিরুপাধিক ঈশ্বর। এই সত্তাগুলি কতখানি প্রাকৃতমুক্ত তা নিয়ে বিপ্রদের মধ্যে বৌদ্ধিক স্তরভেদে বিভিন্ন ধারণা ছিল, যার ফলে দার্শনিক বিচারে ঈশ্বর অথবা আল্লাহ, God অথবা জ্যেহবহা এগুলির মধ্যে তত্ত্বগত ভেদ থেকে যায়। রুহ বা spirit, soul বা আত্মা সম্পূর্ণ এক জিনিস নয়। রুহ কৰর থেকে উঠতে পারে, spirit চারিদিকে ঘোরাঘুরি করে মানুষকে ভয় দেখাতে পারে, soul ভগবানের কাছে গিয়ে বসতে পারে আর নিরুপাধিক আত্মা দেশ-কাল-পাত্রিক বন্ধন মানে না। এই যে প্রাকৃতমুক্ত আর একটি সত্তার কল্পনা এটা বিপ্রের অবদান। ৰৌদ্ধিক শক্তিতে ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে যুধ্যমানা প্রকৃতির

বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেত ৰলেই প্রাকৃত সত্তার অতীত এই ধরণের একটি পুরুষ-সত্তার কল্পনা করার সুযোগ বিপ্র পেয়েছিল।

ক্ষত্রিয়ের ধার্মিকতা ছিল অধিক প্রাপ্তির ও অধিক ব্যাপ্তির মোহ-সঞ্জাত অর্থাৎ তারা ভাবত ঈশ্বরকে মেনে চললে পৃথিবীর ভোগৈশ্বর্য অনেক পাওয়া যাবে। ক্ষত্রিয় নিজের বাহুৰলেই সেগুলো দখল করবে ও বাহুৰলেই সেগুলো ভোগ করবে। ক্ষত্রিয়-সমাজ তাই রণে যাবার আগে অথবা ডাকাতিতে যাবার আগে নিজেদের কল্পিত দেব-দেবীর পূজা করে বা অনেক ক্ষেত্রে সেই দেব- দেবীর তৃপ্তির উদ্দেশ্যে পশু বা নরবলিও দিত। বিপ্রের সে সাহস, সে শৌর্য-বীর্যের অভাব থাকায় তাদের আধ্যাত্মিকতা ছিল মূলতঃ অলৌকিক শক্তি (occult power) প্রাপ্তির মোহ-সঞ্জাত। সে ভাবত আধ্যাত্মিকতা তাকে এমন শক্তি দেৰে যে সে বর দিয়ে মানুষের ভাল করে দেবে আর লোকেও সন্তুষ্ট হয়ে বিপ্রকে একটা মোটা রকমের লভ্যাংশ দেবে। সে ভাবত আধ্যাত্মিকতায় সে অভিশাপ দেৰার বা লোকের ক্ষতি করবার শক্তি অর্জন করবে, আর লোকে ভয়ে ভক্তিতে তার পায়ে ভোগ্য-পণ্যের ডালি সাজিয়ে দেবে। পৌরাণিক

উপাখ্যানগুলোতে বিপ্র-প্রাধান্য সৃষ্টির যে ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখা যায় তাও এই মানসিকতা-প্রসূত। মানুষ তো কোন্ ছার, কোন কোন পুরাণের মতে স্বয়ং নারায়ণও নাকি বিপ্রের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছিলেন।

বিপ্রের এই প্রতারণার মনোভাব পরবর্তীকালে বৈশ্যদের সমাজ-শোষক অর্থগৃধ্নু হতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল ও বিপ্রের না-খেটে খাবার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত তাদিকে বৈশ্যের পরগাছায় পরিণত করেছিল অর্থাৎ পরবর্তীকালের বিপ্র-প্রচারিত ধর্মীয় মতবাদ তথা সমাজাদর্শ সম্পূর্ণভাবেই বৈশ্যের বিত্তের কাছে বাঁধা পড়েছিল। বিপ্রের সমাজব্যবস্থায় বাঁচা বা বাঁচানো বড় কথা নয়, বাঁচার মত বাঁচাও মৌল উদ্দেশ্য নয়, বড় কথা হল অন্যকে ছোট করে বাঁচা-অন্যের মনে হীনম্মন্যতা তৈরী করে দিয়ে, তাদের গোলামে পরিণত করে দিয়ে তাদের প্রাণরস শোষণ করে বেঁচে থাকা- ভয় দেখিয়ে ভক্তি আদায় করে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বেঁচে থাকা। সামাজিক কাঠামোয় বিপ্রের মানসিকতা যেন বলতে চায়, তোমার শোষণকে জীইয়ে রাখার জন্যে ছল-বল-কৌশল সব কিছুই ব্যবহার কর, আর তা' ব্যবহার করতে গিয়ে সাময়িকভাবে যদি সম্মানহানিও ঘটে তাতেও আপত্তি নেই।

শক্তি বৈচিত্র্যকে সংগ্রামের মধ্যে চিনতে শেখা ক্ষত্রিয়ের কাজ, আর এই বৈচিত্র্যের প্রতিটি ধারাকে বৈয়ষ্টিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে বৈয়ষ্টিক বিচারে অভিব্যক্ত করা বিপ্রের কাজ। এই বৈয়ষ্টিকতার প্রাধান্য শৃঙ্খলাকে কিন্তু নষ্ট করে দেয়। মূল নীতিতে বা নীতিগত আদর্শে শৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকলেও বৈয়ষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গীকে গুরুত্ব দেবার ফলে তা' খুব বেশী দৃঢ়নিৰদ্ধ থাকতেই পারে না। বিপ্রের সমাজ তাই সামাজিক আদর্শের বিচারে ক্ষত্রিয় সমাজের (বিপ্রসমাজও প্রকৃতপক্ষে সমাজ নয়) তুলনায় শ্রেষ্ঠ হলেও ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকতর স্বীকৃতি থাকায় তার কাঠামো কিছুটা ঢিলে। মানুষের আন্তরিক অনুভূতিকে অভিব্যক্ত করার ষোল আনা সুযোগ না থাকলেও কিছুটা সুযোগ বিপ্রসমাজে আছে, আর তাই বিপ্রশাসনের কালেই তর্কজিহ্ব ৰৌদ্ধিক দর্শনগুলির জন্মহার বেড়েছে।

ক্ষত্রিয়-সমাজে দুর্বলের ওপর সৰলের শোষণের মত অল্প বুদ্ধির ওপর বুদ্ধিমানের শোষণ বিপ্রসমাজে ব্যাপকভাবে চলে থাকে, তবু কাগজে-কলমে বিপ্র এই শোষণটাকে ভাল বলে মনে করে না। পাপীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিলেও পাপের পরিণামে রৌবব নরক ভোগ করতে হয় এই কথা বিপ্র- স্মার্তরা বলে থাকেন। নিপীড়িত মানবতার বুভুক্ষা দূর

করবার কোন ব্যবস্থা বিপ্রসমাজে না থাকলেও ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্ন দেওয়া পুণ্যকর্ম–এই ব্যবস্থা বিপ্র–সমাজ দিয়ে থাকে। আর বৈবহারিক ক্ষেত্রে উচ্চ–নীচ ভেদাভেদ–ব্যবস্থা ভালভাবে মেনে চললেও মানুষে–মানুষে আসলে যে ভাই–ভাইয়ের সম্পর্ক কাগজে–কলমে বিপ্র একথা স্বীকার করে। তাই ক্ষত্রিয়ের সমাজ–ব্যবস্থার তুলনায় বিপ্রসমাজ অপেক্ষাকৃত কম দৃঢ়নিৰদ্ধ হ'লেও ও বৈবহারিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদারতা না থাকলেও কাগজে–কলমে তাতে ক্ষত্রিয়–সমাজের তুলনায় উদারতা বেশী আছে। ক্ষত্রিয়কে সমাজে ঠিক পরগাছা ৰলা চলে না, কিন্তু বিপ্রকে পরগাছা বললে বিশেষ ভুল হবে না। বিপ্রের সমাজ– ব্যবস্থার কী কী ত্রুটি আছে বিপ্ররা তা' বোঝে, আর বুঝেও বাগ–বৈচিত্র্যের সাহায্যে নিজের ত্রুটিপূর্ণ সমাজকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা করে–এটাই বিপ্রের স্বভাব।

বিপ্র–সমাজে সদ্বিবেচনার স্থান ক্ষত্রিয় সমাজের চেয়ে অনেক বেশী অর্থাৎ অন্যের সুখদুঃখের কথা বিপ্র নেতারা উপেক্ষা করে না। যে বিপ্রের কাছে মাথা নোয়ায় বিপ্র তার হয়ে ওকালতি করে, তার পক্ষে দৈবাদেশ বা শাস্ত্রাদেশ সংগ্রহ করে সমাজে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে। অবশ্য নিজের ক্ষতি করে বিপ্র কারও ওকালতি করেনা, তা সে তার

পক্ষে যতই বড় যুক্তি বা ধার্মিক দায়িত্ব থাকুক না কেন। অবশ্য এই কথা বলাই ৰাহুল্য যে, যদি কাউকে বড় করলে বা পূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি দিলে বিপ্রের শোষণ রথের চাকা থেমে যাবার সম্ভাবনা থাকে বিপ্র সে ক্ষেত্রে তাকে সমর্থন করে না, সমস্ত মানবতা বিসর্জন দিয়ে ক্ষত্রিয়ের চেয়ে অনেক বেশী হিংস্রভাবে তার ক্ষতিসাধন করে। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ ক্যাথলিকেরা অক্যাথলিকদের (তাদের ভাষায় অবিশ্বাসীদের) জীবন্ত পুড়িয়ে মারত, অনেক কাঠমোল্লা এমনও বিধান দিত যে কাফেরদের হত্যা করলে পাপ নেই। গোঁড়া সনাতনীরা ভগবান বুদ্ধকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল; বিম্বিসারের আমলে ক্ষমতামত্ত ৰৌদ্ধ ভিক্ষুরা হিন্দুর ওপর অত্যাচার চালাতো, মহাত্মা কবীরের ওপর হিন্দু ব্রাহ্মণ ও মুসলমান মোল্লা সমানভাবে আক্রোশপরায়ণ হয়ে উঠেছিল; চণ্ডীদাস, রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপরও গোঁড়া বিপ্রের দল কম অত্যাচার করেনি। ক্ষত্রিয়ের মর্যাদার লড়াইয়ে নীচতা থাকলেও তা খুব বেশী নয়। কিন্তু বিপ্র যখন নীচে নামে তখন সে সম্পূর্ণ অন্ধ। হ্যাঁ, নিজের পৌরুষকে ৰেচে দিয়ে বিপ্রের বহাস্ফোটের কাছে যে আত্মবিক্রয় করে বিপ্রদাস হয়, নিজের স্বার্থে বিপ্র তখন তার হয়ে ওকালতি করে।

অন্যকে ৰৌদ্ধিক শোষণ করার ব্যাপারে প্রায় সকল বিপ্রই একমত, আর তাই শোষণ-যন্ত্র চালাবার সময় তাদের নিজেদের মধ্যে বেশ একটা একতা দেখা **যায়। মহাত্মা ৰুদ্ধ, কবীর, চৈতন্য বা গুরু নানক অথবা হজরত মহম্মদ** যখন ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে চেতনা জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন তখন তৎকালীন বিপ্রেরা দল ও মত নির্বিশেষে তাঁদের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল। হিন্দু পুরোহিত ও মুসলমান মৌলানা মহাত্মা কবীরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হাতে হাত লাগিয়েছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় ঠিক এমনটিই হয়েছিল। কার্ল মার্কস্ জনগণকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যে থিয়োরী প্রচার করেছিলেন বৈশ্যরা তো তার বিরোধিতা করেইছে, দরিদ্র বিপ্ররাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করেছে। কারণ মার্কসীয় মতবাদে সমাজ জীবনে সমাজ-সেবক বিপ্রের স্থান থাকলেও সমাজের পরগাছা-বিপ্রের কোন স্থান নেই।

হ্যাঁ, বুদ্ধিজীবী বিপ্রের বৌদ্ধিকতাই কাল হয়েছে। অধিকাংশ বিপ্রের অবস্থাই আদেশকারী বয়োবৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাতের মত। আদেশমান্যকারী বয়োকনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের ভূমিকায় কেউই

নামতে রাজী নয়। এর ফলে মতবাদের পার্থক্য হেতু বিপ্র সমাজ অজস্র দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। এরা একে-অন্যকে সহ্য করতে পারে না, একে অন্যের মতবাদকে খণ্ডন করার কাজে সর্বদাই সচেষ্ট। বিপ্র সমাজের এই অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ মানুষের ৰৌদ্ধিক প্রগতিকে (intellectual progress) হয়ত কিছুটা সহায়তা করেছে কিন্তু মানসিক উদারতা বা মানসিক ব্যাপ্তি খুব সামান্যই ঘটাতে পেরেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৰিপ্রের তর্কজিহ্ব দর্শন মানুষকে পরদোষ দর্শনে প্রেরণা যুগিয়েছে ও তার ফলে মানুষের অধোগতিই ঘটিয়েছে। এখনও কোন কোন তথাকথিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতাদের তাঁদের সভা সমিতিতে ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মসাধনা সম্বন্ধে (আসলে যেটা ধর্ম) যতটুকু বলতে শুণি, তার চেয়ে বেশী শুণি তাঁদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত পরচর্চা, পরনিন্দা ও শোষণের অদ্ভুত কৌশল-সমন্বিত বাকচাতুরী। কিন্তু পরস্পরের প্রতি কর্দম-নিক্ষেপ তাঁরা যে যতই করুন না কেন অন্যকে শোষণ করাটা অন্যায় নয়, এই মতবাদে তাঁরা সৰাই বিশ্বাসী। অবশ্য এই শোষণের ওপরে তারা বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ছাপ লাগিয়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে চলে।

ক্ষত্রিয় যা করে জীবনপণ করে করে, তাই গোটা জীবনটাই তাদের কাছে একটা দাৰা-খেলা ছাড়া কিছুই নয়। জয়লাভের দুরন্ত পিপাসাই তাদের এই খেলায় প্রবৃত্ত করে। পৌরুষ ও বীরত্ব সমন্বিত জীবন, তা সে ৰিৱাট সাম্রাজ্যবাদী নেতাই হোক আর অতি সাধারণ শ্রমিকই হোক উভয়ের কাছেই সমান বরণীয়। সমস্ত পরাজয়, সমস্ত হতাশার গ্লানিই সংগ্রামের শোণিতে ক্ষত্রিয় ধুয়ে ফেলতে চায়। বিপ্রের ব্যাপারে কিন্তু তেমনটি নয়, ৰৌদ্ধিক সংগ্রামে জয়লাভ ও নূতন ধরণের বৌদ্ধিক অভিপ্রকাশকেই জীবনের চরম মূল্য ৰলে বিপ্র মনে করে ও চরম মূল্যের ভাবনা যখন বিপ্রের মনকে ষোল আনা দখল করে তখন সে আর অন্যকে শোষণ করার কথা ভাবে না। তখন সে নিজের আদর্শ ও মতবাদের জন্যে চরম ক্লেশ স্বীকার করতেও তৈরী হয়ে যায়। আর এই সকল উদার ও আদর্শবাদী বিপ্রদের নাম ভাঙ্গিয়ে বিপ্ররা অন্যকে শোষণ করবার সুযোগ পেয়ে যায়। বস্তুতঃ মানুষ জাতের বিপ্রদের প্রতি আজ যেটুকু শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে তার কারণ হচ্ছে এই আদর্শবাদী বিপ্ররা। কারণ মানুষ-জাতের বৌদ্ধিক তথা আধ্যাত্মিক বিকাশ. আজ পর্যন্ত যেটুকু হয়েছে তার পনেরো

আনাই এই ধরণের আত্মভোলা উদার বিপ্রদের দান। কোন যুগেই এদের কথা ভোলা সম্ভব নয়।

সামূহিক জীবনের সুখ ক্ষত্রিয়ের তুলনায় বিপ্রের কম হলেও শান্তি বিপ্রের জীবনে বেশী। বেশী এই কারণে যে পারস্পরিক রক্তপাতের ভাবনায় অথবা দুশ্চিন্তায় তাদের বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয় না ও মতবাদগত পার্থক্যের দরুণ দলাদলি যথেষ্ট থাকলেও সামাজিক কাঠামো অপেক্ষাকৃত দৃঢ় নিৰদ্ধ হওয়ায় সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষত্রিয়-যুগের তুলনায় বিপ্রযুগে বেশী পাওয়া যায়।

বিপ্র সৰ সময়েই জেগে আছে ও কখন কোথায় কী হয়ে চলেছে সেদিকে তার নজরও রয়েছে কিন্তু কখন কী দরকার সেটা করবার সামর্থ্য তার সীমিত অর্থাৎ তার বুদ্ধির সঙ্গে কর্মের সহযোগিতার অভাব আছে। যেখানে সে কর্মী পেল সেখানে সে তার অনুমান ও অনুভূতিগুলোকে ঠিকভাবে কাজে লাগালো কিন্তু যেখানে সে কর্মী পেল না, আজ্ঞাবহ ভৃত্য পেল না বা টাকা জোগানোর যন্ত্র পেল না সেখানে তার কল্পনার একটা বিরাট অংশই মাঠে মারা গেল। যার বুদ্ধি আছে তাকে নূতন করে বুদ্ধি দেবার কিছু থাকে না-এ কথাটা বিপ্রের সম্বন্ধে অন্তত খাটে না কারণ সর্বক্ষেত্রেই না হোক অনেক

ক্ষেত্রেই যে তার বুদ্ধি ৰন্ধ্যা বুদ্ধি! মাথার সঙ্গে তার হাত-পায়ের সামঞ্জস্য যাতে থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে, আর সে ব্যবস্থা পরামর্শ দিয়ে করানো যাৰে না। তাই বিপ্র কারও পরামর্শ নেবে না। সে অর্থের বিনিময়ে মাথা বিকোৰে কিন্তু মাথা-হাতের সহযোগিতার ব্যবস্থা করবে না।

বিপ্র প্রতিপক্ষের শক্তি যাচাই করে নিজের আজ্ঞাবহ ক্ষত্রিয় ও শূদ্রকে সংগ্রামে লেলিয়ে দেয় কিন্তু নিজে সে থাকে সংগ্রাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে। সে সংগ্রামে সাহসী ক্ষত্রিয়ের আর ভীরু শূদ্রের মুণ্ড ধূলায় লুটিয়ে পড়ে- পৃথিবীতে রক্তের নদী বইতে থাকে কিন্তু বিপ্রের গায়ে আঁচড়টিও লাগে না। নিজের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখলে সে নিজের অনুগত শূদ্র ও ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে গোপনে সন্ধি-চুক্তিতে আৰদ্ধ হয়। যুদ্ধবাজের সমস্ত কলঙ্ক-কালিমা সে ক্ষত্রিয়ের শিরে লেপন করে নিজে শান্তিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাই বিপ্রের ইতিহাস বিচক্ষণ বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। সে ইতিহাসে বুদ্ধির প্রাৰ্থর্য আছে কিন্তু বুদ্ধির মহত্ব নেই। তাতে আছে অপৌরুষ, আছে ভীরুতা, আছে কৃতঘ্নতা, আছে বিচক্ষণতা কিন্তু তা স্বার্থপরতার দোষ-দুষ্ট।

নিজের উপস্থিত বুদ্ধির ওপর অত্যধিক বিশ্বাস থাকায় বিপ্র ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, তাই সঞ্চয়ের চেষ্টাও তার মধ্যে বিশেষ ভাবে দেখা যায় না। সে ভাবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে নেওয়া যাবে। কিন্তু এই নিজের উপস্থিত বুদ্ধির ওপর অহেতুক বিশ্বাসই তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। যখন সত্যিকারের বিপদ আসে তখন উপস্থিত বুদ্ধি হেরে গেলেই তাকে যার কাছে কোন না কোন প্রকারের সম্পদ আছে তার কাছে মাথা বিকোতে হয়। সম্পদের মূলধন নিয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বৈশ্যেরা বিপ্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। বৈশ্যের কাছে মাথা বিকানো বিপ্র তখন বৈশ্যের সম্পদ বৃদ্ধির কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করে। নিজের সম্পদ আহরণের যোগ্যতা না থাকলেও বৈশ্য কিভাবে অধিকতর সম্পদ আহরণ করতে সক্ষম হৰে তাকে সেই বুদ্ধি বিপ্র তখন যোগাতে থাকে। মানুষ মারার, লোক ঠকানোর যে সকল সরল ও জঘন্য পন্থা বৈশ্যের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় বিপ্র তাদের সেগুলো দেখিয়ে দিতে থাকে। বৈশ্য কর ফাঁকি দেয়, চোরা-বাজারী করে, চোরা-চালান দেয়, খাদ্যে ঔষধে ভেজাল মেশায় বা উৎকোচ দিয়ে লাভের অঙ্ক স্ফীত করে তোলে কিন্তু তাদি'কে এই পাপ কাজ করার বুদ্ধি ও পদ্ধতি শেখায় বৈশ্যপদলেহী

বিপ্র। এই অবস্থা কিছুদিন চলবার পরে বিপ্র নিজের ৰৌদ্ধিক মৌলিকত্বও খুইয়ে বসে। সে তখন হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণভাবেই বৈশ্যের সেবক, পুঁজিবাদের দালাল, বৈশ্যপ্রধান সমাজে বিপ্রেরা শূদ্র-ক্ষত্রিয়ের মতই চীনীর বলদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই পুঁজিবাদী বৈশ্যরা ক্রমশঃ বিপ্রের হাত থেকে সমাজ পরিচালনার ভার কেড়ে নেয় ও বিপ্রের ৰৌদ্ধিক শক্তির সাহায্যে সমাজে নিজেদের অধিকার বজায় রেখে চলে! পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বৈশ্যরা রাজতন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্রের বেশী সমর্থক। তার কারণ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে যত সহজে নিজেদের অঙ্গুলিহেলনে চালনা করা যায় রাজতান্ত্রিককে তত সহজে চালনা করা যায় না কারণ রাজার শৌর্যবীর্যের প্রতি, ঐতিহ্য-আভিজাত্যের প্রতি অথবা ক্ষাত্র-স্বভাবের প্রতি জনগণের একটা শ্রদ্ধা বা ভয়মিশ্রিত ভক্তি থেকে যায়, আর তাই রাজা কোন বড় রকমের জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ না করা পর্যন্ত তারা রাজার বিরুদ্ধে যেতে চায় না। এই রাজা যদি জনস্বার্থের কথা একটু বেশী করে ভাৰে তাহলে সে রাজ্যে বৈশ্যের সম্পত্তি বা জীবন যে কোন সময়ে বিপন্ন হলেও হতে পারে। দলীয় অথবা অন্য যে কোন রকমের ডিক্টেটরশিপেও ডিক্টেটরকে জনস্বার্থের মুখ চেয়ে কাজ করতেই

হয়। অত্যাচারী ডিক্টেটরও রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভুলে থাকতে পারে না–ভুলে থাকলে তাকে গদী খোয়াতে হয় কিন্তু গণতন্ত্রে এই ধরণের কোন ৰালাই নেই। বৈশ্যভৃত্য–বিপ্রের সহায়তায় তাদের মন ভোলানো, প্রাণমাতানো প্রতারণায় অল্পবুদ্ধি ক্ষত্রিয় ও বুদ্ধিহীন শূদ্র সহজেই প্রতারিত হয় ও বুদ্ধিমান বিপ্রও ভয়ে অথবা অনন্যোপায় হয়ে মুখে যাই বলুক বা মনে যাই ভাবুক কার্যক্ষেত্রে সে বৈশ্যকেই সমর্থন করে। তাই গণতান্ত্রিক কাঠামোয়, বিশেষ করে যে কাঠামোতে অধঃপতিত বিপ্র ও ক্ষত্রিয়েরা সংখ্যায় কম ও বুদ্ধিহীন শূদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সেখানে বৈশ্যের পক্ষে বোট [vote] কুড়ানো অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

বৈশ্য–শাসনে বিপ্রের বুদ্ধিমত্তা ঠিকই থাকে, তা ঘুমায় না, তাতে মরচেও ধরে না। কিন্তু স্থূল জাগতিক ৰন্ধন এমন ভাবে তাকে অক্টোপাস্–এর মত বেঁধে ফেলে যে বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সেই বুদ্ধি প্রয়োগের সাহস তার থাকে না। তাই বলতে পারি, বিপ্র যেদিন বৈশ্যের কাছে নতি স্বীকার করে সেদিন থেকে বিপ্রের মৃত্যু না হ'লেও বিপ্র যুগের মৃত্যু ঘটে। রক্ত–শোষক বৈশ্যেরা বেতনভুক বিপ্রদের সাহায্যে দর্শনের মোটা মোটা ৰই লেখায়, কৌশলে তাতে সত্যের অপলাপ ঘটায়।

ৰাঁচবার দাৰী নিয়ে যারা বৈশ্যের বিরোধিতা করে তাদের হীনাচারী নরাধম রূপে দেখাবার চেষ্টা করে। অর্থভুক বিপ্রের সাহায্যে নিজের শোষণযন্ত্র অব্যাহত রাখবার জন্যে তারা সাংঘাতিক ধরণের মারণাস্ত্র তৈরী করে। স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বিপ্র-বৈজ্ঞানিক লেবোরেটরিতে বসে বৈশ্য-প্রভুর অর্ডারমত মানব-সভ্যতার মৃত্যুবাণ তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করে। বিপ্র সব ৰোঝে কিন্তু করতে কিছু পারে না। সে সুদিনের আশায় আকাশ পানে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে-কবে এই অধঃপতিত বিপ্র, ক্ষত্রিয় আর শূদ্রের দল একযোগে বৈশ্যের এই সর্বগ্রাসী লালসার হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করবে! তারা ভাৰে, কবে মানুষ বুঝবে-মানুষের ওপর মানুষের শোষণ চলুক-এটা বিধাতার অভিপ্রেত নয়! দারুণ হতাশায় বৈশ্য-ভৃত্য বিপ্রের দল ক্রমশঃ মুষড়ে পড়তে থাকে ও এককালে তারা নিজেরা কীভাবে অন্যকে শোষণ করেছিল সেকথা ভেবে অনুতাপে পুড়তে থাকে।

বৈশ্যের অর্থনৈতিক শোষণ বিপ্রকে বুদ্ধিমান শয়তানের স্তরে নামিয়ে দেয়, আর বৈশ্যের অর্থ সেই শয়তানের মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। বৈশ্যযুগে পৃথিবীতে বহু প্রকারের বৌদ্ধিক অগ্রগতি হতে আমরা দেখতে পাই, নূতন নূতন

আবিষ্কার হয়, নূতন নূতন মারণাস্ত্র উদ্ভাবিত হয়, আরাম ৰাড়াবার অজস্র উপকরণ মানুষ তৈরী করতে শেখে। অনেকে এগুলোকে বিপ্রপ্রধান যুগের ঘটনা বলে মনে করে কিন্তু আসলে এগুলো বৈশ্য যুগের জিনিস। বৈশ্যের টাকায় মাথা-বিকানো বিপ্রেরা তাদের অর্ডার মতোই এগুলো তৈরী করে। যাদের আবিষ্কার বা উদ্ভাবনী শক্তি অজস্র লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করেছিল একটু তলিয়ে খোঁজ নিলেই জানা যাৰে যে তারা অনেকেই সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে বৈশ্যের কৃপাকণার ওপর নির্ভরশীল। কবি-সাহিত্যিক লেখেন বৈশ্য প্রকাশকের অর্ডার-মাফিক অথবা বৈশ্য-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের পুরস্কারের আশায়। শিল্পী তুলি ধরেন ৰাজারের চাহিদা বুঝে-উন্নততর কলার দিকে নজর না দিয়ে, কতকটা ৰাধ্য হয়েই কমার্সিয়াল আর্টের সেবা করেন। স্পষ্ট কথায় লেখার অভিযোগে পাছে সাংবাদিকের চাকুরী যায় সেই ভয়ে তাকে মুনাফাখোর সংবাদপত্র-ব্যবসায়ীর অভিলাষ মত দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে হয়; অযোগ্যকে নেতারূপে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়েও সত্যের অপলাপ করতে হয়; লেখনীর সাহায্যে মিথ্যার তুবড়ি ফাটাতে হয়।

এর অবশ্য আর একটা দিক আছে। স্রেফ ৰৌদ্ধিক উৎকর্ষ আর ৰৌদ্ধিক চর্চা নিয়ে থাকতে গেলে বাস্তব জগতের প্রয়োজনগুলো মেটানো দায় হয়ে ওঠে। বৈশ্য ফিনান্স করায় সেই সমস্যার একটা সুরাহা হয় ও নিশ্চিন্ত মনে বিপ্ররা নিজেদের কাজ করে যাবার সুযোগ পায়। কিন্তু বৈশ্য তো আর বিনা স্বার্থে আর্থিক সমর্থন করে না! তার প্রচ্ছন্ন মতলৰ থাকে সমাজের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ও তারই ফলে বিপ্রযুগের অবসান ঘটে। বৈশ্যসেবী বিপ্র উদরপূর্তির সামান্য উপকরণের বিনিময়ে নিজের সমস্ত বৌদ্ধিক শক্তি বৈশ্যের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে লাগিয়ে দেয়। কোটিপতি শেঠ তার সম্পদ বৃদ্ধির সামান্য বেতনে কিছু সংখ্যক বিপ্রকে কর্মচারী হিসেৰে নিয়োগ করে আর তাদেরই বুদ্ধির সাহায্যে ভেজালের, চোরাকারবারের ও চোরাই-চালানের জাল বিস্তার করে। বিপ্র বৈশ্যের আনুগত্য স্বীকার করার পর বিপ্রের সহায়তাতেই বৈশ্য পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী দর্শনকে দৃঢ়মূল করে তুলতে চায়। অত্যাধুনিক ভূ-দান আন্দোলনও এই ধরণের বৈশ্যের পক্ষপুটে আশ্রিত দর্শন যা প্রচার করে চলেছেন বৈশ্যানুগত বিপ্রের দল। এই ধরণের জিনিসের ফলে বৈশ্য-শোষিত মানব সমাজের শোষণের

বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেষ্টায় ভাঁটা পড়বে, কারণ তারা ভাববে ধনীরা যদি স্বেচ্ছায় তাদের ভূমি বা সম্পত্তি জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেন তাহলে পৃথক ভাবে আর সংগ্রামের প্রয়োজন কী?

তাদের এই সংগ্রাম-বিমুখতা বৈশ্য-যুগকে কিছুটা দীর্ঘায়ত করবে। কারণ বৈশ্যেরা জানে তারা আসলে যা' দান করবে তার অধিকাংশই বাস্তবে নয়, কেবল কাগজে-কলমে, আর যেক্ষেত্রে বাস্তবে দান করৰেও সেক্ষেত্রে ওই দানের দ্বিগুণ মুনাফা তারা অন্যপথে নিজেদের ঘরে এনে তুলবে। বৈশ্যযুগে এই ধরণের মৎকুন-দর্শন খবরের কাগজে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ফলাও করে ছাপানো হয় ও পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ছাত্রগণকে এই ধরণের ক্ষতিকর দর্শনের দ্বারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়। বৈশ্য-দালালদের শান্তি-সম্প্রীতি ও মানবতার প্রতীকরূপে পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে প্রচার করে তাদের সম্বন্ধে শিশুদের মনে শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্য- সিদ্ধির জন্যে একটা নূতন ধরণের অর্থনীতি-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বৈশ্যযুগে সৃষ্ট হয়ে থাকে যা ক্ষাত্রযুগের পৌরুষ ও বংশগরিমা-ভিত্তিক ও বিপ্র যুগের বৈদগ্ধ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এই বৈশ্য-যুগীয় জাতীয়তাবাদ যে ধরণের সাম্রাজ্যবাদের স্রষ্টা মানুষ- জাতের সংহতির পক্ষে সেটাই সৰচেয়ে ভয়ঙ্কর। এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদের ভৃত্য হিসেবে উঁচু-নীচু সমস্ত পদেই বৈশ্য-পদলেহী বিপ্রের যথেষ্ট প্রতিপত্তি। কিন্তু এর নেতৃত্ব ও অর্থনৈতিক সংরচনা তৈরীর দায়িত্ব বৈশ্যেরা কিছুতেই বিপ্রদের হাতে ছেড়ে দেয় না। কোন্ দেশে অথবা কোন্ রাষ্ট্রে বৈশ্য-যুগ চলছে সেটা অন্য কোন উপায়ে সহজে বোঝা যায় না অর্থাৎ বৈশ্য নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র যে গণতান্ত্রিক হতেই হৰে এমন কোন কথা নেই। তবে তাতে একটা লক্ষণ খুবই সুস্পষ্টভাবে থাকে যে তার অর্থ সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা বা তৎসংক্রান্ত মন্ত্রীর পদ খাঁটি বৈশ্যদের হাতেই রেখে দেওয়া হয়। অর্থনীতিতে পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ বিপ্রদের হাতে এই দায়িত্ব বৈশ্যেরা কিছুতেই ছেড়ে' দেয় না। কারণ অর্থ-সংগ্রহ ও অর্থ-বণ্টনের নিজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমেই বৈশ্যেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পায়। তাই বৈশ্য-সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থায় বিপ্র-পণ্ডিতেরা বেতনভুক্ পরিকল্পনা রচনাকারী ও ওই পরিকল্পনাকে কার্যান্বিত করার জন্যে নিযুক্ত বুদ্ধিজীবী ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

জনসাধারণ বৈশ্য-সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থায় আসবার পরে যখনই দেখা গেছে যে বিপ্রেরা বৈশ্যের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে তখনই বৈশ্য তার অর্থৰলের সাহায্যে জনসমর্থন কিনে নিয়েছে ও বিদ্রোহী বিপ্রের সমস্ত বুদ্ধিমত্তাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে আর একদল পদলেহী বিপ্রকে তাদের স্থানে বসিয়েছে। বৈশ্য-সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থায় ক্ষেতে, কলকারখানায় শ্রমিক- বিক্ষোভই হোক আর রাষ্ট্র-বিপ্লবই হোক, কেবল ভাড়াটে বিপ্রের সাহায্যেই নয়, ভাড়াটে ক্ষত্রিয় তথা শূদ্রের সাহায্যেও বৈশ্য সেই বিক্ষোভ বা বিপ্লব দমন করেছে। বস্তুতঃ 'divide and rule' 'policy বৈশ্যেরাই সৰচেয়ে বেশী কাজে লাগিয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, স্বর্গতঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তের দাবীতে এক শ্রেণীর বিপ্র যখন মুখর হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে কলিকাতায় ট্রামের ভাড়া কিছুটা ৰাড়িয়ে দিয়ে সেই ভাড়া বৃদ্ধি ৰন্ধ করার দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে আর এক শ্রেণীর বিপ্র প্রথম শ্রেণীর আন্দোলনটিকে ঠাণ্ডা করে দেন। তার ফলে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যাঁরা দায়ী ছিলেন সেই স্বভাবগত বৈশ্যেরা শাস্তির হাত থেকে

রেহাই পেয়ে গেলেন। শ্রমিক আন্দোলন ৰন্ধ করবার জন্যে মালিকেরা অথবা বৈশ্য-শাসিত রাষ্ট্রগুলি যে সকল ভেদ-বুদ্ধি প্রয়োগ করে থাকেন তা শিক্ষিত ব্যষ্টিমাত্রেই অল্পবিস্তর জানেন।

বিপ্রের বুদ্ধিমত্তাযুক্ত আন্দোলন অথবা পরিকল্পনাগুলিকে ভেস্তে দেবার জন্যে অপর একদল বিপ্রকেই চর বা গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই সকল চর বা গোয়েন্দারা কোন আদর্শবাদের প্রেরণায় কাজ করে না-তারা কাজ করে পেটের দায়ে, বৈশ্যের তারা বেতনভুক অন্নদাস মাত্র। বৈশ্যের প্রভাব থেকে বুদ্ধিমান বিপ্র বা সাহসী ক্ষত্রিয়ের বাঁচবার যে চেষ্টা তাকে বলতে পারি বিপ্র বা ক্ষত্রিয়-সৃষ্ট বিক্রান্তি বা প্রতিবিপ্লব। কিছুকাল পূর্বে হাঙ্গেরীতে যা হয়ে গিয়েছিল কেউ কেউ তাকে প্রতিবিপ্লব আখ্যা দিলেও আসলে তা প্রতিবিপ্লব ছিল না-তা ছিল ক্ষত্রিয় শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্রের বিপ্লব। দেশ, কাল ও পাত্র সেই বিপ্লবের উপযুক্ত ভাবে তৈরী হতে পারেনি বলে তা ব্যর্থ হয়েছিল। ক্ষমতা দখলকারীরা সেই বিপ্লবকে খাটো করবার জন্যেই প্রতিবিপ্লব আখ্যা দিয়েছিল।

ভারতবর্ষে বর্তমানে পূর্ণমাত্রায় বৈশ্য-যুগ চলেছে। কিন্তু শোষিত বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের মধ্যে এই সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতা না আসায় ও অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখে ভারতের চতুর বৈশ্যেরা কিছুটা সাবধান হওয়ায় ও কতকটা মনোবিজ্ঞান সম্মত পন্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে না করে পরোক্ষভাবে শোষণ করতে থাকায় বৈশ্যযুগের অবসানের জন্যে এখনও পর্যন্ত বিপ্লব হয় নি। বিপ্লব হওয়া তো দূরের কথা, বিপ্লবের আবশ্যকতাও বুদ্ধিমান সমাজে ঠিকভাবে দানা বাঁধেনি। তারা এখন দ্বিধাগ্রস্ত। প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রান্তির পথে বিনা সংগ্রামেই যদি এই বৈশ্যযুগের অবসান ঘটে সেই সুদিনের মুখ চেয়ে তাঁরা আছেন। তাঁদের এই মনোভাবের প্রতিফলনই সর্বোদয় বা গান্ধীবাদের প্রতি এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর সমর্থন। তারা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না যে এই গান্ধীবাদ বা সর্বোদয় আন্দোলন তাদের দুঃখের রাত্রিকেই দীর্ঘায়ত করবে।

সত্যিকারের জনদরদী একশ্রেণীর নেতা গান্ধীবাদ বা সর্বোদয় আন্দোলনকে মনে প্রাণে সমর্থন করেন না বটে, তবে তাঁরা ভাবেন, তাঁদের কল্যাণ-রাষ্ট্রের পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনা সংগ্রামেই বৈশ্য ক্ষমতাচ্যুত হবে। তাঁদের ভাবনাটা যে

একেবারেই অযৌক্তিক একথা বলছি না। কারণ তাঁদের চোখের সামনেই দৃষ্টান্ত রয়েছে, গ্রেট-ব্রিটেন কল্যাণ-রাষ্ট্রের আদর্শকে গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রবাদের দিকেই এগিয়ে চলেছে। সেখানে যা সম্ভব হয়েছে এখানেই বা তা হৰেনা কেন? প্রশ্নটা স্বাভাবিক, কারণ সমাজ-চক্রের পরিঘূর্ণনে বিপ্লব (revolution) যে হৰেই হৰে এমন কোন কথা নেই, ক্রান্তির (evolution) মাধ্যমেও তো যুগ পরিবর্তন হতে পারে। কথাটা ঠিক, কিন্তু এই ক্রান্তির মাধ্যমে সত্যিকারের কল্যাণ-রাষ্ট্র বা জনগণের সত্যিকারের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করা সৈদ্ধান্তিক বিচারে সম্ভব হলেও বৈবহারিক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। গ্রেট-ব্রিটেনে জনগণের জীবন-যাত্রায় কতকগুলি সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটানো হচ্ছে বটে কিন্তু তাতে করে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কতটুকু দূর হয়েছে! স্পষ্টতই সেখানে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা। ক্ষুব্ধ শোষিত জনসাধারণকে কিছুটা সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে তাদের মুখে ছিটে-ফোঁটা চরণামৃত ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে তারা ক্ষীর-চন্দনের সামান্য আস্বাদ পাচ্ছে বটে কিন্তু পেট তাতে ভরছে না।

ভারতের জনগণের অভাব ব্রিটেনের জনগণের অভাবের চেয়ে অনেক বেশী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার অল্পতার দরুণ তথা গান্ধীবাদ ও সর্বোদয়ের বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় বিমূঢ় হওয়ার দরুণ আরও কিছুকাল হয়ত তারা পুঁজিবাদের চরদের স্তোকবাক্যে ভুলে থাকৰে। কিন্তু সে অবস্থা বেশীদিন চলবে না। ধনীদের হাতে বোট (vote) কিনে নেবার সুযোগ থাকায় যারা সত্যিকারের জনদরদী তাদের পক্ষে পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া খুৰ সহজ হবে না, আর তাই সত্যিকারের কল্যাণ-রাষ্ট্রের মত আইন প্রণয়ন করে ভারতে দুঃখ দূর করা সম্ভব নয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়।

বিপ্রের তুলনায় বৈশ্য-সমাজে অসাধুর প্রাধান্য অনেকগুণ বেশী। তারা তাদের মূলধন বা কায়েমী সুযোগের অধিকাংশটাই অন্যের শ্রমার্জিত (এখানে শ্রম বলতে ৰৌদ্ধিক শ্রমকেও অবশ্যই ৰোঝায়) সম্পদ ছিনিয়ে নেবার কাজেই লাগিয়ে দেয়। বিপ্র তার বৌদ্ধিক শক্তির সাহায্যে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ সত্তাকে যেমন ইচ্ছামত স্তম্ভিত ও ইচ্ছামত কর্মায়িত করে থাকে বৈশ্য তদপেক্ষাও নির্মমভাবে বিপ্র তথা অন্যান্য সকলকে ঠিক কলুর বলদে পরিণত করে। তাই বিপ্র যুগের পর যখন

বৈশ্যযুগের সূচনা দেখা দেয়, বিপ্র-ক্ষত্রিয় যখন অসহায়ভাবে বৈশ্যের কাছে আত্মবিক্রয় করে তখন সে ভালভাবেই বোঝে যে সে বিকিয়ে যাচ্ছে। মুর্গীখোরের হাতে মুর্গী যখন বিকিয়ে যায় সে মুর্গীর অবস্থা তখন যেমন হয় এদের অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়ে থাকে। এই বিকিয়ে যাওয়া জিনিসটা বোঝে না কেবল শূদ্রের দল।

ব্যষ্টিগত স্বার্থ, অর্থনৈতিক জ্ঞানের অভাব, দলাদলি প্রভৃতি দোষগুলির জন্যে বিপ্র-ক্ষত্রিয়রা সৰ জিনিস জেনে বুঝেও বৈশ্য প্রাধান্য মেনে নেয়। এই বিপ্র-ক্ষত্রিয়ের দোষ-ত্রুটি, তাদের একতার অভাব ও অন্যান্য দুর্বলতাগুলি বৈশ্যেরা ভালভাবেই বোঝে, আর বোঝে ৰলেই টাকার জোরে তাদেরই একদলকে অন্যদলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম রাখতে চায়। তাদের অনুগৃহীত ক্ষত্রিয়েরা অযথা যুদ্ধে ও বিভিন্ন ধরণের দাঙ্গা- হাঙ্গামায় লড়ে প্রাণ হারায় আর তাদেরই আশ্রয় পুষ্ট বিপ্রের দল জাতিভেদ, জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি ইজন্মের অজস্র প্রকারের sentiment ও শাস্ত্রাদি তৈরী করে দিয়ে এই দলাদলিকে কায়েম করে রাখে। একথা ভালভাবেই জেনে রাখা দরকার যে, যে সকল ইম্ মানুষকে মানুষের থেকে দূরে রেখে দেয় সেগুলির

সবকটিতেই বৈশ্য প্রোৎসাহন দেয়। জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা, জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা–এইসব প্রধানতঃ বৈশ্যের অর্থে পুষ্ট হয়, আর বৈশ্য এই কাজে টাকা জোগায় মানুষজাতকে খণ্ডবিখণ্ড, ছিন্ন– বিচ্ছিন্ন করে রাখবার জন্যে–যাতে করে তারা কিছুতেই মিলে মিশে বৈশ্য– শোষকের বিরুদ্ধে আবাজ তুলতে না পারে। মজার কথা এই যে ক্ষত্রিয়ের প্রাণশক্তি ও বিপ্রের ৰৌদ্ধিক শক্তিকে টাকার জোরে কিনে নিয়ে বৈশ্য সেগুলির সাহায্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ও ক্ষত্রিয়–বিপ্রকে দীর্ঘকাল ধরে গোলামে পরিণত করে রাখে।

বিপ্রের বাক্যবল ও বুদ্ধিৰলের চেয়ে বৈশ্যের অর্থৰল ৰেশী মূল্য বহন করে, ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের চেয়ে তো বটেই। তাই অর্থের বিনিময়ে বিপ্রের মগজ ও ক্ষত্রিয়ের পেশীকে কিনে নিতে বৈশ্যের কোনো অসুবিধা হয়না।জ্ঞান, বুদ্ধি, বৈদগ্ধ্য অথবা অতিরিক্ত সাহস ও শারীরিক শক্তি যার আছে অর্থোপার্জনের ঝুঁকি নেবার সাহস ও কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধিও তার বড় একটা থাকে না। ক্ষত্রিয়–বিপ্রের এই দুর্বলতার কথাও বৈশ্য জানে ও বোঝে।

ক্ষত্রিয়ের শৌর্যের ও বিপ্রের বুদ্ধির কিছুটা তারিফ করে বৈশ্য তাদের বৈবহারিক বুদ্ধিকে আরও ভোঁতা করে দেয় ও তারপর অতি সহজেই তাদের সর্বসত্তাকে কিনে ফেলে। বৈশ্য-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও বড় বড় বীরকে পুরস্কার-পদক-খেতাৰ দেওয়ার রীতিও এই উদ্দেশ্য- সঞ্জাত। এতে করে ক্ষত্রিয়-বিপ্র তাদের সমস্ত সম্পদ সামান্য নামযশ বা অর্থের বিনিময়ে বৈশ্যের চরণে লুটিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতে থাকে। তারা তখন একথা বুঝতে পারেনা যে এতে করে তারা নিজেদেরই কৰর খুঁড়ল।

বৈশ্য যুগ

ক্ষত্রিয় ও বিপ্র-এরা দু'য়েই জড়কে ভোগ করতে চায়। তবে জড় বস্তু আহরণের রীতি পদ্ধতি তাদের পৃথক। বৈশ্য কিন্তু জড়কে ভোগ করতে যতটা না চায় তার চেয়ে বেশী চায় জড়কে নিজের অধিকারে রাখতে আর চোখে তা দেখে বা মনে তাকে ভেবে শান্তি পেতে। অর্থাৎ বৈশ্য-যুগেই বস্তুর

বৈবহারিক মূল্য সব চাইতে কমে যায়। বস্তু স্বভাবে বা টাকার অঙ্কে ক্রমশঃ স্থাণু হয়ে পড়তে থাকে। বৈশ্য যুগে এইটেই সব চেয়ে বড় অভিশাপ। কারণ ভোগ্য বস্তুর গতিশীলতা যেখানে যত কম বা অন্য ভাষায় বলতে গেলে বিশেষ বিশেষ প্রকোষ্ঠে তার স্থিতিশীলতা যত বেশী ততই তা জনসাধারণের পক্ষে অধিকতর ক্ষতির কারণ হতে থাকে। ক্ষত্রিয় বা বিপ্রযুগে গোলায় ফসল পচছে অথচ মানুষ না খেয়ে মরছে এমনটি বড় একটা হয় না। মানুষে-মানুষে প্রাচুর্যগত পার্থক্য বিপ্র বা ক্ষত্রিয়যুগে থাকলেও অন্যকে অভাব-অনটন বা বুভুক্ষার অন্ধ-গহ্বরে ঠেলে দিয়ে ক্ষত্রিয় বা বিপ্র কেউ সম্পদ ভোগ করে না। কারণ ক্ষত্রিয় বা বিপ্র অন্যকে শোষণের যন্ত্র হিসেবে দেখলেও শোষণের উৎস হিসেবে দেখে না-যা বৈশ্য দেখে থাকে। বৈশ্যের কাছে বিপ্র ক্ষত্রিয় বা শূদ্রের দল শোষণের যন্ত্র তো বটেই, উৎসও বটে।

বৈশ্য তার ভোগ্যবস্তু জড়কে নিজের কাছে টেনে আনে অন্যের জড়শক্তির মাধ্যমে অথবা সোজাসুজি ভাব-সংঘাতের মাধ্যমে অথবা সুবিধামত কোথাও জড়-সংঘাত ও কোথাও ভাব-সংঘাতের দ্বারা বা যুগপৎ উভয়বিধ সংঘাতের দ্বারা অর্থাৎ এই ব্যাপারে বৈশ্যের ভূমিকা বিপ্রেরই মত। তবে, এই

ব্যাপারে বিপ্রের থেকে তার পার্থক্য হচ্ছে এই যে বিপ্র যখন ভোগ্যবস্তুকে নিজের কাছে টেনে আনে তখন অন্যকে সে জানতে দেয়না যে ভোগ্য- বস্তুকে কাছে টেনে আনাই তার মতলৰ। সে তখন অজস্র প্রকারের ছলাকলা, শাস্ত্রোক্তি, লোক-দেখানো নির্বিকার ভাব ও নানা ধরণের পন্থা অবলম্বন করে থাকে। বৈশ্য কিন্তু তা করে না, অন্ততঃ এই ব্যাপারটায় সে বিপ্রের চেয়ে বেশী সরল। সে যে অধিক পরিমাণ ভোগ্য-বস্তু করায়ত্ত করতে চায় তার এই উদ্দেশ্যে কোন প্রচ্ছন্নতা নেই।

বিবেকের তাড়না কিছুটা থাকায় বিপ্র তার ষোল আনা ৰৌদ্ধিক সামর্থ্যকে ভোগ্যবস্তু আহরণের কাজে লাগায় না ও বিবেকের বা বৈদগ্ধ্যের মাত্রা বেশী থাকলে অনেক সময় এদিকটাকে সে উপেক্ষাও করে থাকে। বৈশ্যের বেলায় এমনটি হয় না। প্রথমতঃ তাদের মধ্যে বিবেকের একটু অভাবই থেকে থাকে ও তাছাড়া যদি কারো কারো মধ্যে বিবেক একটু বেশী মাত্রায় থেকেও থাকে সেক্ষেত্রেও তারা সময় সুবিধা বা রুচি-প্রবৃত্তি অনুযায়ী দান-ধ্যান করে থাকে ৰটে কিন্তু ভোগ্যবস্তু অর্জনের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের ঢিলেমি করে না। বিবেক-সম্পন্ন বৈশ্য যে এককথায় লাখ টাকাও দান করে দেয় সেও বেচা-কেনার সময় এক পয়সা দাম কমাতে সহজে চায় না।

ভোগ্যবস্তু আহরণের পরিণামও বিপ্র ও বৈশ্যের ক্ষেত্রে একরকম নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নততর জীবনের অল্পাধিক ভাবনা থাকার ফলে ভোগ্যবস্তুকে বিপ্র জীবনের ধ্যান-জ্ঞান বলে' বড় একটা মনে করে না। কিন্তু বৈশ্য তা করে, আর তাই সে একদিন জড়েরই স্বারূপ্য লাভ করে।

বৈশ্যের যা কিছু গৌরব তা সে পেয়ে থাকে জীবনে ঝুঁকি নেবার বিনিময়ে। এই ব্যাপারে তার স্থান বিপ্রের চেয়ে তো অনেক ওপরেই, এমন কি হয়ত বা ক্ষত্রিয়ের তুলনায়ও কিছুটা বেশী। জীবনের উত্থান-পতন ও ক্ষয়-ক্ষতির সমস্ত সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই বৈশ্যকে এগিয়ে চলতে হয়, আর তাই জীবনে সবরকম অবস্থাতেই মানিয়ে চলার যোগ্যতা তাকে অর্জন করতে হয়। নুন-পান্তা, পোলাউ-কালিয়া কোনটার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বা বিকর্ষণ রাখলে পরে তার চলে না। আর এখানেই থেকে যায় তার সমস্ত উন্নতির চাৰি-কাঠি। বৈশ্যও যুধ্যমান, তবে তার যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের মতো তো নয়ই, বিপ্রের মতোও নয়। বৈবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের যে পৌরুষ থাকে বৈশ্যের তা থাকে না, বরং থাকে তার উল্টোটা কাপুরুষতা। অর্থের বিনিময়ে পৌরুষকে ৰেচে দিতে, সমাজ বা রাষ্ট্রকে ৰেচে দিতে, নারীর সম্মান বা জাতির স্বাস্থ্য বেচে

দিতেও তার রুচিতে ৰাধে না–যা' ক্ষত্রিয় কিছুতেই পারে না। বিপ্রের সংগ্রাম বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে সীমিত কিন্তু বৈশ্যের ঠিক তাও নয়, তার সংগ্রামটা ৰৌদ্ধিক কিন্তু সে বুদ্ধি কেবল অর্থোপার্জনের কাজেই নিয়োজিত। তাই স্রেফ বৌদ্ধিক সংঘর্ষ যদি বিপ্রে–বৈশ্যে হয় তাতে বিপ্রের জয় হৰে কিন্তু সংগ্রাম যদি কেবল অর্থকরী বৃত্তিতে সীমিত থাকে সে সংগ্রামে বৈশ্যের জয় হবে–বিপ্রের মগজ তার সিন্দুকে বাঁধা পড়বে।

বৈশ্য–বুদ্ধি অর্থ–লিপ্সার চশমা পরেই পৃথিবীকে দেখে। দুনিয়ার কোন কিছুকেই পূর্ণভাবে বা ঠিক ভাবে বোঝবার সামর্থ্য তার নেই। তার চশমায় প্রতিটি বস্তুর অর্থকরী রূপটুকু ব্যতিরেকে আর কোন কিছুই দেখা যায় না। শুধু জড় জগৎ নয়, মানসিক তথা আধ্যাত্মিক জগৎকেও সে ব্যবসাদারীর দৃষ্টি দিয়ে দেখে থাকে,*

** ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের শীতকালে কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী জ্যোতিষী (বিপ্র) ঘোষণা করেছিল যে কতকগুলো গ্রহ একটা রাশিতে আসায় নাকি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ধরণের ঘোষণা করবার পেছনে তাদের হয়ত বা মতলৰ ছিল যে তথাকথিত এই প্রলয়ের পূর্বক্ষণে অতিরিক্ত ভয়ে জনসাধারণের মধ্যে হয়ত এক ধরণের শ্মশান–বৈরাগ্য দেখা*

দেবে ও এর জন্যে তারা তাদের সম্পদের বিরাট অংশ বিপ্রকে দান করে পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে রাখবে। ভারতবর্ষের এই বিপ্ররা কিছুটা সাফল্য লাভও করেছিল- পাপীরা ভয়ে দান-ধ্যানও শুরু করে দিয়েছিল। বৈশ্যরা ভয়ে গ্রহাচার্যদের দিয়ে বড় বড় যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছিল, ভেবেছিল ওই ধোঁয়ার জোরে বুঝি গ্রহগুলো সংশ্লিষ্ট রাশি থেকে এদিকে ওদিকে ছিটকে যাবে, আর প্রলয়টাও হবে না। বৈশ্যের (Capitalist) এই যে সাময়িক ধর্মভাব এর মধ্যে ব্যবসায়িক মনোভাব অতি সুস্পষ্ট। এর পাশে পাশে আরও একটা মজার ব্যাপার দেখেছিলুম, যে সকল জঘন্য ঘি মানুষের খাদ্যের অযোগ্য বলে কেউ কখনও কেনেনি সেগুলোই যজ্ঞার্থে ব্যবহারের জন্য বৈশ্যের দল মোটা দরে বেচেছে।

বুদ্ধিজীবী হিসেবে সূক্ষ্ম মানস-সম্পদ আহরণের যোগ্যতা থাকলেও সে যোগ্যতার সে যথাযথ সদ্ব্যবহার করে না, তবে ৰৌদ্ধিক মাত্রাভেদ অনুযায়ী কেউ কেউ অতি সূক্ষ্মভাবে অর্থোপার্জনের পথ তৈরী করে নেয়! ৰৌদ্ধিক উৎকর্ষ বা উপচিকীর্ষা তার হয় বটে তবে সব সময়েই ওই একটি কথা সে অবশ্যই মনে রাখে যে তাকে ধনী হতে হবে। সে সেই

দেবতার পূজা করে যার সম্বন্ধে তার ধারণা আছে যে সে তাকে বিত্তবান করবে। লোক ঠকিয়ে কোটি কোটি টাকা রোজগার করে ব্যবসায়িক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েই সে মুনাফার কিছু অংশ দিয়ে মন্দির বা ধর্মশালা করে দেয়। মতলব থাকে যে এর বিনিময়ে তার পাপক্ষয় হবে। অ্যাবুদ্ধির জাগরণের জন্যে বা ঈশ্বর সম্প্রাপ্তির জন্যে যে নিষ্কাম সাধনা সে পথে বৈশ্য পা বাড়াতে চায় না। ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য থেকে বৈশ্য দূরে থাকে বা সাধারণতঃ দূরে থাকতে চায় বলে ধর্মভাব-ধর্মবোধ বলতে তার মনে কতকটা ঈশ্বর-ভয় ছাড়া আর কিছুই থাকে না ও যে কোন কারণে এই ঈশ্বর-ভয় কিছুটা কমে গেলে সে সমাজে হীন শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তখন সে তার টাকার ক্ষুধা মেটাবার জন্যে করতে পারে না এমন কোন পাপ নেই।

অর্থকরী বৃদ্ধির গতি অত্যন্ত কুটিলা। সে গতিতে প্রয়াসের প্রার্থর্য আছে কিন্তু বিষয়ের জড়ত্বনিৰন্ধন তা সরল হতে পারে না, তাই তা বক্র- অত্যন্ত বক্র। প্রয়াসের প্রাখর্যে সে রজোগুণী, আর বিষয়ের জড়ত্বে সে তমোগুণী, তাই সে রজস্তমঃ-পীতবর্ণের প্রতীক। বৈশ্যের প্রয়াসের মাত্রা ক্ষত্রিয়ের তুলনায় বেশী হলেও তার মাত্রা শরীরের চেয়ে মনেই বেশী।

বৈশ্য- ভাবনায় জাগতিক সম্পদ অনেককে বঞ্চিত করে অল্পের মধ্যে সঞ্চিত হ'তে থাকে বলে বৈশ্যরা সব সময়েই সংখ্যাল্প, আর তাদের শোষণের উপকরণ ও শোষণের যন্ত্র হিসেবে থেকে যায় যারা, তাদেরই সংখ্যাধিক্য। শোষিত চীনীর বলদের মত এই যে সংখ্যাধিক জনসাধারণ এদের পঙ্গু মন ভাবতে থাকে যে চীনী খাবার অধিকার তাদের নেই। তাদের এই ভাবনাই বৈশ্যের পরম বন্ধু। বৈশ্যেরা সর্বতোভাবে-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের মনে এই ভাবনাকেই পরিপুষ্ট করে রাখতে চায়, আর এজন্যেই তারা রকমারি ইজন্মের ও আকাশ ছোঁয়া তত্ত্ব কথার আমদানি করতে চায় শূদ্রাবস্থা-প্রাপ্ত বেতনভুক্ বিপ্রদের সাহায্যে। চীনীর বলদের দল যখন শোষণ সহ্য করতে না পেরে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখনই বৈশ্যযুগের অবসান হয়। বৈশ্যেরা যে সমাজের পরগাছা এই তথ্যটা নিপীড়িত জনসাধারণকে বোঝাতে বেশ সময় লাগে আর তাই বৈশ্যযুগের অবসান ঘটাতে গেলে খুৰ বেশী কাঠ-খড় পোড়াতে হয়।

বৈশ্য বলতে আমি নিকৃষ্ট বৈশ্যগণকেই বোঝাতে চাইছি। যারা নিকৃষ্ট বৈশ্য নয় তাদেরও আমি উৎকৃষ্ট বৈশ্য বলতে রাজি নই কারণ যাঁরা শোষণও করেন, দানও করেন তাঁদের

দানে সমাজ উপকৃত হয় বটে কিন্তু শোষণে যারা মরে ভূত হয়ে যায় তারা তো আর নূতন করে প্রাণ ফিরে পায় না!

শূদ্রের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, ক্ষত্রিয়ের পৌরুষ, আর বিপ্রের বুদ্ধিকে নিজের আর্থিক পুঁজির সাহায্যে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগিয়ে বৈশ্য তার মূলধনের অঙ্ক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে। শূদ্র ঠিক পশুর মতই গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে কায়িক শ্রম ৰেচে দেয়। শ্রম সে ৰেচে ৰলেই সমাজ বেঁচে' থাকে ও এগিয়ে যায়। ক্ষত্রিয়ের পৌরুষ সমাজের কাঠামোটাকে গড়ে ও তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে শূদ্রের কাছ থেকে শ্রম আদায় করে নিয়ে। ক্ষত্রিয়ের পৌরুষকে বিপ্র কাজে লাগায় নিজের বুদ্ধিৰলের সাহায্যে, আর বৈশ্য বিপ্রের বুদ্ধিকে নিজের পুঁজি ৰাড়াবার কাজে লাগায় পুঁজি ও পুঁজিবাদী বুদ্ধির সাহায্যে।

সমাজের কোনো সমস্যাকেই বৈশ্য সামনা-সামনি মোকাবিলা করে না,- টাকা দিয়ে যেমন সে শূদ্রের শ্রম কেনে, ক্ষত্রিয়ের পৌরুষ কেনে, বিপ্রের বুদ্ধি কেনে, ঠিক তেমনি অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলোরও সে সমাধান করতে চায় টাকার বিনিময়ে। সংগ্রামে সে জয়লাভ করে না-টাকা খরচ করে জয় কিনে নেয়। দারিদ্র্য-পীড়িত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও টাকার জোরে সে বোটও কিনে নেয়। অর্থের

জোরে সৰকিছু করে বলে তার প্রাণশক্তি অর্থতেই নিহিত থাকে। অর্থসংগ্রহের জন্যে সে জীবনে সবরকমের ঝুঁকিও নিয়ে থাকে। অর্থের জন্যে ধর্মাধর্ম, কর্মাকর্ম যে কোন বিচারকেই সে এক মুহূর্তে ত্যাগ করতে পারে।

তাই অসৎ বৈশ্যের হাত থেকে শোষিত শূদ্র-ক্ষত্রিয়-বিপ্রকে বাঁচাতে হলে বৈশ্যের সমস্ত প্রতিপত্তির একমাত্র আধার এই অর্থকে তাদের জিম্মা থেকে ছিনিয়ে নিতেই হবে। বৈশ্যের হাত থেকে টাকা সরে গেলেই যে সমস্ত সমস্যার সমাধান হ'ল, এমন ভাবা উচিত হবে না। অর্থ গেলেও অর্থগৃধু বুদ্ধি তো থেকেই যাচ্ছে? তাই সমাজের কাঠামোটা এমনভাবে গড়ে তুলতে হৰে তথা সমাজকে দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে করে তার এই অর্থগৃধু বুদ্ধিটা বন্ধ্যা হয়ে যায়। ৰাৰা-বাছা বলে বা বড় বড় তত্ত্ব-কথা আউড়ে এই কাজ হ'বার নয়। অর্থকরী বুদ্ধিটাকে জড়শক্তির সাহায্যে অকর্মণ্য করে দিয়ে তবে তাকে তত্ত্বলোকের সন্ধান দিতে হবে ও অ্যাবৃদ্ধি জাগাবার সাধনায় বসাতে হবে।

বৈশ্যের কাছে সমাজ-দেহ অর্থোপার্জনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যন্ত্রের মাথা হ'ল বিপ্র, বাহু হ'ল ক্ষত্রিয়, পা হ'ল শূদ্র। শাস্ত্রকারেরা বলবেন, আর বৈশ্য হ'ল, সে যন্ত্রের উরু। কিন্তু আমি ৰলৰ না, তা নয়। বৈশ্যরা সমাজ দেহের অঙ্গ বটে কিন্তু যে সমাজদেহ অর্থোপার্জনের যন্ত্র বৈশ্য তার অঙ্গ নয়-বৈশ্য তার বাইরে। বৈশ্য তার যন্ত্রকে তেল- জল-জ্বালানী যুগিয়ে যায়, আর এই তেল-জল-জ্বালানী যোগানো বাবদ তার যা খরচ হয় তার চেয়ে অনেক বেশীগুণ সে এই যন্ত্রের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। বৈশ্য ভাবে, আমি যখন তেল-জল-জ্বালানী যুগিয়ে যন্ত্রকে চালু · রেখেছি, তখন এই যন্ত্রের যা কিছু কৃতিত্ব তা আমারই। আমি একে টাকার জোরে গড়ৰ, টাকার জোরে ভাঙৰ, দরকার বুঝলে, বেশী তেল-জল-জ্বালানী যুগিয়ে বেশী কাজ আদায়ের চেষ্টা করব, আর দরকার না থাকলে, ডাষ্টবিনে ফেলে দোৰ।

সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্রের ভূমিকা যদি পরস্মৈপদী হয় তবে বৈশ্যের ভূমিকাটি কী তা বোঝাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। বিপ্র ও বৈশ্য দুই-ই সমাজের শোষক কিন্তু বিপ্র যে ধরণের শোষক সে শোষক সমাজের নিকট ততটা ভয়ঙ্কর

নয় যতটা ভয়ঙ্কর বৈশ্য-শোষক। বস্তুতঃ এই বিচারে বৈশ্যকে বলতে পারি, সমাজ-বৃক্ষের একটি প্রাণঘাতী পরগাছা যা সমাজের সমস্ত রস নিজে টেনে নিয়ে মূল গাছটিকে মেরে ফেলতে চায়। মূল গাছটি যদি মরে যায় পরগাছাও মরবে। বৈশ্য-পরগাছা এই কথাটা যে জানে না এমন নয়, তাই সে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অল্প স্বল্প দান-দক্ষিণা, মন্দির-মস্জিদ, গীর্জা-ধর্মশালা, অল্প-স্বল্প বোনাস্, কাঙালী-ভোজন ইত্যাদি করে থাকে। কিন্তু অতিলোভের মোহে যখন সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে মূল সমাজ-দেহকে নিঃশেষে শোষণ করতে চায়, তখনই বিপর্যয় দেখা দেয়। সমাজ-দেহে চেতনা না থাকলে সে সময়ে সমস্ত সমাজ-দেহের সঙ্গে বৈশ্যেরও মৃত্যু ঘটৰে, অন্যথায় মরবার আগে শোষিত বিপ্র-ক্ষত্রিয়-শূদ্র একযোগে বৈশ্যকে ধ্বংস করবে-এটাই নিয়ম। বিপ্রের পন্থাও কুটিল, বৈশ্যের পন্থাও কূটবুদ্ধিতে ভর্তি। কিন্তু দু'য়ের পন্থায় তফাৎ হ'ল এই যে, আধ্যাত্মিক চেতনার লেশমাত্র না থাকায়, বৈশ্যের কূটবুদ্ধি অনেক সময়েই আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়ায়।

যার বৌদ্ধিক সামর্থ্য আছে সেই সামর্থ্যকে সে যদি শ্রেয়ের পথে না চালিয়ে প্রেয়ের পথে নিয়ে যায়-সৰটুকু বুদ্ধি যদি অন্যের প্রাণরস শোষণ করে নিজেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলার

কাজে লাগায় তবে সমাজে একটা মারাত্মক রকমের বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই এই মনোবৃত্তির অবসান না ঘটা পর্যন্ত বা অবস্থার চাপে এই মনোবৃত্তি অকেজো হয়ে না-পড়া পর্যন্ত সমাজের কল্যাণ নেই। কোনো রাষ্ট্রনেতাই বা কোনো রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থাই এই মূল রোগটাকে উপেক্ষা করে কল্যাণ-রাষ্ট্র বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। অন্যের প্রাণরসে নিজেকে স্ফীতোদর করবার ফিকিরেই যারা সৰ সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা যদি একটা পাপচক্র গড়ে নিয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে তবে সেই সমাজে একটা বীভৎস নরকের চিত্র ছাড়া আর কী দেখবার আশা করতে পারা যায়।

সমাজে যত প্রকারের অনাচার সংঘটিত হয়ে থাকে তার একটি বৃহৎ অংশ এই বৈশ্য-শোষণেরই সৃষ্টি। নিজের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়াবার জন্যে বৈশ্য অন্ন, বস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় পণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ও চোরা-বাজারে মুনাফা লোটে। যাদের ওই অগ্নি-মূল্যে অন্ন-বস্ত্র ক্রয় করার সামর্থ্য নেই, তারা জীবনের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি ও বিভিন্ন প্রকারের হীনপন্থার আশ্রয় নেয়। চোরা-ৰাজারী ও চোরাই পাচারকারী অর্থগৃধ্নুর

দালালের কাজ করে এই সকল অন্ন বস্ত্রহীন হতভাগার দল। ধরা যখন পড়ে তাদেরই শাস্তি হয়, ধনী বৈশ্য টাকার জোরে জাল কেটে পালিয়ে যায়। হতভাগ্য দরিদ্রের দল আরও মরিয়া হয়ে সমস্ত বিবেক- বুদ্ধি খুইয়ে পাপের পথে নেমে পড়ে। সমাজ নিন্দা করে এই সকল পাপীদের, আর এই পাপীর সর্দার ধনী বৈশ্যরা জননেতার ভূমিকায় অভিনয় করে- মালা পরে বক্তৃতার তুবড়ি ছোটায়, জনসাধারণকে আরও ত্যাগ করতে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানায়।

সমাজের একটা ঘৃণ্য ব্যাধি পতিতাবৃত্তিও এই বৈশ্যদেরই সৃষ্টি। অত্যধিক অর্থ তাদের অসংযমী ও দুশ্চরিত্র হতে প্রেরণা যোগায়, আর অন্যদিকে অর্থাভাব দরিদ্র হতভাগিনী নারীদের পাপের পথে নামতে প্রলুব্ধ করে। ভারতবর্ষে আইনের সাহায্যে এই পাপ-ব্যবসা বন্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রতিটি বিচারশীল লোকই জানেন আইনের সাহায্যে এই জিনিস ৰন্ধ হবার নয়। আগে যেসব হতভাগিনী নিষিদ্ধপল্লীতে থাকতো এখন আইনের ভয়ে তারা সেই সৰ পল্লী থেকে সরে গিয়ে ভদ্র পল্লীতে আস্তানা গাড়ছে অর্থাৎ আগে যে পাপ পল্লীবিশেষে সীমিত ছিল আজ তা' গৃহে গৃহে সংক্রামিত হচ্ছে। ভারতবর্ষকে যদি এই পাপ থেকে মুক্ত করতে হয় তবে বৈশ্য-সমাজ

ব্যবস্থার অবসান ঘটানো দরকার, কেননা শতকরা ৮০টি ক্ষেত্রেই এই পাপের কারণ অর্থনৈতিক অবিচার। অবশ্য যেখানে কুশিক্ষা বা হীনবৃত্তির ফলে মানুষ (পুরুষ বা নারী দুইই) এই পাপকে প্রশ্রয় দেয়, অর্থনৈতিক অবিচার দূর হ'বার পরও সে সকল ক্ষেত্রে এই পাপ থেকেই যাৰে। তাই এই ব্যাপারে কোন আইন না করে বৈশ্য-শোষণের অবসান ঘটাবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অন্যান্য অবিচারও দূর করতে হৰে ও এই সম্বন্ধে কোন প্রকারের আইনের দ্বারা নিষিদ্ধকরণ না করে সম্ভাবনার প্রচার করতে হবে। অবশ্য বৈশ্য-প্রধান সমাজ- ব্যবস্থার স্বভাবই এটা যে এতে অনেক ভাল ভাল আইন তৈরী করা হয় জনসাধারণের কাছ থেকে সস্তা তারিফ পাবার জন্যে, কিন্তু কোন প্রকারের আইন কঠোরভাবে বলবৎ করা হয় না। কারণ তা' করা হলে শোষণের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়।

বিপ্র ও বৈশ্য এদের কেউই প্রত্যক্ষভাবে সমাজের কোন সম্পদ গড়ে না, অন্যের গড়া সম্পদ এরা আহরণ করে। কিন্তু এই আহরণের মধ্যে যে প্রকারভেদ রয়েছে সেটাকে আকাশ-পাতাল বললেও কম বলা হয়। বিপ্র অন্যের মেহন্নতের ফসল বুদ্ধির জোরে দখল করে নেয় নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন

মেটাবার জন্যে–নিজের মান ইজ্জৎ বাঁচিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে, কিন্তু বৈশ্যের দৃষ্টিভঙ্গী তা' নয়। সে কেবল সম্পদ আহরণ করে সেই সঞ্চিত বস্তুর কথা ভেবে সুখ পেতে চায়, 'তাই কোটিপতি বৈশ্যও অনেক সময় জীবনযাত্রার সর্বনিম্ন প্রয়োজনকেও উপেক্ষা করে। টাকা গুণে ক্ষুধার কথা ভুলে থাকতে চায়, সঞ্চিত সম্পদের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রয়োজনকে তথা মনকে ভুলিয়ে রাখতে চায়, টাকার জন্যে অক্লেশে মান ইজ্জৎকে ৰেচে ফেলতে চায়। খোলা ৰাজারে যখন কোন বস্তু খুৰই সুলভ, ক্রেতার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে সে তাকে আহ্বান জানায়। বলে–"আইয়ে বড়ৰাৰু পান খাইয়ে।" আর সেই বস্তুই যখন চোরা বাজারে চলে যায় তখন ওই ৰড়ৰাবুকে সে চিনতেও পারে না অর্থাৎ বৈশ্যের কাছে টাকাই একমাত্র মূল্যবান বস্তু, টাকার কাছে তার নিজের মানও নেই, অন্যের মানও নেই।

কেবল সঞ্চয়ের বুদ্ধি নিয়ে যারা কাজ করে যায় দীর্ঘ দিন ধরে মানসদেহে তারা ওই একটি ভাবধারার সঞ্চালন করতে থাকায় তাদের বুদ্ধির বিকাশ ক্রমশঃ ওই পথেই ৰেড়ে যেতে থাকে অর্থাৎ কী করে আরও বেশী সঞ্চয় করব শেষপর্যন্ত এই ভাবনাটা ছাড়া আর কোন ভাবনাই থাকে না।

সামাজিক ভাবনা (social spirit) ও মানবতাবোধ ক্রমশঃ লুপ্ত হতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত তারা পুরোপুরি রক্তমোক্ষক মৎকুনে পরিণত হয়-মানবতার লেশমাত্র তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না।

বৈশ্য যুগের গোড়ার দিকে অর্থসঞ্চয়ী বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা সামাজিক ভাবনাও তাদের মধ্যে থাকে। জনসেবায়, দান-ধ্যানে কখনও কখনও, যে মতলবেই হোক, উপুড় হস্ত করে কিন্তু বৈশ্যযুগের শেষের দিকে সামাজিক চেতনার এই সামান্য লক্ষণটুকুও তারা হারিয়ে ফেলে ও তার ফলে নিজেদের হঠকারিতার জন্যেই তারা ডেকে আনে শূদ্র-বিপ্লব। বৈশ্যযুগের গোড়ার দিকে সমাজ-সেবা ও অর্থসঞ্চয় এই দুই কাজেই বৈশ্য তার অর্থকরী বুদ্ধি প্রয়োগ করে ও এজন্যে সমাজের অন্যান্য অংশের কাছ থেকে কিছু কিছু বুদ্ধি সে নেয়ও। কিন্তু বৈশ্য-প্রাধান্যের শেষের দিকে সঞ্চয়ের নেশায় সে মরিয়া হয়ে ওঠে। তখন আর সে কারও কথাই কাণে নিতে চায় না। তখন সে তার ষোল আনা অর্থকরী বুদ্ধিই প্রয়োগ করে সমাজকে শোষণের কাজে।

বিপ্রপ্রাধান্যের যুগে শারীরিক সামর্থ্য, সাহস ও বৌদ্ধিক শক্তি এই তিনেতে যারা হেরে যেত, তারা বেঁচে থাকবার জন্যে

তথা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে অন্য কোন পথ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করত। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার এই বিরামহীন সুদীর্ঘপ্রয়াস তাদের মানস দেহে যে বিশেষ ধরণের ভাব-সংঘাত জাগাতো সেই বিশেষ ধরণের ভাব সংঘাতের ফলেই দেখা দিত তাদের মধ্যে অর্থসঞ্চয়ী বুদ্ধির উৎকর্ষ। এই অর্থসঞ্চয়ী বুদ্ধির সাহায্যে সৰলের শক্তিকে, সাহসীর সাহসকে ও বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকে যারা যতবেশী কাজে লাগাতে পারে তারাই হয় তত বড় শ্রেষ্ঠী। এখানে মজার কথা হচ্ছে এই যে, অর্থ আছে কিন্তু সামাজিক প্রতিপত্তি নেই এই ধরণের অবস্থাটা এড়িয়ে চলবার জন্যে, এই ধরণের বৈশ্যেরা শোষিত বিপ্রদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠী, সাধু (সাহু, সাউ) প্রভৃতি সম্মানৰোধক উপাধিগুলো আদায় করে নিয়েছিল। এই শ্রেষ্ঠী বা সাধুদের আশ্রয়ে পরম নিশ্চিন্ত-মনে বিপ্রেরা পুরোহিতের কাজে আত্মনিয়োগ করত, নিজেরা কৃচ্ছসাধন করে পূজা-পাঠ করে, কাঞ্চনের বিনিময়ে পূজোর ফল শ্রেষ্ঠীর নামে সঙ্কল্প করতে লাগল। সাহসী ক্ষত্রিয় শস্ত্র-হাতে তার দ্বারপালের দায়িত্ব নিল ও দু'বেলা তাকে সেলাম ঠুকতে লাগলো; কেরাণী, হিসাব রক্ষক প্রভৃতি পদাধিকারী বিপ্ররা তথা মুটে-মজুর প্রভৃতি শূদ্ররা প্রত্যক্ষ সেবার মাধ্যমে তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে

লাগলো। এইটাই হ'ল পৃথিবীর সকল দেশের বৈশ্যপ্রধান যুগের একটি নিষ্পক্ষ চিত্র।

বৈশ্যের অর্থনৈতিক বুদ্ধিবাদের আশ্রয়ে থেকে যে সকল বিপ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বুদ্ধিও জেগে যায়, বৈশ্য-যুগের শেষের দিকে এই ধরণের নকল বৈশ্যদেরই সমাজে প্রাধান্য দেখা যায় অর্থাৎ এই ধরণের নকল বৈশ্যের বৈশ্যোচিত অর্থনৈতিক বুদ্ধির সঙ্গে বিপ্রের কূটবুদ্ধিও সংযুক্ত হয় কিন্তু বৈশ্য বা বিপ্রের অন্য কোন সদ্গুণ তাদের মধ্যে থাকে না। তাই বৈশ্য-প্রাধান্যের শেষের দিনটি পর্যন্ত তার ধারাবাহিকতা এরা টেনে নিয়ে গেলেও চরম গ্লানি ও হতমানতার মধ্যেই এদের পরিসমাপ্তি ঘটে। নিরঙ্কুশভাবে শোষণ চালাবার জন্যে এরা এদের অর্থনৈতিক বুদ্ধি ব্যতিরেকে বাকি বুদ্ধিগুলোও অর্থনৈতিক শোষণের কাজে লাগাবার জন্যে চেষ্টা করে ও তারা যেন তেন প্রকারেণ রাষ্ট্রশক্তিও করায়ত্ত করে নেয়। রাষ্ট্রশক্তিকে তখন তারা সম্পূর্ণভাবে একটি শোষণের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ও সমগ্র সমাজ সেই নিষ্ঠুর নিষ্পেষণযন্ত্রে পিষ্ট হ'তে থাকে। ভবিষ্যতে যোগ্যতার অভাবে বংশধরেরা যাতে অর্থাভাবে কষ্ট না পায় সেই ভয়ে তারা সমগ্র সমাজের ওপর শোষণ তো চালাতে থাকেই অধিকন্তু

একটা বিরাট পুঁজি সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে অকেজো করে রেখে দেয় বংশধরদের জন্যে। পুঁজির এই অব্যবহার অর্থনৈতিক শোষণের সবচেয়ে জঘন্যতম অবস্থা। যে সকল নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানুষ এইভাবে মরতে র গী হয় না তারা বিদ্রোহ করে। অসৎ বৈশ্যের প্রাধান্যের যুগেই তাই শূদ্র-বিপ্লব ঘটে থাকে।

ক্ষত্রিয়যুগের প্রাণীনতা বিপ্রযুগের বৌদ্ধিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, আর বিপ্রের বৌদ্ধিকতা বৈশ্যযুগে টাকার অঙ্কে ধরা পড়ে। বৈশ্য টাকার জোরে বিপ্রের বুদ্ধি কিনে নেয় ও সেই বুদ্ধির সাহায্যে রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামো সৰকিছুই গড়তে থাকে ও নিজের সুবিধামত কাজে লাগাতে থাকে।

তবুও পৃথিবীর কোন কিছুই অবিমিশ্রভাবে ভাল বা মন্দ নয়। বৈশ্যযুগ কি কেবল অর্থনৈতিক শোষণেরই যুগ? তাতে কি ভাল বলতে কোন কিছুই নেই বা ছিল না? অবশ্যই একথাটা ঠিক যে, সবসময়েই তার আর্থিক শোষণ তার সেবার মাত্রাকে ডিঙ্গিয়ে গেছে। তবুও সেবাও কিছু হয়েছে তা' সে যতই কম হোক না কেন, যতই তুচ্ছ হোক না কেন। বিপ্র যখন কোন বস্তু আহরণ করে (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে)

তখন সে সেই বস্তুটির কীভাবে ও কতখানি ব্যবহার হ'তে পারে, কীভাবে সেটা মানুষের ভোগে বা কল্যাণে ব্যবহার করা যেতে পারে সেকথা ভাবে। বৈশ্য কিন্তু বস্তু আহরণ করে, বস্তুকে কল্যাণের পথে লাগাবার কথা ভাবে না, ভাবে কী করে অবস্থার চাপে ফেলে মানুষকে ওই বস্তু কিনতে বাধ্য করা যায় ও তার বিনিময়ে অর্থোপার্জন করা যায়। একমাত্র টাকা রোজগার করা ছাড়া বস্তুর আর কোন বৈবহারিক মূল্য তার কাছে নেই। আর এই বুদ্ধিতে প্রেষিত হয়েই সে অতিরিক্ত মুনাফার লোভে অবৈধভাবে খাদ্যবস্তু মজুদ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের মুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত করে থাকে বা তাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়। এই ধরণের ঘটনা বিপ্রের কাছ থেকে আশা করা যায় না। বিপ্র নিজের সুযোগ সুবিধা ও প্রাধান্য বজায় রেখে ক্ষত্রিয়-শূদ্রকে তাদের বাঁচবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা কিছুতেই করে না, কিন্তু যদি কখনও বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা শূদ্রকে তার অর্থোপার্জনের পথে কন্টক বলে মনে করে সেক্ষেত্রে তাদের বাঁচবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তো করেই অধিকন্তু অতিলাভের লোভে অনেক সময়ে পরোক্ষভাবে তাদের হত্যাও করে।

এত বলার পরেও বলছি, পৃথিবীর কোন কিছুই অবিমিশ্রভাবে খারাপ বা ভাল নয়। ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত যে কোন প্রচেষ্টাই হোক না কেন তার গোড়ায় একটা পুঁজি থাকা দরকার, তা' সে টাকার অঙ্কেই থাক বা বস্তু হিসেবেই থাক। বৃহৎভাবে বা ব্যাপকভাবে পুঁজি কাজে লাগিয়ে শুধু বৈয়স্টিক জীবনেই নয়, সামূহিক জীবনেও সম্পদ সৃষ্টি করা যায় ও তা `হয়। রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক জীবনে যখনই সামূহিক জীবন-যাত্রার মান বাড়াবার চেষ্টা করা হয় তখনই পুঁজির প্রয়োজন-এই পুঁজি দেশের অভ্যন্তর থেকেই আসুক বা বাইরে থেকেই আসুক। পুঁজি যেভাবেই আসুক না কেন তার ওপরে সামগ্রিকভাবে না হোক আংশিকভাবে ব্যষ্টির নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। এই নিয়ন্ত্রক ব্যষ্টি অবশ্যই বৈশ্য। ক্ষেত্রাক্ষেত্র বিচার না করে পুঁজি মাত্রেরই ব্যবহার বা নিয়ন্ত্রণ সরকার, সমবায় বা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিলে পুঁজির অব্যবহার বা অপব্যবহার অনিবার্য। পুঁজিবাদী দেশগুলোর বৈষয়িক উন্নতি ত্বরিত গতিতে হওয়ার এটা একটা মুখ্য কারণ। তাছাড়া একটি বিরাট পুঁজি সামূহিক পরিচালনায় থাকলে পরিচালকদের সামান্য একটু ভুলের ফলে পুঁজির বড়রকমের অপব্যয় ঘটতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীর কোন কোন সমাজ-তান্ত্রিক দেশে যৌথখামার ব্যবস্থা বা কম্যূন ব্যবস্থা বিফল হওয়ার এটা একটা বড় কারণ। পুঁজির মালিকানাস্বত্ব ব্যষ্টির কাছ থেকে কেড়ে রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিলে অর্থাৎ জোর করে বৈশ্য-ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটালে ব্যষ্টিগতভাবে পরিচালকদের কারোর ওই সামূহিক পুঁজির ওপর ততটা ক্ষমতা থাকে না যতটা তাদের ব্যষ্টিগত পুঁজির ওপর থাকে। এখানে সামূহিক পুঁজি সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলার থেকে যায়, সেটা হ'ল সামূহিক পুঁজি মানেই সবসময় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নয়। সামূহিক পুঁজি বলতে যেখানে রাষ্ট্রের পুঁজিকে বোঝায় অথচ সমাজের শোষণের পথ ৰন্ধ করা হচ্ছে না, সেখানে রাষ্ট্র যদি রাষ্ট্রিক সম্পদ বাড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিটি ব্যষ্টির সম্পদ ৰাড়াবার চেষ্টা না করে সেখানে রাষ্ট্রিক সম্পদ বৃদ্ধির অর্থ হ'ল ক্ষমতাসীন কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যষ্টিরই সম্পদ বৃদ্ধি। এতে গড়ে মাথা-পিছু আয় বাড়লেও গরীবদের মাথা-পিছু আয় বাড়ে না বা ধনীদের মাথা-পিছু আয় কমে না। এই ধরণের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (state capitalism) সমর্থনযোগ্য না হলেও রাষ্ট্রিক সম্পদ বৃদ্ধির কাজে রাষ্ট্রকেও পুঁজির সাহায্য

নিতে হয় এটা তো ঠিক! এই state capitalism-ই যদি একচেটিয়াভাবে শোষকের ভূমিকায় না নেমে প্রতিটি মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ানোর কাজে লাগে তখন তাকে ভাল বলতেই হবে ও তা হবে একটি ভাল ধরণের সমাজতন্ত্র। মোটকথা তাকে পুঁজি নিয়োগ করতেই হবে যদি সে জাতীয় আয় বাড়াতে চায় ও এই পুঁজি-বিনিয়োগ করাটাই হ'ল একটা বৈশ্য-ব্যবস্থা।

বৈশ্যের প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল তার বিষয়বুদ্ধি। বিপ্রকে সে বৈষয়িক বুদ্ধিতে বা টাকার লড়াইয়েই হারায় নি, তাকে তার গোলাম স্তাবকে পরিণত করে তার বুদ্ধিকে নিজের বিষয় ও অর্থসঞ্চয়ের কাজে যন্ত্র হিসেবে লাগিয়েছিল। জীবন যাত্রায় যে জিনিসগুলো মানুষের কাছে অত্যাবশ্যক সেগুলোর উৎপাদন, সঞ্চয় ও বণ্টনের কাজগুলো বৈশ্যের মালিকানা বা আংশিক ভাবে তদারকিতে হলেও আসলে উৎপাদন, সঞ্চয় ও বণ্টন যাদের শ্রমে, পৌরুষে বা বুদ্ধিতে হচ্ছে তারা কেউই বৈশ্য নয়, জীবন যাত্রার প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে তারা নিজেদের শ্রম, পৌরুষ ও বুদ্ধি বৈশ্যের কাছে বাঁধা দিয়েছে। বৈশ্য ভাল ভাবে জানে এই বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তার শোষণ যন্ত্র অচল, তাই সে বড় বড় বুলির

আড়ালে পুঁজিবাদী শাসন কায়েম রাখার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়। শূদ্র-ক্ষত্রিয় সেই প্রক্রিয়ায় সহজেই গোলাম হয়ে পড়ে, আর বিপ্র সৰ জেনে বুঝেও পুঁজিবাদীর মাকড়সার জালে ধরা পড়া মাছির মত খানিকটা ছটফট করে শেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

বৈশ্য-দর্শনের এই মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া তখনই ব্যর্থ হয় যখন শোষণের চাপে বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের দল মন নামক বস্তুটিকে খুইয়ে বসে। তখন তারা হয়ে পড়ে বেপরোয়া। বিবেক-বুদ্ধি-বিচার-বর্জিত সেই সর্বমানসিকতামুক্ত বেপরোয়া অন্ধ জনতা একদিন নির্মমভাবে বৈশ্য কাঠামোটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। কেন তারা তা করল, কীভাবে তারা তা করল অথবা এই ভাঙ্গার পরে কীভাবে নূতন জিনিসকে গড়তে হবে এই ধরণের কোন বিচার বা কোন মানসিকতাই তখন তাদের মধ্যে কাজ করেনা। তারা তখন বাঁচবার তাগিদেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর ভাবে "বাঁচতে যদি না-ই পারি তবে জীবনের শেষের দিনটাকে আরও কাছে টেনে আনি"। এই অন্ধ-বিপ্লবের সময়ে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, শূদ্র-তিনের অবস্থা প্রায় একই ধরণের হয়ে যায়। তখন এদের কাছ থেকে মানবোচিত কোন কিছু আশা করা বৃথা।

বুদ্ধি শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে আর তাই বিপ্র নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষত্রিয় ও শূদ্রকে। কিন্তু "অন্নচিন্তা চমৎকারা," তাই বুদ্ধিমানও যখন অস্তিত্বরক্ষার জন্যে হাঁকুপাঁকু করতে থাকে তখন সে টাকার বিনিময়ে সহজেই নিজের বুদ্ধিকে বেচে' দেয়। বিপ্র বৈশ্যের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয় এই কারণে। সে শুধু নিজেকেই বিকোয়না, বুদ্ধির দ্বারা সে যে শূদ্র ও ক্ষত্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করত তাদেরও বৈশ্য প্রভুর শ্রীচরণে সমর্পণ করে দেয়। এই বিপ্রের সাহায্য না পেলে বৈশ্যের পক্ষে সোজাসুজি ক্ষত্রিয় ও শূদ্রকে খাটিয়ে নেওয়া রীতিমত কষ্টকর–প্রায় অসাধ্য। ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় দেখতে পাই যে বৈশ্য নিজের শোষণ–ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবার জন্যে যখনই সংগ্রাম করছে তখন আসলে সে সংগ্রাম করে না, সে কৰল টাকা ছড়ায়। আর সেই টাকা কুড়োতে কুড়োতে বিপ্র যুদ্ধ করে স্নায়ুর সাহায্যে, ক্ষত্রিয় পেশীর সাহায্যে আর শূদ্র মেহন্নতের সাহায্যে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অথবা অনুরূপ যে কোন প্রতিক্রিয়াশীল প্ররোচিত সংঘর্ষে তাই আমরা দেখতে পাই দাঙ্গা হাঙ্গামাগুলোর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে উভয় পক্ষের ধনশালী মাতব্বরেরা।

তারা কিন্তু নিজেরা কখনও বর্ণা-বল্লম-টাঙ্গি নিয়ে কাজিয়া লড়তে নামে না।

বুদ্ধির ওপর অর্থের এই যে প্রতিপত্তি, এই যে বৈশ্যের চরণে বিপ্রের দাসখত লেখা এটাও একদিনে হয়নি। একটু আগেই ৰলছিলুম মাকড়সার জালে পড়া মাছির মত বিপ্র কিছুটা বুঝবার চেষ্টা অবশ্যই করে থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জালে এমনই জড়িয়ে যায় ও তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে প্রাণশক্তি এমনই কমে আসে যে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। তখন মাথায় করাঘাত করতে করতে বৈশ্যের জয়গান গাইতেই হয়। দেখতে পাই অজস্র বিপ্রের বুদ্ধিমত্তা ও আদর্শনিষ্ঠা, অজস্র ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ ও পৌরুষ ও অজস্র শূদ্রের মেহন্নতে যে সকল গঠন-মূলক কাজ হয়েছিল বা ভাল জিনিস গড়ে উঠেছিল কেবল টাকার জোরেই বৈশ্যেরা সেগুলো দখল করে নিয়েছে বা নিচ্ছে। বিপ্র-ক্ষত্রিয়-শূদ্রের দল তাই অনেক সময় কোন সৎ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে অসৎ বৈশ্যের দ্বারস্থ হয়, কেবল টাকার জন্যেই ওই সকল অসৎ বৈশ্যের নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে বাধ্য হয়।

বৈশ্যের এই যে আর্থিক শোষণ এর ছলাকলা কিন্তু দেশ-পাত্রানুযায়ী পাল্টায় ও বিপ্র, ক্ষত্রিয় বা শূদ্রের তরফ থেকে

যখনই প্রতিবিপ্লব বা বিক্রান্তির সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই সে নিজের প্রতিষ্ঠা বাঁচাবার জন্যে নূতনতর ছলাকলার আশ্রয় নেয় ও যতদিন না শূদ্র বিপ্লব হচ্ছে ততদিন সে পরিচ্ছেদ-বিহীন ভাবে নূতনতর ছলাকলা আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় রত থাকে। যে সকল দেশে বর্তমানে বৈশ্যপ্রধান কাঠামো বেশ মজবুতভাবে রয়েছে সেখানে মনে রাখতে হবে কাঠামোর এই মজবুতি একদিনে আসেনি। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় বৈশ্য এটা গড়ে তুলেছে ও এটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সে সর্বপ্রকারে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এই অবস্থায় শুধু অনুনয় বিনয়ে তার মন গলবে, স্বেচ্ছায় সে কৌপীনধারী হবে এই আশা বাতুলতা মাত্র। তবে হ্যাঁ, কোন বৃহৎ আধ্যাত্মিক ভাবনায় ভাবিত হলে এমন জিনিসও সম্ভব হতে পারে। তবে তার জন্যে তো চাই দীর্ঘকাল নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে নৈতিকতাশ্রয়ী আধ্যাত্মিকতার প্রচার। জনসাধারণকে ততদিন ধরে শোষিত অবস্থায় থাকতে দেওয়া কতখানি সঙ্গত তা' বুদ্ধিমান ব্যষ্টি মাত্রেরই অবশ্য বিচার্য।

বৈশ্যেরা যে মধ্যে মধ্যে কিছু দান ধ্যান করে দেয় সেটাও বৈশ্য- কাঠামোকে জীইয়ে রাখারই একটা কৌশল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই সকল দান-ধ্যান মানবতার প্রেরণায়

করা হয় না, করা হয় নিজের শোষণযন্ত্রকে অর্থাৎ বিপ্র-শূদ্রকে জীইয়ে রাখবার জন্যে। কারণ তারা যদি মরেই গেল তবে শোষণ আর কাকে করা হবে! এই ধরণের দান-ধ্যানকে ধড়িবাজ বৈশ্যের দল কতকটা যেন দাদন হিসেবে দেখে।

বিপদে আপদে, বন্যায় দুর্ভিক্ষে তারা যে হতভাগ্য মানুষগুলোকে সাহায্য করে পরে সেই দামই তারা সুদে আসলে নিজের ঘরে টেনে আনে। বৈশ্যের এটা সৰদিক দিয়েই লাভ। প্রথমতঃ ব্যবসাটা চালু রইল ও ভালরকম অর্থাগম হ'ল, আর দ্বিতীয়তঃ বৈশ্য-শোষণ সম্বন্ধে জনমানসের বিক্ষোভও কিছুটা শান্ত হ'ল, তাদের মনের ক্ষতে সাময়িক প্রলেপ লাগল। অবশ্য মানবিক বা আধ্যাত্মিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে যে সকল বৈশ্য জনসেবায় নেমে আসে আমার এই উক্তি তাদের জন্যে নয়। তেমন সৎ বৈশ্যও কিছু কিছু আছেন, তাঁরা সকলেরই নমস্য।

ক্ষত্রিয়যুগে বা বিপ্রযুগে মানুষ হিসেবে একটা মানুষের যতটুকু বা যেটুকু মর্যাদা থাকে বৈশ্যযুগে সেই মর্যাদার ওপর আসে চরম আঘাত। বৈশ্যযুগে মানুষের মর্যাদা টাকার অঙ্কে নিরূপিত হয়। মানুষের এই ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়নের প্রভাব কেবল মর্যাদার ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর ফল হয়ে দাঁড়ায় সুদূরপ্রসারী। নিজস্ব মতবাদ, মর্যাদাৰোধ বা

স্বাতন্ত্র্যবোধ যার আছে, সহস্র যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সেই বিপ্র বা ক্ষত্রিয় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, যদি না সে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বৈশ্যের স্তাবকতা করতে শেখে। ধনীর অযোগ্য পুত্র বা আত্মীয় সমাজের শীর্ষস্থানে বসবার সুযোগ পেয়ে যায়, ধনীর কুরূপা কন্যাও টাকার জোরে বেশ ভালভাবে পাত্রস্থা হয়, আর দরিদ্রের কন্যার কথা দূরে থাক, বুদ্ধিমান শিক্ষিত পুত্রও যদি কাঞ্চন কৌলিন্য লাভ না করে তাহলে, তার পাত্রী জোটা ভার হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ বৈশ্যযুগে বিত্তবান ব্যতিরেকে বাকি কেউই সম্মানের আশা করতে পারে না। যারা আশা করে বা পেয়েছে তাদের বৈশ্য কৃপার ওপরেই নির্ভর করতে হয় বা হয়েছে। "যস্যাস্তি বিত্তং সঃ নরঃ কুলিনঃ স পণ্ডিতঃ স শ্রুতবাণ গুণজ্ঞঃ স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ। সর্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি"।

সামাজিক শোষণের প্রশ্নে বিপ্র ও বৈশ্যযুগের ধরণ-ধারণে খানিকটা মিল আছে। তাই সমাজ-ব্যবস্থায় সামাজিক আইনে বা নারী-পুরুষের মর্যাদা নির্ধারণের প্রশ্নে বা দায়াধিকার ব্যবস্থায় বৈশ্যযুগ মোটামুটি বিচারে বিপ্রযুগেরই অনুসরণ করে।

প্রাচীনকালে যে সকল মহাপুরুষেরা বিপ্রযুগের কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন তাঁদের যেমন অকথ্য সামাজিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়েছে বৈশ্যযুগের কাঠামোও ভেঙ্গে তাকে মানবোচিত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার চেষ্টা যাঁরা করেছেন বা করছেন তাঁদের ক্লেশভোগও সেই তুলনায় কিছু কম নয় বরং তুলনামূলক বিচারে কিছু হয়তো বেশীই, কারণ বিপ্রের কাঠামো যারা ভাঙ্গতে চেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল বিপ্র আর বিপ্র শরণাগত ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের দল, কিন্তু যারা বৈশ্য-কাঠামোর ওপর আঘাত হানতে চায় তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় বৈশ্যানুগত বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র তিনই। এখানেও সেই একই ব্যাপার অর্থাৎ যাদের ভালোর জন্যেই এই মহান ব্যষ্টিরা কাজে নামেন তারা তাঁদের বুঝতে পারে না অথবা বুঝেও সমর্থন করে না। কারণ বৈশ্যর টাকায় তাদের স্নায়ুকোষ, সাহস ও মেহন্নত ৰাঁধা পড়ে গেছে। ধর্মের নামে যে ভড়ং চলে তাকে কেন্দ্র করে বিপ্র জনসাধারণকে শোষণ করে বিপ্রযুগে ও বৈশ্যযুগেও। বরং বৈশ্যযুগে এই শোষণটা আরও বেশী মারাত্মক এই কারণে যে বিপ্রযুগে বিপ্র ধর্মীয় শোষণ করে কেবল নিজের স্বার্থে কিন্তু

বৈশ্যযুগে বিপ্র ধর্মীয় শোষণ করে নিজের তথা বৈশ্যের দু'য়ের স্বার্থে।

বৈশ্যযুগের এই ধর্মীয় শোষণটা স্থূল ভূমির চেয়ে মানস ভূমিতেই বেশী হয়ে থাকে। কারণ বৈশ্য-কাঠামোর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে যে একটা চাপা ক্ষোভ থাকে সেটার কোন দার্শনিক সমর্থন যাতে মানুষ না পায় তজ্জন্য বিপ্রের মাধ্যমে বৈশ্য একটা ৰৌদ্ধিক প্রচার জনসাধারণের মধ্যে করতে চায়। এই ৰৌদ্ধিক প্রচার মূলতঃ মানুষকে অবস্থার দাসে পরিণত হতে প্ররোচনা দেয়। "সবই বিধিলিপি," "সব কিছুই পূর্বনির্দিষ্ট" এই ধরণের মতবাদ বৈশ্য কাঠামোর ধারক, বাহক ও সহায়ক। এই মতবাদ মানুষের পৌরুষকে নষ্ট করে দিয়ে তাকে ভাগ্যের ক্রীড়নকে তৈরী করে দেয়। সবকিছুই কপালের লিখন ৰলে মেনে নিয়ে সে স্থিতাবস্থার সমর্থক হয়ে পড়ে।

বৈশ্যযুগের কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়ে যারা নিপীড়িত মানুষকে ত্রাণের পথ দেখাতে চান তাদের পক্ষে তাই মানুষকে ধর্মমতের (রিলিজনের) আফিমের নেশা থেকে মুক্ত থাকবার পরামর্শ দিতেই হবে, অন্যথায় তারা নিপীড়িত মানুষের সেবা কী করে করবেন। মহাত্মা কার্ল মার্কসের ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর শোষকেরা খুৰ হল্লা

করে থাকেন। মনে রাখা উচিত কার্ল মার্কস্ আধ্যাত্মিকতার, নৈতিকতার বা সদাচারের বিরোধী ছিলেন না। তিনি যে কথা বলেছিলেন সেটা তাঁর সময়ে প্রচলিত ধর্মমতের (রিলিজনের) বিরুদ্ধে। কারণ তিনি দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন, অনুভব করেছিলেন যে সেকালের প্রচলিত ধর্মমত বা রিলিজন মানুষকে মানসিক বিচারে পঙ্গু করে দিয়েছে, পাপ-চক্রের কাছে আত্মসমর্পণের প্ররোচনা দিয়ে তাদের নির্বীর্য করে দিয়েছে।

(মানুষের সমাজ, ২য় খণ্ড)

ষষ্ঠ খণ্ড

সূচীপত্র

শূদ্রবিপ্লব ও সদ্বিপ্র-সমাজ

বৈশ্য শোষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হ'ল শূদ্র-বিপ্লব। বৈশ্য যখন অতিলোভে মত্ত হয়ে কাণ্ডজ্ঞান সম্পূর্ণ খুইয়ে বসে, মানবিকতাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে দেয়, শূদ্র-বিপ্লবের পক্ষে সেটাই হয় উপযুক্ত সময়। কিন্তু শূদ্র-বিপ্লবের উপযুক্ত সময় এলেই যে শূদ্র-বিপ্লব হবে একথা বলা চলে না, এর জন্যে পাত্রিক, দৈশিক অবস্থাগুলোও অনেকটা দায়ী থাকে। যেখানে অর্থনৈতিক বিচারে সমাজে থাকে দু'টো জাত-শোষক বৈশ্য ও শোষিত শূদ্র, বিপ্লবটা সে সময়েই হয় বটে, কিন্তু যদি মানসিকতার বিচারে বিপ্র ও ক্ষত্রিয় না থাকে অর্থাৎ আর্থিক বিচারে শূদ্র কিন্তু মানসিকতার বিচারে ক্ষত্রিয় বা বিপ্র না থাকে তা'হলে এই শূদ্র-বিপ্লব সম্ভবপর হয় না। মানসিকতার বিচারে যারা শূদ্র, বিপ্লব আনা তাদের কর্ম নয়-তারা সংগ্রাম- বিমুখ, তারা বৈশ্যের ক্রীড়নক। বৈশ্যযুগের চরমাবস্থায় বৈশ্যেরা এইসৰ শূদ্র মনোভাবাপন্ন শূদ্রদের অনায়াসেই নিজের মুঠোয় রেখে দেয়। এমন কি ক্ষত্রিয় বা

বিপ্র মনোভাবাপন্ন শূদ্ররাও যদি যথেষ্ট তেজস্বী না হয় তবে বৈশ্যের টাকায় বিকিয়ে যায়। তাই শেষ পর্যন্ত শূদ্র-বিপ্লবের জন্যে নির্ভর করতে হয় সেই সকল শূদ্রের ওপর যারা যথেষ্ট তেজস্বী ও মানসিকতার বিচারে বিপ্র বা ক্ষত্রিয়। মানসিকতার বিচার না করে যাঁরা কেবল শ্রমজীবীদের সাহায্যে প্রলেটারিয়েটের বিপ্লব ঘটাতে চান তাঁরা ব্যর্থ হবেন। যারা শূদ্র- মানসিকতার মানুষ তারা নিজেদের সমস্যা ৰোঝে না, সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন দেখার সাহসও তাদের নেই। শ্রমিক নেতারা তাদি'কে তাদের সমস্যার কথা যত ভালভাবেই বোঝান না কেন বা সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যতই ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দেন না কেন তাদের মনে এসবের কোনই প্রভাব পড়বে না। তারা পেট ভ'রে মদ তাড়ি গিলে নরক গুলজার করে দিন কাটিয়ে দেবে-পরিবারের কে অভুক্ত রয়েছে বা কে শিক্ষা পাচ্ছে না সে সৰ ভাববার অবকাশ তাদের নেই। মালিকেরা তাদের মজুরি বাড়ালে তাদের নেশার খরচাই বাড়ে, জীবন যাত্রার মান উন্নত হয় না। তাই বলছিলুম এরা শূদ্র-বিপ্লব আনে না, আনতে পারে না। বিপ্লব যাঁরা চান তাঁদের পক্ষে এদের ওপর নির্ভর করা শুধু অবাঞ্ছিতই নয়-মূঢ়তা, কারণ তাদের জড়তা এদের গতিকে

ৰাধা দিতে পারে–এদের ভীরুতা বিপ্লবের অগ্নিকে অকালে নিবিয়ে দিতে পারে।

ঠিক এই ধরণের মানসিকতা ব্যতিরেকেও অনেক সময়ে দেশগত বা ধর্মগত ঐতিহ্যও বিপ্লব আনার কাজে বাধা দেবে, এই ধরণের ঐতিহ্যের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা শূদ্র-মানসিকতাসম্পন্ন শূদ্রের কথা তো ছেড়েই দিলুম, বিপ্র বা ক্ষাত্র–মনোভাবাপন্ন শূদ্রের পক্ষেও রীতিমত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। "যা কপালে আছে তাই হৰে, আরে ভাই লড়াই–ঝগড়া করে কাজের কাজ কিছু হৰে কি? ওসব ঝামেলায় গিয়ে লাভ কী, কোনোরকমে দিন তো কেটে যাচ্ছে," অথবা গীতা বা অন্য কোন শাস্ত্রের নিষ্কাম কর্মবাদের ভুল ব্যাখ্যাও মানুষকে বিপ্লব-বিমুখ করে দেয়। বস্তুতঃ সূক্ষ্ম বিচারে দেখতে গেলে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে নীতি, গান্ধীবাদের যে আদর্শ বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের যে গালভরা বুলি–এরা সকলেই বিপ্লবের পথে বড় বাধা। ভূদান আন্দোলনও এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন। গান্ধীবাদ বা ভূদান আন্দোলনের বক্তাদের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে, মানুষ হিসেৰে তাঁরা অতুলনীয় কিন্তু তাঁদের দর্শন দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে রীতিমত ক্ষতিকর। জন্মান্তরবাদের কোন

কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা বিপ্লবের পরিপন্থী অর্থাৎ “পূর্বজন্মে পাপ করেছ, এজন্মে তাই খেতে পাচ্ছ না, বৃথা আন্দোলনে লাভ কী? বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।"

হ্যাঁ, তাই ৰলছিলুম, জনগণের বিপ্লব ঘটাৰে বিপ্র ও ক্ষাত্রৰুদ্ধিসম্পন্ন শূদ্ররা ও এজন্যে এই ধরণের শূদ্রদের যথেষ্ট কাঠ খড় পোড়াতে হবে, যথেষ্ট কষ্ট করতে হৰে, যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে; বুলি আওড়ানো বা বড় বড় কথা কপচানো খুবই সোজা, 'তাতে সহজেই শ্রোতাদের তাক লাগানো যায়, হাততালিও পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত বিপ্লব ঘটানো মোটেই সহজ জিনিস নয়। যারা বিপ্লবের অগ্রদূত সেই ক্ষাত্র-বুদ্ধি বা বিপ্রৰুদ্ধি শূদ্রকে শৃঙ্খলা শিখতে হবে, যথোপযুক্ত ভাবে বিপ্লবের পাঠ নিতে হৰে, চরিত্র গড়তে হবে, নীতিবাদী হতে হৰে অর্থাৎ এক কথায় আমি যাদের সদ্বিপ্র ৰলি তা' হতে হবে। যাকে পছন্দ করি না সে যদি সৎ ব্যষ্টি হয়, সদ্বিপ্র তার বিরুদ্ধে আন্দোলন কবৰে না, যাকে পছন্দ করি সে যদি অসৎ ব্যষ্টি হয় সদ্বিপ্র অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। এই ব্যাপারে কোন প্রকারের মানসিক দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। যারা এই ধরণের কঠোর আদর্শনিষ্ঠ সদ্বিপ্র তারাই হবে বিপ্লবের বার্তাবহ। ধরিত্রীর প্রতিটি

গৃহকোণে মানব অস্তিত্বের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় বিপ্লবের বাণী এরাই পৌঁছে দেৰে। বিপ্লবের বিজয়-কেতন থাকৰে শুধু এদেরই হাতে।

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে নীতিবাদী বা ধার্মিক সকলের মধ্যেই থাকতে পারে। ধনী মানেই সৎ-একথাটা যে একেবারেই মিথ্যা তা' সকলেই জানে। তবে সদ্বিপ্রকে আমরা পাৰো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই। এই মধ্যবিত্ত সমাজ ৰলতে আমি বুঝি বিপ্রৰুদ্ধি অথবা ক্ষাত্রবুদ্ধিসম্পন্ন শূদ্রকে। বলা যেতে পারে যে সকল ধনী নীতিবাদী ও ধার্মিক তারা কি সন্দ্বিপ্র হ'তে পারে না? এর উত্তরে বলবো-পারে, কিন্তু পারতে গেলে তাকে মধ্যবিত্তের স্তরে নেবে আসতে হবে, কারণ পাপের ধনের পুঁজি নিয়ে পায়ের ওপর পা রেখে বসে বসে সে খাবে না। প্রাউটের নিয়ম মানতে গেলে তাকে পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই হবে, আর এই 'সংগ্রাম ঠিকভাবে করতে গেলে সে আর ধনী থাকবে না-হয়ে যাবে মধ্যবিত্ত। সন্দ্বিপ্র শব্দটার ব্যাখ্যাই হচ্ছে যে, যে ব্যষ্টি নীতিবাদী ও ধার্মিক আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে-সে। পাপ-পথে ধনোপার্জন অথবা অধিক ধন-সঞ্চয় প্রাউটের মূলনীতি-বিরোধী। প্রাউটের এই মূলনীতিকে মেনে না চললে শূদ্র- বিপ্লব ঘটানো কিছুতেই

সম্ভব হবে না। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে দরিদ্র সে কি সদ্বিপ্র হতে পারে না? এর জৰাৰে ৰলৰ- হতে পারে, তবে যে সব দরিদ্র ক্ষাত্র-বিপ্রবৃদ্ধি সম্পন্ন তারাই বিপ্লব আনৰে, আর সেই সকল দরিদ্রকেই আমি বলি মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্তের এইটেই আমার ব্যাখ্যা। যাদের মতে মধ্যবিত্ত মানে যারা গায়ে-গতরে খাটে না, যারা মাথার কাজ করে আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। অথবা যাঁরা বলেন যাদের আয় খুব কমও নয় আবার বেশীও নয় তারাই মধ্যবিত্ত, আমি তাদের সঙ্গেও একমত নই। মধ্যবিত্তের শেষোক্ত ব্যাখ্যা নিতে গেলে আমি দেখছি যাদের আয়ের চেয়ে গায়ে-গতরে খাটা শূদ্রবুদ্ধি সম্পন্ন শূদ্রের আয় অনেক বেশী। মধ্যবিত্ত শব্দটাতেই যদি কারও আপত্তি থাকে অথবা কেউ যদি ৰলেন মধ্যবিত্ত মানেই হ'ল বিত্ত অধিকও নয়, অল্পও নয়-অতএব বিপ্লবের অগ্রদূত ক্ষাত্রবুদ্ধি বা বিপ্রবৃদ্ধি সম্পন্ন শূদ্ররা মধ্যবিত্ত হতেও পারে, নাও হ'তে পারে। সেক্ষেত্রে আমি এই ধরণের বিপ্লবী শূদ্রদের জন্যে মধ্যবিত্ত শব্দটির পরিবর্তে বিক্ষুব্ধ শব্দটি ব্যবহার করতে রাজী আছি। এই বিক্ষুব্ধ শূদ্র-সমাজ অত্যাচারী বৈশ্যের চক্ষুশূল। শ্রমিক-বিক্ষোভকে আসলে পুঁজিপতিরা ভয় পায় না-এরা ভয় পায় শ্রমিক-নেতা এই সকল বিক্ষুব্ধ শূদ্রকে।

শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেৰে পুঁজিবাদীদের দল গণতন্ত্রকে পছন্দই করে – কারণ এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় টাকার জোরে তারা সহজেই শূদ্রৰুদ্ধিসম্পন্ন শূদ্রদের কিনে নেয়। মাথাগুণতিতে এই শূদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন শূদ্ররাই সৰচেয়ে বেশী। নির্বাচনের সময়ে এদের সামনে কিছু গালভরা বড় বড় বুলি শুণিয়ে দিয়ে সহজেই নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়া যায় ও তারপরে সেই গালভরা বুলি বা প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই, কারণ শূদ্রৰুদ্ধিসম্পন্ন শূদ্রেরা সহজেই ওই প্রতিশ্রুতিগুলোর কথা ভুলে যায়। এই কথা জোর করেই ৰলা যেতে পারে, যে কোন দেশেই যদি প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই বোটাধিকারের পরিবর্তে কেবলমাত্র শিক্ষিতগণকে বোটাধিকার দেওয়া হ'ত তাহলে পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশেরই রাষ্ট্রিক কাঠামো পাল্টে যেত। বোটাধিকার কেবলমাত্র যদি সদ্বিপ্রদের হাতেই থাকতো তা'হলে বাস্তবের দুনিয়ায় আর কল্পনার স্বর্গে কোনো পার্থক্যই থাকতো না।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বা গণতান্ত্রিক কাঠামোতে মধ্যবিত্তদের (বিক্ষুব্ধ শূদ্র) অবস্থা অধিকাংশ দেশেই শোচনীয়। তার কারণটাও এই যে এরাই ধনতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সমালোচক ও ধনতান্ত্রিক শোষণের সবচেয়ে বড়

বিরোধী। কোন সমাজে এই বিক্ষুব্ধ শূদ্রদের সংখ্যবৃদ্ধি সম্ভাব্য শূদ্রবিপ্লবেরই পূর্ব লক্ষণ। তাই যাঁরা একটা শোষণ-মুক্ত পৃথিবী চান তাঁদের কর্তব্য এই বিক্ষুব্ধ শূদ্রের সংখ্যা বাড়ানোর কাজে সাহায্য করা। এঁরা মরে যাওয়া বা এঁদের শূদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন শূদ্রে রূপান্তরিত হওয়া বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর। বেকার সমস্যা, জন্ম-শাসন ও বিভিন্ন ধরণের কুরীতি বা কুনীতির ফলে যাতে এই বিক্ষুব্ধ শূদ্রের সংখ্যা হ্রাস না পায় সেজন্যে পৃথিবীর সমস্ত সদ্বিপ্রেরই সতর্ক থাকা উচিত।

বিপ্লব মানে একটা বড় পরিবর্তন। এই পরিবর্তন আসতে গেলে বা আনতে গেলে খুনোখুনি বা রক্তারক্তি যে হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। তবে বিক্ষুব্ধ শূদ্রদের মধ্যে যেখানে ক্ষাত্র-মনোভাবাপন্নদের সংখ্যা বেশী বা প্রভাব বেশী সেখানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমেই এই বিপ্লব এসে থাকে, তবে বিনা রক্তপাতে ও বৌদ্ধিক সংঘর্ষের মাধ্যমে বিপ্লব আসতে পারে না এমন কথা জোর করে বলা চলে না। কিন্তু সেটা সম্ভব হতে পারে যদি বিক্ষুব্ধ শূদ্রদের মধ্যে বিপ্র-মনোভাবাপন্নদের সংখ্যা বা প্রভাব অত্যন্ত বেশী হয়। তবে এই দ্বিতীয়োক্ত জিনিসটা আমরা বড় একটা আশা করতে পারি না ও তাই বলতে হয় জনগণের মুক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্তস্নাত। কেউ

কেউ বলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁরা সমাজবাদ বা সাম্যবাদ বা জনগণের মুক্তি আনতে সক্ষম। মোটামুটি বিচারে কল্যাণ-রাষ্ট্রের মূলনীতিও এই-ই। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আরও কয়েকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজবাদের দিকে এগিয়ে চলেছে, এই কথাটা তাঁরা প্রায়ই ৰলে থাকেন। আমি বলি এভাবে কুর্মগতিতে এগিয়ে চলার কি কোন মানে হয়? গণতন্ত্রের কাঠামো থেকে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীতে ব্রিটেনের জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য যে গতিতে আনতে পেরেছে, গণতন্ত্রের বাইরে থেকে অনেক দেশ তার চেয়ে বেশী গতিতে জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য এনে চলেছে। এখানে গতিটাই বড় কথা।

যে সকল দেশ পূর্বে বিভিন্ন উপনিবেশকে শোষণ করত তারা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে যে গতিতে জনগণের কল্যাণ করেছে, তারা যদি গণতান্ত্রিক কাঠামোর বাইরে থেকে শূদ্র-বিপ্লবের পথ বেছে নিয়ে সমাজ কল্যাণ করতে চাইতো তা'হলে উপনিবেশকে শোষণ না করেও বেশী গতিতে এগিয়ে যেত। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জনগণের উন্নতি হয় অত্যন্ত মৃদু গতিতে। তাই একে বিপ্লৰ বলতে পারিনে-বলৰ ক্রান্তি (evolution)- ৰলৰ ক্রমপরিবর্তন। কোন অনুন্নত দেশ যদি বিপ্লবের পথ না ধরে এই মৃদু পরিবর্তনের পথকে বেছে

নেয় বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের বা কল্যাণরাষ্ট্র পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো জেনেও উপেক্ষা করে, তার জনগণের কল্যাণ আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

গণতান্ত্রিক কাঠামোতে বোট-প্রাপ্তির জন্যে চোর-ছ্যাঁচড় ও বিভিন্ন ধরণের সমাজবিরোধী ব্যষ্টির সাহায্য নিতে হয়। এই সমাজবিরোধী ব্যষ্টিরা নিশ্চয়ই নিঃস্বার্থভাবে কোন প্রার্থীকে সমর্থন করে না। তারা আশা করে এই সকল প্রার্থী যখন মন্ত্রী হয়ে বসৰে তখন তারা নিশ্চয়ই সমর্থকদের সমাজবিরোধী আচরণগুলো উপেক্ষার চোখে দেখৰে।

সমাজতন্ত্র যতগুলো মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সমবায় সংস্থা। সৎ নাগরিকের ওপর রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব না এলে পরে সমবায় সংস্থা দাঁড়াতে পারে না। আবার ঠিক তেমনি সমবায় সংস্থাগুলোর ভার সৎ নাগরিকদের হাতে না এলে পরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও দাঁড়াতে পারে না। তাই জনগণের একটা অতি বিরাট অংশের নৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাগত মান খুবই উচ্চ স্তরের না হলে (সাধারণ অথবা মোটামুটি উচ্চ স্তরের হলেও কাজ চলবে না) প্রতিনিধি, মন্ত্রী অথবা সমবায় সংস্থার পরিচালক হিসেবে যোগ্য ব্যষ্টিকে পাবার আশা আমরা করতে পারি না।

সমবায় প্রতিষ্ঠানের অসাধু পরিচালকেরা টাকা চুরি করবে, আর অসাধু মন্ত্রীরা পরোক্ষভাবে তা সমর্থন করবে অথবা দুর্বল ব্যষ্টিরা মন্ত্রিত্ব হারাবার ভয়ে বা ভবিষ্যতে বোট-সংগ্রহের আশায় তা' দেখেও দেখবে না। এই ধরণের ঘটনা চলতে থাকলে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে না। কোর্ট-কাছারি সেক্রেটারিয়েট থেকে দুর্নীতি দূর হবে না ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে না। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যে সু-উচ্চ নৈতিকতা প্রয়োজন তা অসম্ভব না হ'লেও পাওয়া দুষ্কর। তাই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র থিয়োরীর দিক দিয়ে দেখতে গেলে মন্দ না হলেও বাস্তবের পৃথিবীতে কোনদিন সম্ভব হবে বলে আশা করতে পারি না।

শূদ্র-বিপ্লবে যারা নেতৃত্ব নেয় সেই বিক্ষুব্ধ শূদ্রেরা ক্ষাত্রবুদ্ধি বা বিপ্রবৃদ্ধি যাই হোক না কেন, সাহসে ও পৌরুষে ও জীবনে ঝুঁকি নেবার মনোবলে ক্ষাত্রগুণসম্পন্ন। শূদ্রবিপ্লবের পরে সমাজের নেতৃত্ব এই বিক্ষুব্ধ শূদ্রদের হাতেই আসে ও তখন ক্ষাত্রোচিত গুণগুলো আরও প্রকটভাবে এদের মধ্যে ফুটে ওঠে। বিপ্লবোত্তর যুগে এদের আর বিক্ষুব্ধ শূদ্র বলা চলে না, তখন এরা হয়ে দাঁড়ায় সমাজচক্রের দ্বিতীয় পরিক্রমার ক্ষত্রিয়। এই ক্ষত্রিয় যাতে পরবর্তীকালে শোষণের ভূমিকায়

নামতে না পারে সেদিকে যাঁরা নজর রাখেন সেই ধার্মিক নীতিবাদী সংগ্রামী মানুষেরাই সন্দ্বিপ্র। ক্ষত্রিয়রা যদি শোষণের ভূমিকায় নামে তবে সদ্বিপ্ররা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে ও দ্বিতীয় পরিক্রমায় বিপ্রযুগের প্রতিষ্ঠা করবে। তারপরে বিপ্ররা যদি শোষণের ভূমিকায় নামে তখন এরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দ্বিতীয় পরিক্রমায় বৈশ্যযুগের সূচনা করবে। তার পরে সেই বৈশ্যেরা যদি শোষণের ভূমিকায় নামে বা নামতে চায় তখন বিক্ষুব্ধ শূদ্রগণকে প্রেরণা দিয়ে এই সন্দ্বিপ্ররা শূদ্র-বিপ্লব ঘটাৰে দ্বিতীয়বার।

সমাজচক্র ঘুরেই চলবে। এর পরিঘূর্ণন কেউ ৰন্ধ করতে পারবে না। বিপ্লবোত্তর ক্ষাত্রযুগকে যদি বলি শ্লেষণ (thesis), তবে সেই ক্ষত্রিয়েরা যখন শোষণের ভূমিকায় নামতে চাইৰে তখন তার বিরুদ্ধে সন্দ্বিপ্র যে ব্যবস্থা নেৰে সেটাকে ৰলৰ প্রতিশ্লেষণ (anti-thesis)। আর এই সংগ্রামের পরিণামে যে বিপ্লবোত্তর বিপ্রযুগের সূচনা হৰে তাকে ৰলৰ সংশ্লেষণ (synthesis)। পরবর্তীকালে এই বিপ্রেরা শোষণের ভূমিকায় নামতে চাইলে এর বিরুদ্ধে সদ্বিপ্র যে ব্যবস্থা অবলম্বন করৰে সেটা হৰে anti-thesis। তাই সে সময়ে আর ক্ষাত্রোত্তর

বিপ্রযুগকে synthesis না বলে তাকে পরবর্তী ধাপের thesis ৰলৰ।

সমাজচক্রের পরিঘূর্ণন কেউই ৰন্ধ করতে পারে না, সদ্-বিপ্রেরাও পারে না। সন্দ্বিপ্ররা সমাজচক্রের চক্রনাভিতে অধিষ্ঠিত থেকে ঘূর্ণন ক্রিয়ার ওপরে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলবে। ক্ষত্রিয়ের পর বিপ্র, বিপ্রের পর বৈশ্য- একের পর একটা যুগ আসতেই থাকৰে। সদ্বিপ তা' আটকাতে পারবে না, তবে বিপ্লবোত্তর ক্ষাত্রযুগের প্রতিষ্ঠার পরে তার সতর্ক দৃষ্টি থাকবে যেন ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিভূ হিসেবে কেবলমাত্র শাসনই করে যায়-শোষণের ভূমিকায় নামতে না পারে। সে শোষণের ভূমিকায় নামবার উপক্রম করলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্লেষণ সৃষ্টি করে ক্ষাত্রযুগের অবসান সে ঘটাৰে। অনুরূপ ব্যবহার সে বিপ্রযুগে ও বৈশ্যযুগ সম্বন্ধেও করৰে-অর্থাৎ সন্দ্বিপ্র স্বাভাবিক ক্রান্তির পথে সমাজকে ভাসিয়ে না দিয়ে প্রয়োজন মত সমাজ-বিপ্লবের ব্যবস্থা করবে। তাই সদ্বিপ্র কখনও বিশ্রাম পাৰে না। কোন সদ্বিপ্লের জীবনে কখনও এমন দিন আসবে না যে দিন সে আরাম কেদারায় হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে বলৰে, আঃ! আজ আর কাজ নেই, আজ একটু ভাল করে বিশ্রাম নিই।

এই পৃথিবীতে মানবেতিহাসের প্রথম পরিক্রমায় এখন পর্যন্ত সদ্বিপ্রসমাজ গড়ে উঠতে পারেনি। অধিকাংশ দেশে প্রথম পরিক্রমার শেষ অংশ চলছে, অল্প কয়েকটি দেশে শূদ্রবিপ্লবোত্তর ক্ষাত্রযুগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কোথাও কোথাও বিপ্রযুগের সম্ভাবনা উঁকি ঝুঁকি মারছে। সদ্বিপ্র-সমাজ না থাকায় সমাজচক্র স্বাভাবিকভাবেই ঘুরে চলেছে, প্রতিটি যুগে প্রধান বর্ণের শাসনের পরে শোষণ আসছে, তারপর ক্রান্তি বা বিপ্লব আসছে। সদ্বিপ্রের সহযোগিতা না পাওয়ায় মানব সমাজের বুনিয়াদ মজবুত হতে পারছে না। আজ প্রতিটি যুক্তিনিষ্ঠ ধার্মিক নীতিবাদী সংগ্রামী মানুষের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে একটি সুষ্ঠু সদ্বিপ্রসমাজ গড়ে তোলেন.। এই সদ্বিপ্রদের কাজ করতে হৰে সর্বদেশের জন্যে, সকল মানুষের সর্বাত্মক মুক্তির জন্যে, লাঞ্ছিত পৃথিবীর ভূলুণ্ঠিত মানবতা তাঁদের আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে পূর্ব আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তাঁদের সামনে থেকে অমানিশার অন্ধতমিস্রা কেটে যাক, নতুন সূর্যোদয়ে নূতন দিনের মানুষ নূতন পৃথিবীতে জেগে উঠুক। এই শুভকামনা নিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(মানুষের সমাজ, ২য় খণ্ড)

সূচীপত্র

সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বাত্মক জয়লাভের ইচ্ছা মানুষের মধ্যে আদিম ও অনন্ত। প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয়–জীবনের সকল ক্ষেত্রে ছোট হয়ে বাঁচাটা মানুষের পক্ষে অভাবনীয়। অনন্তকাল ধরে প্রকৃতির আজ্ঞাবহ ভৃত্য হিসেৰে ৰাঁধাধরা পথে চলার ধারণা কোনদিনই তার মনঃপুত নয়। তবে সে যে অনেক সময় প্রকৃতির নিয়মমাফিক চলে, জানতে হবে, সেটা নিতান্তই অবস্থার চাপে পড়ে। আর সেটা হচ্ছে তার পর্যাপ্ত পরিমাণ বুদ্ধি বা Intellect ও Stamina-র অভাব। তার সর্ব সাধনা হচ্ছে কেবল এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলোকে দূর করার প্রচেষ্টার নামান্তর মাত্র। মনোজগতের অপূর্ণতা দূর করার জন্যে তাই সে অহরহই আদর্শগত সংঘর্ষকে অভ্যর্থনা জানায় ও জন্ম দেয় নোতুন নোতুন জীবনদর্শনের। এইভাবেই মানবসমাজে সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চরম আত্মবিকাশের এক মহান যুক্তিসঙ্গত আদর্শ।

সূচীপত্র

আবার মানসিক অপূর্ণতা দূর করার জন্যেই কিন্তু তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় না। যেহেতু তাকে টিকে থাকতে হয় আপাতঃ-প্রতিকূল স্থূল জগতে, তাই স্বাভাবিকবাবেই দৈহিক ক্ষেত্রেও তাকে সাধনা করে যেতে হচ্ছে। তমোগুণী প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়েই উদ্ভব হয়েছে Science বা ভৌতিক বিজ্ঞানের। সংস্কৃত শব্দ "বিজ্ঞান" আর ইংরেজী শব্দ Science কিন্তু একার্থবোধক নয়। কারণ সংস্কৃতে বিজ্ঞান বলতে ব্রহ্মবিজ্ঞান বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানকেই বোঝায়।

আজ একদল লোক অভিযোগ তুলছে-বিজ্ঞান নাকি সৰ অনর্থের মূল। নিত্য-নোতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানব-সমাজে নিত্যই-বিসংবাদ সৃষ্টি করছে। এইভাবে তা' সমস্ত মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। তাই আজ এঁদের মতটাকে খোলা মন নিয়ে, যথেষ্ট অধ্যবসায় ও সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখে নেওয়া দরকার।

স্থূল ভৌতিক জগতের সংগ্রামে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখলে মানুষ তৎক্ষণাৎ সংগ্রামের উদ্দেশ্যে নোতুন অস্ত্রশস্ত্রের প্রস্তুতির আয়োজন শুরু করে দেয়। আর ভৌতিক বিজ্ঞানের কাজ

হ'ল–নিতি নিতি ফরমূলা বের করে প্রস্তুতির কাজে সহায়তা করা। যদি কোনদিন দৈহিক সংঘর্ষ না চলত, তাহলে মানবমনের সৃষ্টি বা বিবর্তন কোনদিনই সম্ভব হ'ত না। আজকের সূক্ষ্ম মানব–মনীষার আবির্ভাব সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থেকে যেতো। এটা সকল জীবের মধ্যেই হয়ে চলেছে ও তা থেকে সকল জীবই নিজ নিজ মানসিক প্রবণতা ও শক্তি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অনুবর্তন করে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাদুড়দের বাসা নির্মাণ, উইয়ের চলা–পথ তৈরী, মাকড়সার জাল বোনা– এ সবই জীবের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

আজ তোমরা এতগুলো লোক যে এই ক্ষণটিতে গোরক্ষপুরে জড়ো হয়েছ, এখন জিজ্ঞাসা করি–যদি আজ কোন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি না হ'ত তাহলে সুদূর প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে সকলের পক্ষে হেঁটে আসা সম্ভব হ'ত কি? দৈহিক তথা মানসিক অসুবিধাগুলো দূর করার জন্যেই কোন এক বিশেষ যুগের মানুষ গো–গাড়ীর উদ্ভাবন ও প্রচলন করেছিলেন। কিছুদিন পর আবার অধিকতর দ্রুতগামী অশ্বযানের প্রচলন শুরু হ'ল। পরবর্তীকালে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদারও পরিবর্তন হতে লাগল। তাই বিভিন্ন যুগে বিভিন্নতর

যানবাহন–মোটর–গাড়ী, এরোপ্লেন ও সাম্প্রতিক কালে রকেট আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর কোনটাই নিন্দনীয় নয়, এগুলো শুধুমাত্র যুগের সন্ধিক্ষণে পরিবর্তিত মানসিক চাহিদা পূরণ করার বিভিন্ন মাধ্যম মাত্র।

আমরা জানি, গুড়কে প্রাকৃতিক প্রভাববশতঃ স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘদিন রাখা যায় না। অধিকন্তু গুড়ের স্বাদ অনেকের পছন্দও নয়। এই দুই কারণে মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গুড় থেকে চীনী তৈরী করেছে। এর থেকে কি কেউ বলবেন সে, চীনীর আবিষ্কার মানব–প্রগতির অন্তরায়? এক্ষেত্রে যদি কেউ গুড়কে চীনী অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর মনে করেন, সেক্ষেত্রে চীনীর সঙ্গে ওই সমস্ত পুষ্টিবর্ধক উপাদানগুলো সংযুক্ত করাটাই কি অধিকতর বিজ্ঞান–বুদ্ধিসম্মত হবে না? তা, সেক্ষেত্রে গুড়ের পক্ষে প্রপাগাণ্ডা চালানোটা যুক্তিসঙ্গত হবে?

কিছু লোককে সৰ সময়ে সম্ভাব্য সকল প্রকারেই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নিষ্ফল সমালোচনা করতে দেখা যায়। অবশ্য এই ধরণের সমালোচনা তাদের কাছ থেকেই আসে যারা জীবনীশক্তি ও সামর্থ্য হারিয়ে নোতুনের সঙ্গে রফা করতে অক্ষম হয় ও যারা দৈহিক অক্ষমতা–নিৰন্ধন ওটাকে একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবেই মেনে নিয়েছে।

অতীতের সংবেগ মানুষকে অতি সহজে নোতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বাধা দেয়। এইজন্যে কিছু মানুষ জেনে-বুঝেও বৈজ্ঞানিক অবদানকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে। যতদিন না নোতুন নোতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার সঙ্গে তাদের মানসিক সমান্তরালতা সংরক্ষিত হচ্ছে, ততদিন তারা সেই সমস্ত বস্তুর বিরুদ্ধেই বিষোদ্গার করে, যা থেকে তারা অনেক সময় ৰাধ্য হয়ে সুবিধাজনক সেবা আদায় করে থাকে। এইজন্যে দেখা যায়, যারা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কঠোর সমালোচক ও অপর দিকে আদিম চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারাও সর্বাধুনিক "এ্যালোপ্যাথি"-সম্মত ব্যাণ্ডেজ ব্যবহারে কোনই আপত্তি তোলেন না। এমন কি খাদি বস্ত্রের একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ, গুড়-দর্শনের প্রচারকগণ ও গো-যানের সমর্থকেরাও মিল-জাত বস্ত্র পরিধান করে, চীনী-মেশানো চা পান করে বা এরোপ্লেনে চড়ে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সভায় গরম গরম বক্তৃতা দিতে যায়।

কিন্তু অল্পদিন পরে যখন তারা বিজ্ঞানের প্রয়োগ বা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তারা সেই সমস্ত বস্তুর বিরুদ্ধে সমালোচনা বা ঘৃণা প্রকাশ করা ৰন্ধ করে দেয় ও যে সমস্ত বস্তু তারা বাধ্য হয়ে ব্যবহার করত, এখন সেগুলোর

ব্যবহার তাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে; কারণ পুরাতন বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা বা স্বল্পতা হেতু তারা ক্রমেই নোতুন দ্রব্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়।

এ থেকে বলা যেতে পারে যে যারা বিজ্ঞানের সমালোচনা করে, তারা প্রকৃত প্রস্তাবে গঙ্গার ধারাপ্রবাহকে উল্টোদিকে অর্থাৎ গঙ্গোত্তরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়–যা হচ্ছে সম্পূর্ণতই গতিধর্ম বিরোধী। এই ধরণের প্রচেষ্টা ঋণাত্মক মানসিকতার পরিচয় দেয়। সমস্ত জগৎটাকে উল্টো–পাল্টা করলেও সেই প্রাচীন ঋষির তপোবনের যুগ আর ফিরবে না; সাধারণ মানুষ কখনও মিলের কাপড় ত্যাগ করে গাছের বাকল পরবে না কিংবা রাঁধা খাবার ফেলে রেখে কাঁচামাংস খেয়ে দিনাতিপাত করবে না। চীনীর যুগকে বাদ দিয়ে গুড়ের যুগে ফিরে যাওয়ার মধ্যে কোন মহত্ত্ব থাকতে পারে না। হতে পারে, যারা কদাপি চীনীর স্বাদ জীবনে উপলব্ধি করে নি, তারা স্বচ্ছন্দে গুড়ের যুগে থাকতে ভালবাসবে কিন্তু যে একদিন চীনীর সংস্পর্শে এসেছে, সে ভুলেও গুড়কে চরম স্বীকৃতি দেবে না। এটা হওয়ার কারণ, ক্রমে ক্রমে চীনী–মেশানো চায়ের সঙ্গেই যে তাদের সম্বন্ধটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য

এই ধরণের গুড়-চীনীর বিতর্কে ঢোকা অর্থহীন, কারণ গুড়ও তো একদিন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

স্থূল ভৌতিকজগতের সংঘর্ষ সুপ্ত মানবশক্তিকে ক্রমেই প্রস্ফুট করে তোলে। পরিবেশগত প্রভাবও মানবদেহে জটিলতার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। প্রাচীন ও আধুনিক মানুষের সমস্যাবলী কোনক্রমেই এক ধরণের নয়। সমস্যার পরিবর্তনের গতিধারার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে মানবদেহ ও মন ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠেছে। প্রাচীন মানুষের দৈহিক কাঠামো আজকের সমস্যা সমাধানের পক্ষে অবশ্যই অনুপযুক্ত ছিল।

মনের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ স্থান স্নায়ুকোষগুলো ও পরোক্ষ স্থান গ্রন্থিগুলোর মধ্যে অনুরূপ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে চলেছে। সমস্যার পরিবর্তনের জন্যে মানুষের মনও নোতুন নোতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয়ে রয়েছে। এ থেকেই আমি বলতে ৰাধ্য হচ্ছি যে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনকে ক্রমেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হৰে ও তা' কোনদিনই মানবপ্রগতির পরিপন্থী হয়ে উঠবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের সমালোচকদের অধিকাংশই কেবল ভাবাবেগের মাথায় এই সহজ সত্যটা স্বীকার করতে চায় না;

তারা জানে না যে তারা তাদের অতীতের প্রতি অন্ধপ্রীতি দিয়ে তাদের মানসসত্তার গতিধারাকে স্থূলত্বের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে! এ দিয়ে তারা মনকে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলছে ও গতিশীলতা হারিয়ে ফেলছে। আর যারা জীবনে চলার ছন্দকে হারিয়ে ফেলেছে, তাদি'কে তমসাচ্ছন্ন, স্কুল জড় বলাই অধিকতর সমীচীন হৰে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনকে সর্বদাই বিভিন্ন প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে ব্যাপৃত থাকতেই হবে। এই সমস্ত নোতুন দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম হবার জন্যে মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে চলেছে। এর সঙ্গে দৈহিক গ্রন্থিগুলোর কাঠামোও পরিবর্তিত হচ্ছে। এতে করে' শুধু যে মানুষের দেহ ও মনের সংরচনা জটিলতর হচ্ছে তা নয়, মানুষের সমগ্র সমাজেও সেই জটিলতা এসে পড়েছে। বিভিন্ন সমস্যাও উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় আমরা কি শুধু অতীত গরিমার মহিমা কীর্তন করেই আত্মতৃপ্ত হয়ে চুপ্ করে বসে থাকবো? না–তা না করে আমাদের উচিত, যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দ্বারা ওই সৰ সমস্যার যথার্থ সমাধান বের করা? কথায় বলে, যেমন তরবারি তেমনই তার আধার। এজন্যে যত জটিল

সমস্যা আছে, ততই জটিল বৈজ্ঞানিক উপকরণের উদ্ভাবন করতে হবে। আমরা আদিম তীর ধনুক দিয়ে আধুনিক যুগের মহাশক্তিশালী আণবিক বোমার সম্মুখীন হয়ে নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ হতে চাই না।

মানবদেহের অভ্যন্তরে জটিলতা যতই বাড়ছে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণও ততই বেড়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এমনও ঘটতে পারে যে এই দেহটাকে গোরক্ষপুরের কোন এক জায়গায় রেখে দিয়ে কেবল মস্তিষ্কটাকে লণ্ডনে পাঠানো যাবে। সেক্ষেত্রে দেহের ভারটাকে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন থাকবে না। এটা রূপকথার মত শুণতে লাগলেও নিশ্চিতই একইরকম ঘটতে চলেছে, যখন লোকে তাদের অঙ্গগুলো ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে নিরাপদে নিদ্রাসুখ উপভোগ করতে পারবে।

বর্ণচক্র বা শ্রেণীচক্র ক্রমাগত বিবর্তিত হয়েই চলবে। অর্থাৎ শ্রেণী- সংগ্রাম চলার সঙ্গে সঙ্গে কোন বিশেষ যুগে কোন বিশেষ গোষ্ঠী প্রাধান্য বিস্তার করবে। এখন বিজ্ঞান যদি পুরোপুরি তমোগুণী মানুষের আয়ত্তে থাকে তাহলে তার ফলও হৰে নৈরাশ্যজনক। সেক্ষেত্রে আশার কথা এই যে, যদি ক্রমাগত কদর্য শ্রেণীসংগ্রাম চলতে থাকে তো শেষ অবধি

মানুষ বুঝবে যে একমাত্র সদ্বিপ্র ব্যতিরেকে আর কেউই সমাজের নেতা হতে পারে না। যাঁরা যম-নিয়মাদি নীতিগুলোকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেন, তাঁদেরই ৰলৰ সন্দ্বিপ্র। এঁদের সামূহিক প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবপ্রগতি তথা শান্তিপ্রতিষ্ঠার পূর্ণ সম্ভাবনা। গণতন্ত্রও মানুষের সমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়, কারণ গণতন্ত্রের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক প্রাধান্য বিস্তারের চরম সুযোগ পায়, অন্যদিকে আরেক দলের স্বাধীনতা বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়। যেহেতু গণতন্ত্রে কোন নীতিকেই চূড়ান্ত ৰলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, তাই সহসা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা, হীনতা, অনৈতিকতা ইত্যাদি অবাধে শিকড় গাড়বার সুযোগ পায়। অধিকন্তু, আপেক্ষিক সত্যগুলোকে নীতি হিসেবে পুনঃ পুনঃ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে গণতন্ত্রের বর্ণ ও আকার পরিবর্তিত হয়ে থাকে। শ্রেণীহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠা একমাত্র তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা পরমপুরুষকে নিজের জীবনের লক্ষ্য করে নিয়েছেন ও যাঁদেৰ সমগ্র মানস-শক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে সেই একই লক্ষ্যের দিকে প্রলম্বিত বা প্রযুক্ত হয়ে থাকে। শ্রেণী-সংগ্রামহীন সমাজে বাকি সকল শ্রেণীকে বিলীন হতেই হৰে ও সমস্ত মানুষগুলোকে একই আদর্শের আঙ্গিনায় এসে সমবেত হতে হবে। একমাত্র

সদ্বিপ্রদের দ্বারাই এটা সম্ভব হতে পারে ও এজন্যেই বিশ্বের কল্যাণার্থে সদ্বিপ্রদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

গণতন্ত্রের আওতায় এই ধরণের আদর্শের প্রতিষ্ঠা মোটেই সম্ভব নয়, কেন না সেখানে বোট পাবার জন্যে চোর, ডাকাত তথা নানান ধরণের সমাজ-বিরোধী মানুষের দ্বারস্থ হতে হয়। জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির ধুয়া তুলে সমর্থ ও যোগ্য প্রার্থীদের পরাজিত করা হয় আর যারা রাজনীতি, শাসন পরিচালনা, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, নীতি ইত্যাদি বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ, তারাই প্রতিনিধিদের ভাগ্য নির্ধারণ করার দায়িত্ব পেয়ে থাকে। সদ্বিপ্রের দ্বারা বিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলনের ফলে ব্যষ্টিগত তথা সামাজিক বহু সমস্যার সুন্দর সমাধান হতে পারে। পৃথিবীর সকল দেশেই আজও কমবেশী যে ভূমি-সমস্যা রয়েছে, বিজ্ঞান অনেকাংশে তার একটা সহজ সমাধান করে দিতে সক্ষম। খাদ্য-সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা কম থাকলেই ভূমির গুরুত্ব তথা মূল্য আপনিই কমে যাবে। মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে একটা বটিকাই যথেষ্ট হতে পারে। বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে এই ধরণের অনেক পরিমাণ বটিকা উৎপাদন ধনী-দরিদ্রের ভেদও অনেক ঘুচিয়ে দেৰে, কারণ পাকস্থলীর জ্বালা দূর করার জন্যেই গরীবেরা বাধ্য

হয়ে ধনীর দাসত্ব স্বীকার করে ও এভাবেই তার অধিকতর ধনাগমের সুযোগ করে দেয়। অবশ্য এরকমের সূক্ষ্ম খাদ্য উৎপত্তির আগে থেকেই বিজ্ঞান নানান উপায়ে খাদ্য-সমস্যার সমাধানে সহায়তা করছে। জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে, তার তুলনায় জমির পরিমাণ বাড়ছে না। এই সীমিত ভূ-ভাগ নিয়েই লোকেরা বিজ্ঞানের সহায়তায় উন্নত ধরণের সার, শস্যবীজ, জলসেচ-ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ৰাড়িয়ে নিচ্ছে। তাহলেই দেখছি, মানব- প্রগতির পক্ষে বিজ্ঞান অত্যাবশ্যক, নতুবা পৃথিবীর অর্ধেক মানুষকে আজ অনাহারে শুকিয়ে মরতে হ'ত।

আমরা জানি, চিকিৎসা-বিজ্ঞান অতীতেও মানুষকে প্রচুর সাহায্য করেছে, বর্তমানেও করছে ও অনুরূপভাবে ভবিষ্যতেও করবে। উন্নত ঔষধ ও শল্যচিকিৎসা মানুষকে দীর্ঘায়ু করার জন্যে অতীতে ও বর্তমানে সমানভাবে সহায়তা করেছে ও করছে। মানুষ যদি দেহের পুরানো গ্রন্থিকে বাদ দিয়ে নোতুন গ্রন্থি সংযোজিত করতে পারে তো চাই কি-মানুষ বার্ধক্য ও মৃত্যুকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ তাও সাফল্যের সঙ্গে করেছে ও করছে। জীবদেহের মৃত্যু ঘটে তার দেহস্থিত গ্রন্থিগুলো পুরানো ও দুর্বল হয়ে পড়ে

বলে। কাজেই এগুলোকে পাল্টানোর ফলে মৃত্যুকেও পিছু হঠতে হয়।

অবশ্য, জীবৎকালটাকে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ করে বা সাময়িকভাবে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখে মানুষ কিন্তু অমর হবে না। কারণ তার আরও একটা জিনিস রয়েছে–মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ক থেকেই মানুষের "আমি আছি", "আমি করছি" ইত্যাদি মানসিক ভাবগুলো উদ্ভুত হয়ে থাকে। প্রাচীনতা তথা ক্রমাগত ব্যবহারের দরুণ মস্তিষ্কের মধ্যে অবক্ষয়–নিৰন্ধন বিকৃতি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। যদি এই মস্তিষ্কটাকে পালটিয়ে ফেলা হয়, সেক্ষেত্রে মানুষের পুরো ব্যষ্টিত্বটাই পরিবর্তিত হয়ে অন্য রূপ নেবে। তখন কিন্তু পূর্বের মানুষটার মৃত্যু হয়ে নোতুন মানুষের জন্ম হয়েছে– এই রকম মনে করতে হবে। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা, মানবদেহে গ্রন্থিগত পরিবর্তন ঘটানো যায়। ফলতঃ অসৎকেও সৎ মানুষে পরিণত করা যায়। কিন্তু এর দ্বারা মানুষের পূর্বার্জিত সংস্কারের কোন পরিবর্তন সাধন হবে না। অবশ্য এতে জীবের প্রত্যয়মূলক কর্মের ধারাটাকে বদলানো যেতে পারে কিন্তু সংস্কারমূলক কর্মের ধারাকে রোধ করা যাবে না। মস্তিষ্ক মনের আধার, আর মন হচ্ছে সংস্কারগুলোর অধিষ্ঠানস্থল। এখন মস্তিষ্কের

পরিবর্তনের ফলে মন তার সমস্ত সংস্কার সমেত নোতুন একটা আশ্রয় নেৰে ও সেক্ষেত্রে সেটা হৰে সম্পূর্ণ নোতুন একটা সত্তা। বিজ্ঞানের বলে মানুষের মস্তিষ্কটাকে বদলে দিয়ে যদি বানরের মস্তিষ্ক সংযুক্ত করা হয়, তাহলে সেই পূর্বেকার মানব-দেহটার মালিক এখন থেকে আর সে নয়। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, সে মোটেই মানুষ নয় আর তার গ্রন্থিগুলো থেকে রসক্ষরণও বানরদেহের গ্রন্থির রসক্ষরণের অনুরূপই হচ্ছে। ঠিক এইভাবেই পুরুষকে স্ত্রীতে ও স্ত্রীলোককে পুরুষে পরিণত করা আদৌ অসম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, শক্তিশালী মানসিক ভাবগ্রহণের মাধ্যমে গ্রন্থির রসক্ষরণেও পরিবর্তন আনা যেতে পারে। ফলে পুরুষ নারীতে ও নারী পুরুষে রূপান্তরিত হতে পারে। আর গ্রন্থিগুলোর আংশিক পরিবর্তনের দ্বারা পুরুষের পক্ষে গর্ভধারণ করা অসম্ভব হবে না। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের সংস্কারকে কদাপি পরিবর্তিত করতে পারে না। কাজেই মানুষের পক্ষে ব্যষ্টিত্ব-বিকাশের জন্যে আধ্যাত্মিক সাধনা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মানব-প্রগতির জন্যেই আমরা বিজ্ঞানচর্চাকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু এই বিজ্ঞান-চর্চা অবশ্যই সন্দ্বিপ্রদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এমন একদিন আসৰে যখন মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার থেকেই মানবশিশুর জন্ম দেবে। শুধু তাই নয় সেখান থেকেই শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের উদ্ভব হবে। তখন ধীরে ধীরে মানুষ সন্তান-জননশক্তি হারিয়ে ফেলৰে কিন্তু তার সর্জন-ধর্মী আবেগ কোনদিনই মন থেকে নষ্ট হবে না। যেহেতু মূল স্রষ্টা সগুণ-ব্রহ্মের মধ্যে সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সেই হেতু তাঁতেই বিধৃত সমস্ত মানুষের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ থাকা সম্ভব। সেই শুভদিনে মানুষ কামময় কোষের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সূক্ষ্মত্বের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তার সৃষ্টির ইচ্ছাকে চরিতার্থ করবে। সেদিনের মানুষগুলো সুন্দরতর সমাজ তৈরী করে মহান্ সাহিত্য, অধিকতর প্রগতিশীল শিল্প-কলার জন্ম দেবে।

আমার ব্যষ্টিগত মত এই যে, আণবিক ৰোমা কখনও মানব সভ্যতাকে পরিপূর্ণ ধ্বংস করতে পারে না; কারণ মানুষ বুদ্ধির দিক থেকে এখনও সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যায় নি। মানব-মনে বিদ্যা-অবিদ্যার সংগ্রাম এখন বেশ সুন্দরভাবে চলছে। সেইজন্যে আমি এই পরিষ্কার সিদ্ধান্তে না পৌঁছে পারি না যে, অতি অদূর ভবিষ্যতে মানুষ আণবিক ৰোমা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করৰেই ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের

যে মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে একটা মহান ভূমিকা রয়েছে তারও প্রতিষ্ঠা হবে।

দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকতাবাদ ও গণতন্ত্র

সমাজের অগ্রগতি ত্রয়ীর সমন্বয়–থীসিস, এ্যান্টিথীসিস ও সিনথীসিস। যখন কোন বিশেষ তত্ত্ব সমাজের কল্যাণ–সাধনে অসমর্থ হয়, তখন ওই প্রচলিত তত্ত্বের বিরুদ্ধে এ্যান্টিথীসিস তৈরী হয় ও এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির পারস্পরিক সংঘর্ষ ও সংসক্তির (cohesion) ফলে আসে এক লব্ধি (resultant)। এই লব্ধি বা ফলকে বলা হয় সংশ্লেষণ (synthesis)। সমাজ–কল্যাণ সংশ্লেষণের অবস্থাতেই সম্ভব–এটা কি সত্য?

কল্যাণকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব ও কর্তব্য যাদের ওপর আরোপিত হয়েছে, তারা যদি সংখ্যালঘু কিংবা সাধারণ মানুষের প্রতি অবহেলা দেখায়, তাহলে এক যুগের

যেটা সিনথীসিস, পরবর্তী অধ্যায়ে তা থীসিসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সামাজিক সুবিচারের প্রশ্ন ওঠার কারণ হ'ল–এই বিশ্ব গতিশীল, এ যেন এক চলন্ত দৃশ্যপট। এই প্রায়োগিক (emperical) জগতের সব কিছুই আপেক্ষিকতায় সন্নিবিষ্ট। দেশ, কাল ও পাত্রের কক্ষপথে সব কিছুই ঘুরে চলেছে।

সংশ্লেষণাত্মক অবস্থায় কোন বিশেষ এক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশেষ যুগের, বিশেষ দেশের ও বিশেষ ব্যষ্টির কাছে কল্যাণকর ও অনুকূল হতে পারে, কিন্তু দেশ–কাল–পাত্রের পরিবর্তন ঘটলে সেই তত্ত্বই যে আশিস বর্ষণ করবে তা বলা যায় না। সেই পরিস্থিতিতে সামাজিক অবিচারের শিকার হয়ে যে সমস্ত নির্যাতিত ও অবদমিত মানুষ হতাশাক্লিষ্ট ও ক্ষুব্ধ অন্তরে দিন কাটাচ্ছে তারাই সেই যুগের সিনথীসিস– এর বিরুদ্ধে এ্যান্টিথীসিস খাড়া করবে। এ্যান্টিথীসিসের উদ্ভবের জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও দৈহিক শক্তিই একমাত্র প্রাক্–প্রয়োজনীয়তা নয়। যদি নির্যাতিতের দল বৌদ্ধিকতা–সম্পন্ন হয়, তাহলে সংখ্যায় তারা যত অল্পই হোক না কেন, তারা এ্যান্টিথীসিস খাড়া করতে পারে। এ্যান্টিথীসিস তৈরী হয়ে গেলেই পূর্বের মতবাদ আর সিনথীসিস থাকবে না। সেটা পরবর্তী ধাপে থীসিস–এ পরিণত

হৰে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই থীসিস-এর বিরুদ্ধে এ্যান্টিথীসিস তৈরী হবে। এই অধ্যায়ে যতক্ষণ না সিনথীসিস আসছে ততক্ষণ সংঘর্ষ প্রবহমান থাকৰে। তাত্ত্বিক বিচারে সংশ্লেষণ চরম নয় ও সর্বশেষ সংঘর্ষও সৰকিছু নয়, কেন না এটাও তো আপেক্ষিকতায় সংঘটিত হয়ে চলেছে।

প্রাউটের*

** এটি রচয়িতা কর্তৃক উদ্ভাবিত এক নোতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদ।*

মতে (Pro-Progressive, U-Utilisation, T- Theory) চক্রাকারে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কোন এক যুগে মেহনতী জনতাই সর্বেসর্বা ছিল। তখন মানুষের সমাজও ছিল না, সভ্যতাও ছিল না। এমন কি পরিবারের ধারণাও একরকম ছিল না বললেই হয়। একে শূদ্রযুগ বলা যেতে পারে আর এই শূদ্রযুগের পর এসেছিল ক্ষাত্রযুগ অর্থাৎ যোদ্ধাদের যুগ; যখন যোদ্ধারা বা 'হারকিউলিয়ান'-রা বিপ্র-শ্রেণীকে (intellectuals) খোলাখুলি অপমান করে অবহেলা করে ও তাদের সেন্টিমেন্টে আঘাত হানে, তখন বিপ্রের দল ক্ষাত্রযুগের থীসিস-এর ওপর প্রতিশোধ ও শাস্তিকামনায় এ্যান্টিথীসিস খাড়া করে। **সংঘর্ষ ও সংসক্তির** ফলে সমাজ চক্রে দিগ্বলয়ে দেখা দেয় বিপ্রযুগের উষাকাল!

কিন্তু শোষণ ও কষ্টের কাহিনী শেষ হয় না। যখন বিপ্রের দল বুর্জোয়াশ্রেণীর ওপর অত্যাচার করে, আঘাত হানে তখন অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্রযুগের বিরুদ্ধে ক্রুসেড় আরম্ভ করে। এই ভাবে বিপ্রযুগের থীসিস-এর বিরুদ্ধে আবার এ্যান্টিথীসিস খাড়া হয়ে যায়। যখন সেদিনের বিক্ষুব্ধ দল শোষণ, মুনাফাৰাজী ও কালোবাজারী শুরু করে ও অপরের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে বাঁচতে চায়, তখন শোষিত, নিষ্পিষ্ট ও বিদ্রোহী মানুষ বুর্জোয়াশ্রেণীর ধ্বংসের দাবিতে রক্তাক্ত বিপ্লব শুরু করে। মানব-ইতিহাসে সমাজচক্রের এই প্রবাহ চিরন্তন। 'প্রাউটের' মতে সমাজচক্রের এই পরিক্রমা কোনদিনই রুদ্ধ হবে না বা থেমে যাবে না। সদ্বিপ্ররা দল প্রচলিত বর্বরতা, অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মনোবৃত্তিকে উৎসাহিত করে তুলবে ও এই সংগ্রামের গতিকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে। তারপর সিনথীসিস-এর অবস্থায় তারা নিজেদের হাতে সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি (adjustment) রাখতে সন্দ্বিপ্র-প্রবর্তিত এই সংশ্লেষণাত্মক যুগ চিরস্থায়ী হতে পারে। সমাজ এই সমস্ত সদ্বিপ্লের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হৰে। সমাজের

সংশ্লেষণাত্মক কাঠামো বর্তমান থাকবে, যদিও বিভিন্ন যুগ আসবে, যাবে।

শূদ্রযুগ আসৰে, কিন্তু শূদ্রের দ্বারা কোন শোষণ হবে না। ক্ষাত্রযুগ আসবে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের শোষণ চলবে না, কেননা সমাজের মধ্যে সংশ্লেষণাত্মক অবস্থা (synthetic order) বর্তমান থাকছে।

দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্গে এই ধরণের সামঞ্জস্য বজায় রাখা কেবলমাত্র সদ্বিপ্রের দ্বারাই সম্ভব। যারা জড়বাদী দর্শন প্রচার করে কিন্তু নীতিপরায়ণ ও আধ্যাত্মিক চৈতন্য-সম্পন্ন নয়, তারা এই সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না; কেননা, সমস্ত পরিবর্তন আপেক্ষিকতার মধ্যে সংঘটিত হয়। যাঁদের মধ্যে ভূমার লক্ষ্য ও ভূমাভাব চরম ও পরমরূপে বিদ্যমান ও যাঁরা সত্যসত্যই • বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী তাঁরাই এই সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন, কেননা, প্রতিনিয়ত আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের প্রভাবে তাঁরা মহৎ ও উদার মনোভাবাপন্ন হয়েছেন। আদর্শের উদারতা তথা মানসিক বিকাশের জন্যে তাঁরা স্বভাবতঃ সকলকেই স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। কোন বিশেষ যুগের ওপর বা ব্যষ্টির ওপর তাঁরা কখনই অবিচার করতে পারেন না। তাই সদ্বিপ্র-সমাজ উৎপীড়িত ও

অবদমিত মানবতার একযোগে প্রার্থনা ও দাৰি। সুতরাং দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকতাবাদ মূলতঃ ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু সদ্বিপ্ররা সমস্ত দেশে সৰ সময়ে কোন বিশেষ তত্ত্বের এ্যান্টিথীসিস তৈরী হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যতদিন পর্যন্ত না এ্যান্টিথীসিস তৈরী হয়, ততদিন সদ্বিপ্রের দল পরবর্তী অধ্যায়ে এ্যান্টিথীসিস তৈরী করবার জন্যে পৃথিবীব্যাপী এক মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা তৈরী করবে। যে মুহূর্তে সংশোধনের পুণ্য ঊষা নেৰে আসবে, সেই মুহূর্তেই সদ্বিপ্ররা সমাজের নেতৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করৰে। তাই দেখি দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকতাবাদের দ্বারা সমাজকল্যাণ সম্ভব নয়। কোন বিশেষ যুগে মানব সমাজের মঙ্গলের জন্যে এটা উপযোগী হ'তে পারে ও ঠিক, পরবর্তী যুগেই তা শোষণ ও ধ্বংসের নৃশংস অস্ত্রও হয়ে উঠতে পারে। 'প্রাউট' হচ্ছে এর একমাত্র সমাধান কেননা, দেশ, কাল ও পাত্রের মধ্যে পরিবর্তন সে স্বীকার করে ও অনুভব করে। সকল সময়ে আপেক্ষিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে যাবে। 'প্রাউটে'র ফলিত দিক আঙ্কিক অনুপাতের মধ্যে কোনদিনই গণ্ডীৰদ্ধ থাকৰে না। 'প্রাউটে'র নীতি ও কর্মসূচীর ব্যবহার বিশেষ যুগে, বিশেষ দেশে ও বিশেষ পাত্রের ওপর যেভাবে প্রয়োগ করা হবে, দেশ, কাল ও পাত্রের পরিবর্তনের

ফলে পরিবর্তিত অবস্থায় তা একরূপ থাকবে না। 'প্রাউট' এই মূল নীতিগুলি অবলম্বন করেছে।

দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকতাবাদ মনুষ্যসমাজের কল্যাণ করতে পারে না। কেবলমাত্র কোন বিশেষ যুগে বিশেষ কালে, বিশেষ পাত্রের পক্ষে এর কিছু উপকারিতা থাকতে পারে।

এখন গণতন্ত্রের কথায় আসা যাক। বলা হয়, গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের জন্যে, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন। শূদ্র যুগের পর গোষ্ঠীপতিদের হাতে ক্ষমতা স্থানান্তরিত হয়। কালক্রমে গোষ্ঠীপতিরা সামন্ত রাজা হয়ে পড়ে। রাজতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধ মনোভাব থেকে গণতান্ত্রিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। গণতন্ত্রের ইতিহাস অতি প্রাচীন। কথিত হয় যে প্রাচীন ভারতবর্ষে লিচ্ছবী রাজবংশের সময়ে গণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। অত্যন্ত প্রাচীন সংঘটন ৰলে এতে কিছু বিকৃতি আসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

এখন বিচার করা যাক্ "গণতন্ত্র জনগণের দ্বারা ঘটিত সরকার।" কিন্তু জনসাধারণ কি কোনটা সত্য ও কোনটা মিথ্যা, কী করতে হবে ও কী না করতে হবে তা বিচার করার মত শিক্ষা বা চেতনাসম্পন্ন? নির্দিষ্ট বয়সে পদার্পণ

করলেই কি ৰোধশক্তি ও বিচারশক্তি জন্মে? বয়স কি জ্ঞান ও শিক্ষার মাপকাঠি? দুঃখের কথা এই যে তা-ই সত্য হয়েছে। যাঁরা লিচ্ছবী রাজবংশের গণতান্ত্রিক ধাঁচ সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেন তাঁরা যদি সেই যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন তাহলে তাঁরা জানতে পারবেন যে সে-যুগে সকলেরই বোটদানের অধিকার ছিল না। কেবল লিচ্ছবী নেতারা বোটদানের অধিকার প্রয়োগ ও উপভোগ করতে পারতেন, জনসাধারণ নয়।

যেখানে কোন প্রকার শোষণ নেই সেখানেই গণতন্ত্র ফলপ্রসূ হতে পারে। প্রতিটি মানুষের জীবনেই কতকগুলি ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা (minimum requirements) আছে ও সেগুলি পূরণ করার গ্যারান্টি থাকা দরকার। দেশ, কাল ও পাত্রের প্রভেদ অনুযায়ী এই নিম্নতম প্রয়োজনীয়তার হেরফের হবে। কশ্মীরের মানুষের বেশী পরিমাণে পশমী কাপড় দরকার হয়। সে জন্যে বিহারের মানুষ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে গরম কাপড় কশ্মীরের মানুষকে দিতে হবে। যুগ ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা বদলে যায়। প্রাচীন কালে লোকে ধুতি, জামা ও একজোড়া খড়মে সন্তুষ্ট থাকত। এমন কি তারা জুতার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করত না,

কিন্তু বর্তমানে স্যুট অবশ্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আগেকার দিনে লোকে বহুদূরের রাস্তাও পায়ে হেঁটে অতিক্রম করত কিন্তু বর্তমানে সাইকেল ও মোটর যান জীবন ধারণের পক্ষে দরকার হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের এই সমস্ত ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর নিশ্চিত ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই minimum requirements-এর কোন সীমা বা সংখ্যা নেই। প্রতিটি প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় স্মরণ রাখতে হবে যে, নিম্নতম আবশ্যকতা দিন দিন বেড়েই চলবে। অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসছে যেদিন প্রতিটি ব্যষ্টিকে একটি করে রকেট দিতে হবে। তখন কারো পিতৃভূমি পৃথিবীতে ও শ্বশুরবাড়ী শুক্রগ্রহে অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াৰে। যে সমাজ-ব্যবস্থা দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্গে সমান্তরালতা সামঞ্জস্য রক্ষা করে তৈরী হৰে তাকে বলা হবে প্রগতিশীল সমাজতন্ত্র (Progressive Socialism)।

আমাদের প্রাউট এই প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রই। সমাজকে প্রতিটি জিনিসের সুব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে সকল মানুষের জীবনধারণের মান দিন দিন বর্ধিত হয়। যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে প্রগতিশীল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবেই গণতন্ত্র সার্থক হবে, নচেৎ "জনগণের দ্বারা, জনগণের

জন্যে, জনগণের শাসন”-এর মানে দাঁড়াবে "ৰোকার দ্বারা, ৰোকার জন্যে, বোকার শাসন।"

জনশিক্ষা গণতন্ত্রের সার্থকতা ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্যে অন্যতম বিষয় ও মূল প্রয়োজন। কোন কোন স্থলে শিক্ষিত মানুষও বোটদানের অধিকারকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। জনগণ গ্রাম-পঞ্চায়েতের ভ্রান্ত নেতৃত্বের নির্দেশ ও প্ররোচনায় বোট দিয়ে থাকে। পশুর পালের মত পোলিং বুথের কাছে এগিয়ে যাওয়া ও ব্যালট বক্সে বোট দেওয়া নিরর্থক। গণতন্ত্রের নামে এটা কি প্রহসন নয়? সুতরাং শিক্ষার বিস্তার ও যথার্থ জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা মানে শুধুমাত্র আক্ষরিক জ্ঞান বোঝায় না। আমার মতে যথার্থ ও যথেষ্ট জ্ঞান ও বোধশক্তিই সত্যিকারের শিক্ষা। অন্য কথায় চৈতন্যের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানই শিক্ষার আসল অর্থ। অ, আ, ক, খ-এর ধারণাকে শিক্ষা বলে না। আক্ষরিক জ্ঞান নিশ্চয়ই কিছু উদ্দেশ্য সাধন করে। আক্ষরিক জ্ঞান যে একেবারেই নিরর্থক বা প্রাণহীন তা আমি বলছি না। দক্ষিণ আমেরিকায় এমন কয়েকটি দেশ আছে যেখানে কেবল সাক্ষর ব্যষ্টিরাই বোটদানের অধিকার ভোগ করে। এই সমস্ত দেশে রাজনৈতিক দলগুলি লিটারেসি ক্যাম্পেন তুলে থাকে। যে পার্টি যে সমস্ত

লোককে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন করেছে তারা সেই পার্টিকেই বোট দেয়। সরকারও এই সমস্ত দায়িত্ব থেকে ও এই সমস্ত বিষয়ের ওপর আর্থিক ব্যয় থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সৰ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। প্রথমতঃ আক্ষরিক জ্ঞান পেলেই যে কর্তব্য-অকর্তব্যের পূর্ণ জ্ঞান জাগৰে তা ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি literacy campaign-এর দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে সেক্ষেত্রে সেই সমস্ত রাজনৈতিক দল আপন আপন দলীয় মত প্রচার করবে ও তাকেই সকলের প্রিয় করতে চাইবে। এর ফলে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে লোকে দেউলিয়া হয়ে পড়বে ও যুক্তির ওপর অভিশাপ হানা হবে। কিন্তু শিক্ষা একান্ত আবশ্যক, শিক্ষা ব্যতিরেকে গণতন্ত্র কোন দিনই সার্থক হতে পারে না!

নৈতিকতা: গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্যে নৈতিকতা দ্বিতীয় মূল উপাদান। নীতির অভাবে লোকে বোট বিক্রী করে। পৃথিবীতে এমন কতকগুলি দেশ আছে যেখানে বোট কেনাবেচা হয়। আমরা কি একে গণতন্ত্র বলতে পারি? এটা কি প্রহসন নয়? তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত জনসংখ্যার শতকরা একান্ন জন লোক নৈতিক অনুশাসনকে কঠোরভাবে না মানছে ততক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্রের সাফল্য অসম্ভব। যেখানে দুর্নীতিপরায়ণেরা

সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে সেখানে তাদের মধ্যে থেকেই অবশ্যম্ভাবীরূপে নেতা নির্বাচিত হৰে।

বর্তমান যুগে নৈতিকতার ৰাধাস্বরূপ প্রচুর বিষয় রয়েছে। নাগরিক সভ্যতা নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। নাগরিক সভ্যতার যুগে বহুসংখ্যক লোক অবাঞ্ছিত রূপে ক্ষুদ্র জায়গায় বাস করতে বাধ্য হয় যা ব্যষ্টিগত জীবনে নৈতিকতার ঘোর শত্রু। কোন ব্যষ্টির নৈতিক বিকাশের `জন্যে কিছুকাল তার নিভৃত জীবন যাপন করা একান্ত আবশ্যক। যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক সেখানে দুধ, শাকসব্জী কম পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাই প্রয়োজনের তুলনায় যোগান কম হওয়াতে ভেজাল চলতে থাকে। দুধের প্রয়োজন মেটাৰার জন্যে লোকে দুধে জল মেশায়, হীরার প্রয়োজন মেটাবার জন্য নকল হীরা বের হয়, কেননা যোগান কম ও চাহিদা বেশী। সমাজবিরোধী ব্যষ্টিদের জন্যে শহর দুর্নীতির আড্ডাখানা হয়ে পড়ে, কিন্তু সাধারণতঃ গ্রামে এগুলি দেখা, যায় না। গ্রামে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জীবিকা সম্বন্ধে অবহিত। শহরে কুড়ি বছর বাস

করার পরও লোকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরিচিত হয় না। জানতেও পারে না হয়তো তাদের মধ্যে অনেক পাক্কা জোচ্চোর লুকিয়ে আছে। এই কারণে আমাদের নাগরিক জীবনের বর্বরতা থেকে সরে থাকতে হবে। 'গ্রামে ফিরে যাও' এই ধরণের শ্লোগান তুললেই শুধু হবে না। সাধারণের কাছে শহরের জীবনধারার একটা তীব্র আকর্ষণ আছে। জনগণ জীবিকা নির্বাহের জন্যে শহরের দিকে ছুটে আসছে। এই কারণে বুদ্ধিজীবী মানুষের জন্যে গ্রামে গ্রামে জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও কুটির শিল্পের প্রসার আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী দরকার। কুটিরশিল্প বলতে আমি পুরানো ও বিকৃত ধরণের শিল্প বোঝাচ্ছি না। এগুলো ভালভাবে আধুনিক যন্ত্র দ্বারা নির্মিত হতে হবে। এজন্যে বিকেন্দ্রীকরণ অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যাবশ্যক। ভারী শিল্প ও খুব জরুরী সরকারী অফিস বাদ দিয়ে অন্যান্য সৰ কিছুই গ্রামে গ্রামে স্থানান্তরিত করতে হবে। শহরের জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি বন্ধ করতে গেলে এটাই একমাত্র কার্যকরী উপায়। শহরের ঘেঁসাঘেঁসি সেখানে জীবন না থাকায় সমাজবিরোধী ব্যষ্টিরা কিছুই লুকোতে পারবে না ও পুলিশ তাদের সহজেই ধরে ফেলতে পারবে।

গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় অনৈতিকতা একটি মস্ত বড় প্রশ্ন-যাকে কোনভাবেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলে না। প্রবাদ আছে যে, ভূতে ধরা কোন মানুষের ওপর যদি সরষে ছিটানো যায় তবে ভূত নাকি ভেগে যায়, কিন্তু যদি সরষের ভেতরেই ভূত ঢুকে বসে থাকে তবে আর কোনমতেই ভূতের হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় নেই। ঠিক সেইরকম অনৈতিকতার ভূত আজকের গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছে। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ প্রভৃতি নৈতিকতাবর্জিত কাজকর্ম গণতন্ত্রের প্রশ্রয় পাচ্ছে। মনে করা যাক কোন একটি নির্বাচন কেন্দ্রে A হ'ল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত ও B, C, D তরফের প্রতিনিধিদের পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে। এই অবস্থায় নির্বাচনে জিতবার জন্যে A সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিটি জাতিভেদ ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাকে উস্কিয়ে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবেই। এই ধরণের সমাজ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ গণমনকে সন্দিগ্ধ করে তোলে ও জনগণের নৈতিকতার ওপরও প্রচণ্ড আঘাত হানে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী বিভেদাত্মক চিন্তাভাবনা ও তাদের ভ্রান্ত মতবাদগুলি প্রচার করবার দিব্যি সুযোগ পায়।

তাই দেখছি, নৈতিকতা, যা নাকি গণতন্ত্রের সার্থক জয়যাত্রার একটি মৌলিক বিষয়, সেটাই অরক্ষিত হয়ে আছে।

কিছু লোক জাতিভেদকে প্রশ্রয় দেবে ও তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে। রাজনৈতিক দলগুলিও একমাত্র সেই ব্যষ্টিদেরই প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে যারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত। জন-সাধারণ অশিক্ষিত বলে তাদের এই চালাকি বুঝতে পারে না।

তৃতীয়তঃ গণতন্ত্রকে সফল করে তুলবার পক্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা থাকাও খুব প্রয়োজন।

শিক্ষিত লোকেরাও ধূর্ত ও সুচতুর রাজনীতিকদের দ্বারা চালিত হতে পারেন যদি না তাঁরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকেন। গণতন্ত্র কেবল তখনই সফল হতে পারে যখন উপরিলিখিত প্রধান তিনটি চেতনা 'জনগণের মধ্যে থাকৰে। এই চেতনাগুলি ভিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের কল্যাণ-সাধন করা কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ধরনের চিন্তা শুধু তত্ত্বের দিক থেকেই সম্ভব, বাস্তবে তার রূপায়ণ অসম্ভব। বুদ্ধিজীবীরা তাই এই ধরণের বাস্তব মূল্যহীন একটি চিন্তাকে কখনও প্রশ্রয়

দেবে না। তবে দেখছি, সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন না দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকতাবাদ, না গণতন্ত্র-এর কোনটির দ্বারাই সম্ভব নয়। একমাত্র জ্ঞানদীপ্ত প্রজাহিতৈষী একনায়কতন্ত্র অথবা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনাদীপ্ত একনায়কতন্ত্রই সমাধানের পথ।

যারা নীতিবান তারা সংখ্যায় অল্প হলেও তাদের চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। সমাজ যদি বুদ্ধি ও বোধিদীপ্ত ব্যষ্টিগণের দ্বারা পরিচালিত হয় তবে সেখানে শোষণ ও অন্যায়ের কোন স্থান থাকৰে না। এখন একটি প্রশ্ন হয়ত হতে পারে যে, একটি জাতি কিংবা একটি দেশ যেখানে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মানুষেরই মানবিক অধিকার আছে সেখানে তবে বিশেষ একজন মানুষ কেন বোটদানের অধিকার লাভ করবে আর অবশিষ্টদের তা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হবে। তা ছাড়া এ কথাও ঠিক যে এই জগৎটা সকলেরই পৈতৃকভূমি। এই পৃথিবীর সমস্ত প্রকার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদগুলিকে ভোগ করবার ও ব্যবহার করবার অধিকার মানুষমাত্রেরই আছে। কিন্তু ভোগের অধিকার থাকলেও দেশ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার, তাই ৰলে সকলকার থাকতে পারে না। জনগণের কল্যাণ ও

মঙ্গলের জন্যেই শাসনভারকে সবার হাতে ছেড়ে দেওয়াটা উচিত হবে না। কোন এক দম্পতির পাঁচটি সন্তান রয়েছে। প্রত্যেকেই তারা নিজেদের সংসারের সুখ ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। কিন্তু তারা যদি সংখ্যাধিক্যের অজুহাতে হঠাৎ দাবি করে বসে যে এই সংসারের দেখাশোনা ও সমস্ত ক্ষমতা তাদেরই হস্তান্তরিত করে দিতে হবে, তবে সেটা কি সম্ভব? তারা একটি মিটিং আহ্বান করলে ও তাতে একটি প্রস্তাবও পাশ করলে-প্রস্তাবটা হ'ল বাড়ীর সমস্ত গ্লাস ও বাসনগুলিকে ভেঙ্গে ফেলা উচিত। এই ধরণের প্রস্তাবকে বিজ্ঞোচিত ৰলা চলে কি? আর একটা উপমা দিই। ছাত্রেরা সব সময়েই শিক্ষকদের তুলনায় সংখ্যায় অধিক থাকে। এখন তারা যদি সংখ্যাধিক্যের অজুহাতে দাবি করে যে, তারা নিজেরাই হৰে নিজেদের প্রশ্ন-পত্র তৈরী-কর্তা ও পরীক্ষক, তবে সে দাবিটিও মেনে নেওয়া কি সম্ভব? তাই বলছি, গণতন্ত্র খুৰ একটা ভাল ও সরল পথ নয়। কিন্তু যতদিন না দ্বিতীয় কোন অধিকতর ভাল ও সমর্থনযোগ্য তত্ত্বকে আমরা বের করতে পারছি ততদিন অন্যান্যদের তুলনায় গণতন্ত্রকেই মন্দের ভাল ৰলৰ ও এই সময়ের জন্যে আমরা গণতন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারি।

১২৪

সভ্যতার ভবিষ্যৎ

বর্তমান সভ্যতার বুদ্ধিজীবীরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানব সমাজের ধ্বংসের আশঙ্কায় ও ভয়ে ঘাৰড়ে যান। মানুষ ভাবছে যে, সভ্যতা এক সঙ্কট জনক অবস্থায় পথ চলছে; সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু তা ঘটৰে না।

ব্যষ্টি ও সমাজ উভয়কেই স্বীয় অস্তিত্ব ৰজায়ের জন্যে তিনটি তত্ত্বের ওপর নির্ভর করতে হয়। তা হল: অস্তি, ভাতি ও আনন্দম্। বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসা এগুলো অস্তি অর্থাৎ অস্তিত্ব বজায়ের জন্যে অত্যাবশ্যক। ভাতির অর্থ বিভাতি অর্থাৎ উন্নতি ও প্রগতি। সমাজে প্রত্যক্ষ উপস্থিতিই তার সত্যিকারের অস্তিত্ব নয়। উদাহরণস্বরূপ, কেঁচো লক্ষ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে–কিন্তু তা সত্যিকারের অস্তিত্বের দ্যোতনা নয়। সুতরাং বলতে হয় ভাতি অর্থাৎ উন্নতি ও প্রগতি অবশ্যই থাকা চাই। খাওয়া, পান রা

ও আনন্দ করাই সত্যিকারের জীবনের পরিচয় নয়। এই ধরণের জীবন বিরক্তিকর ও বোঝার ন্যায়।

ব্যষ্টি ও সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে একটি লক্ষ্যের প্রয়োজন রয়েছে। একটি কলি পুষ্পে পরিণত হয়-একে তুমি উন্নতি বা ভাতি বলতে পার। ভাতির উদ্দেশ্য আনন্দ-সম্প্রাপ্তি। আনন্দের অর্থ হচ্ছে অনন্ত সুখ। তা সুখ-দুঃখের অতীত-এই অবস্থাতেই চরম মানসিক শান্তি সম্ভব।

পূর্বোক্ত তত্ত্বের যে কোনও একটির অনুপস্থিতি ব্যষ্টি জীবনে ভয়ানক ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে। যদিও আর্কিয়োলজির দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও তার শৈশবাবস্থা চলছে, তথাপি আজ না হোক কাল ধ্বংস অনিবার্য। সেদিন, স্বাভাবিক ভাবে মনে হতে পারে, মানব জাতির বিলুপ্তি হৰে। কিন্তু তা কি ঠিক?

সূর্যের তাপমাত্রা হ্রাস

এটা সত্য যে সূর্যের তাপমাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে। এই তাপ- হ্রাসের পরিমাণ অপার্থিব শক্তির প্রভাবে অধিকতর ধীর গতিতে হতে পারে, কিন্তু তথাপি, এটা সন্দেহাতীত যে, একদিন এই সূর্য মৃত নক্ষত্রে পরিণত হবে। আর এর পরিণাম হ'ল সৰ গ্রহেরই মৃত্যু। সুতরাং পৃথিবীও সে সময় বাসের উপযোগী থাকৰে না।

কোন একটি গ্রহের অথবা একটি সৌরজগতের ধ্বংসের অর্থ এই হচ্ছে নয় যে, মানব জাতিও সমূলে বিনষ্ট হৰে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য গ্রহ ণক্ষত্র রয়েছে। উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে ও আন্তঃগ্রহ-রকেটের সাহায্যে মানুষ অন্যান্য গ্রহে যেতে সক্ষম হবে। আজকে যা স্বপ্ন, কালকে তা বাস্তবে পরিণত হৰে। এটা ব্যষ্টি বা সমষ্টি উভয়েরই আন্তরিক ইচ্ছা। আকাশে পাখীর মত উড়বার ইচ্ছা মানুষের অনেকদিন ছিল। এরোপ্লেন এই ইচ্ছারই অনিবার্য ফল। ইচ্ছা কর্মের জননী। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা এমন রকেট দেখবে যার সাহায্যে মানুষ গ্রহান্তরে পরিভ্রমণে যাবে। যদি কোনও দিন এসব গ্রহ ও ণক্ষত্র ধ্বংসও হয় সেদিন মানুষ অন্য গ্রহ ও ণক্ষত্রে চলে যাবার মতো ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হবে। অনেকে যুক্তি দেখাতে পারে ক্রমাগত তাপ ও আলো বিকিরণের ফলে সমস্ত

বিশ্বের উত্তাপ এক হয়ে যাৰে ও তাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাপ-মৃত্যু (thermal death) ঘটবে। বাইরের উত্তাপের অভাবে জগতের অস্তিত্ব ৰজায় থাকবে না। তার মানে মানবতাও ধ্বংস প্রাপ্ত হৰে। কিন্তু তা হতে পারে না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তাপ-মৃত্যু হতে পারে না। জড়বস্তু-দেহের মধ্যে 'জড়স্ফোট' ঘটৰে। কোন বিশেষ একটি গ্রহের 'জড়স্ফোটে' প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হবে ও তা থেকে নূতন গ্যালাক্সী-নতুন নক্ষত্রের সৃষ্টি হবে। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। পৃথিবী একদিন ধ্বংস হতে পারে ঠিকই কিন্তু মানবতার বিনাশ ঘটবে না। তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমরা, একরকম নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

ভাতি

সমাজের প্রগতির জন্যে বহু তত্ত্বের প্রয়োজন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ছয়টি তত্ত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয়।

অধ্যাত্ম-আদর্শ (A spiritual ideology):

ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের জীবনের জন্যে অধ্যাত্ম–আদর্শের প্রয়োজন আছে।

তোমাদের নিজেদের সম্পর্কে ও তোমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যে তোমাদের অনেক শক্তির অপব্যয় হচ্ছে। এই শক্তির অপব্যবহার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অধ্যাত্ম–সাধনা (A spiritual cult):

সমাজের প্রগতির জন্যে দ্বিতীয় তত্ত্ব হচ্ছে অধ্যাত্ম–সাধনা। সকল মানুষের একটি দৈহিক সংরচনা আছে। প্রত্যেকটি মানুষের সমস্যা হচ্ছে অধিক থেকে অধিক 'চিত্তধাতু' (ectoplasmic stuff) তৈরি করা ও এগুলোকে চৈতন্যে (consciousness) রূপান্তরিত করা। এই রূপান্তরণের জন্যে প্রয়োজন রয়েছে বিশেষ পদ্ধতির। অধ্যাত্ম–সাধনা হ'ল এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বকে চিত্তধাতুতে ও চিত্তধাতুকে চৈতন্যে রূপান্তরিত করা। এটা একটা রূপান্তরণের পদ্ধতি। সুতরাং অধ্যাত্ম–সাধনা মানুষের জীবনে অপরিহার্য। কেবল অধ্যাত্ম–আদর্শ বা অধ্যাত্ম–দর্শন হলেই চলবে না।

সামাজিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব (A socio-economic theory):

অস্তি ও ভাতির যোগসূত্র রক্ষাকারী তৃতীয় তত্ত্ব হচ্ছে সামাজিক- অর্থনৈতিক তত্ত্ব। সামাজিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক বণ্টন ও বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই। এই জ্ঞান ব্যতিরেকে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাৰে না।

সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গী (social outlook) :

চতুর্থটি হচ্ছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই জগতের সমস্ত প্রাণীই এক পরমপিতার সন্তান। তারা একই ভ্রাতৃত্ব-ৰন্ধনে আবদ্ধ। সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্ব অর্থহীন হয়ে যাবে যদি এই ভ্রাতৃত্ব ভাব না থাকে। আর সাধনা ছাড়া এই তত্ত্বের প্রয়োগও অসম্ভব।

শাস্ত্র (own scripture):

সামাজিক অগ্রগতির জন্যে পঞ্চম তত্ত্বটি হ'ল-নিজস্ব শাস্ত্র। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৎসঙ্গের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যার সংস্পর্শে এসে তুমি সৎসঙ্গ লাভ কর তাই শাস্ত্র। শাসনের দ্বারা যা সমাজের উন্নতি ঘটায় তাকেই শাস্ত্র বলৰে। আমাদের নিজস্ব শাস্ত্র অবশ্যই থাকৰে।

গুরু (Preceptor):

সর্বশেষে কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তত্ত্ব হচ্ছে, সমাজের প্রগতির জন্যে গুরু থাকা চাই।

সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা এই ছয়টি তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল। এগুলো ছাড়া ভাতি অর্থহীন। কোনও একটির দুর্বলতার জন্যে ভাতির অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হতে পারে।

কয়েকটি উদাহরণ:

বহু প্রাচীনকাল থেকেই বহুবিধ সমাজভুক্ত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকে এখনও নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে–অনেকে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে ও অন্যান্যরা পরিবর্তনের মাধ্যমে টিকে রয়েছে। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আরবরা বিজ্ঞানে অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু তারা ইসলাম কর্তৃক পরাজিত হ'ল। কারণ তাদের মধ্যে পূর্বোক্ত ছয়টি তত্ত্বের অভাব ঘটেছিল, অপরপক্ষে ইসলামের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। মিশরের বেলাতেও তা–ই ঘটেছিল। কলা, স্থাপত্য ও বিজ্ঞানে এই দেশ অত্যন্ত উন্নত ছিল। তাঁদেরই তৈরী পিরামিড ও মমিতে সূক্ষ্ম জ্যামিতিক জ্ঞান দৃষ্ট হয়। তদুপরি তারা সভ্যতার ক্ষেত্রেও অনেক

অগ্রগামী ছিল। এতদ্- সত্ত্বেও তারা নিজেদের পরাজয় এড়াতে পারেনি। আজকের মিশর আরবদের মিশরীয় রূপান্তর মাত্র। এই প্রাচীন সভ্যতার মৃত্যুর কারণ এই ছয়টি তত্ত্বের অনুপস্থিতি।

খ্রীষ্টীয় ও রোমীয় সভ্যতাও উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। কিন্তু তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল। তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য ছিল না। দাসপ্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল; মানবতাৰোধ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের অভাবের ফলে একরকমের ফ্যাসিষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। বিলাসী জীবন যাপন ও শ্রম বিমুখতার ফলে তারা স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী ও পরিশ্রমী শক্তির হাতে পরাস্ত হয়। গ্রীক ও চৈনিক সভ্যতার ধ্বংসের কারণও হচ্ছে ভাতি'র ছয়টি তত্ত্বের অনুপস্থিতি।

আর্যরা ভারতে এসে এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের পরাস্ত করতে পেরেছিল, তার কারণ, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ভাতির সমস্ত উপাদান ছিল না। তাদের অনেক উপাদানই ছিল–কিন্তু ছিল না গুরু। তাই তারা পরাজিত হয়েছিল।

সদ্বিপ্র

ভবিষ্যতেও 'ভাতি'র ছয়টি তত্ত্বের অভাব যে জনগোষ্ঠীতে রয়েছে তার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যেখানে এই তত্ত্বগুলো উপস্থিত থাকৰে ও যেখানে গতি হৰে আনন্দের দিকে সেখানে জনগোষ্ঠীর ধ্বংসের সম্ভাবনা থাকৰে না। যে জনগোষ্ঠীর এই ছয়টি তত্ত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা থাকৰে সদ্বিপ তৈরী করতে পারবে তারাই। তাঁরাই হচ্ছেন সদ্বিপ্র যাঁদের পরম লক্ষ্য কেবল আনন্দপ্রাপ্তি। তাঁরা অস্তি সম্পর্কে সচেতন ও তাঁদের মধ্যে ভাতির ছয়টি তত্ত্বের উপস্থিতি রয়েছে। তাঁরা নৈতিকতায় শক্তিশালী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সৰ সময়েই প্রস্তুত।

'ভাতি'র ছয়টি তত্ত্ব ছাড়া তপঃসিদ্ধি অসম্ভব। যাঁরা নৈতিকতার আদর্শগুলি মেনে চলেন, তপঃ সম্পর্কে সচেতন ও. অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রস্তুত তাঁরাই সদবিপ্র। এইসৰ সন্দ্বিপ্ররা, যাঁরা সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁরা ধ্বংসের বা বিলোপ সাধনের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। সুতরাং প্রত্যেকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে সদ্বিপ্ন করে তোলা ও অন্যকে সদ্বিপ্র হতে সহায়তা করা। সন্দ্বিপ্র বলতে আমরা যেন–যারা কেবল মালা জপ বা প্রাণায়াম করছে

তাদের না বুঝি। প্রাণায়াম- এ তিনটি স্তর রয়েছে। পূরক যখন শ্বাস গ্রহণ করা হয়; কুম্ভক যখন শ্বাস ভিতরে ধরে রাখা হয় ও রেচক হচ্ছে শ্বাস পরিত্যাগ করা। সদ্বিপ্রের প্রাণায়াম হৰে সমস্ত বিশ্বকে পূরকে গ্রহণ করা, তাকে কুম্ভকে ধরে রাখা ও পরে নিজের মহত্ব ও সদিচ্ছা মিশ্রিত করে রেচকের মাধ্যমে ত্যাগ করা।

সংগ্রাম

সদ্বিপ্রগণ অনৈতিকতা ও অন্যায়জনক প্রবণতার বিরুদ্ধে আপোষহীন ও বিশ্রামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। যারা নিজেকে ধার্মিক বলে প্রচার করে কিন্তু সংগ্রাম করার মনোভাব নেই-তারা কিন্তু সদ্বিপ্র নয়। শিব এই জন্যেই মহান ছিলেন যে তাঁর ত্রিশূল সৰ সময়েই অনৈতিকতাকে আঘাত করতে প্রস্তুত ছিল। কৃষ্ণ এই জন্যই মহান ছিলেন যে, তাঁর তীর সব সময়েই অমানবিকতা ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে ছুটে যেতে প্রস্তুত ছিল। তিনি নীতিবাদীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁরা শুধুমাত্র সদ্বিপ্রই নন। তাঁরা সদ্বিপ্রের জনক। তাঁরা মহাসদ্বিপ্র।

এইসব সদ্বিপ্রগণ সৰ সময়েই মানুষের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট। এই পৃথিবী যখন পুরানো হয়ে যাবে–তখন তাঁরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে অন্য গ্রহে মানুষদের পৌঁছে দেবেন।

নিরস্ত্রীকরণ–বিপজ্জনক

কেউ কেউ এই ভেবে ভীত যে, আণবিক বা মেগাটন ৰোমা কোনও একদিন মানব সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হৰে। কিন্তু এই ধরণের ভয় পাওয়া ত্রুটিপূর্ণ ও অর্থহীন। মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশই এই ধরণের আবিষ্কারের জন্য দায়ী। স্বাভাবিক ভাবে তার বুদ্ধি তার সৃষ্টি থেকে বড়। তারা একদিন এমন অস্ত্রও আবিষ্কার করতে পারবে যা আণবিক ও মেগাটন ৰোমাকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। নিরস্ত্রীকরণের জন্য চিৎকার আণবিক বোমার ধ্বংসকারী শক্তিকেই বর্ধিত করবে। আর তা মানব সভ্যতার ধ্বংসই ডেকে আনতে পারে। সুতরাং তা মানব সমাজের প্রগতিশীল উন্নতির পথে একটা বড় বাধা। আমরা হাইড্রোজেন ও আণবিক বোমা থেকে আরো শক্তিশালী অস্ত্র প্রত্যাশা করব। সন্দ্বিপ্রগণ এইসব

অস্ত্র তৈরী করবেন। যদি মানব সভ্যতাকে বাঁচতে হয় তবে শান্তির দূতদের কর্তব্য হৰে বর্তমান অস্ত্রের থেকেও উন্নততর অস্ত্রের ব্যবহার জানা।

সদ্বিপ্রগণ আধুনিক অস্ত্র তৈরীতে কখনো পিছিয়ে থাকৰে না। যখন পৃথিবী মানুষের বাসের অনুপযোগী হয়ে যাবে তখন তাঁরা সমস্ত মানুষকে অন্য গ্রহে স্থানান্তরিত করবে। খাদ্যাভাব কোনও নোতুন সমস্যা নয়। কেবলমাত্র সদ্বিপ্ররাই (রাজনীতিকগণ নয়) পৃথিবীকে বাঁচাতে পারবে। তাঁরা খাদ্যের বিকল্প ট্যাবলেট তৈরী করতে সক্ষম হবেন। সমস্যাকে নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করলেই গোলযোগ দূর হবে না। সমস্ত ৰাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মনোভাবই সমস্যা সমাধানে সক্ষম। সামনের দিকে এগিয়ে যাও ও সমস্ত অসুবিধা ও বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাও। বিজয় তোমাকে অবশ্যই আলিঙ্গন করৰে। ৰাধা বিপত্তি তোমার সাধ্যের থেকে অধিক শক্তিশালী নয়। তুমি পরমপুরুষের সন্তান। সদ্বিপ্র হও–সদ্বিপ্র তৈরী কর।

মানব-প্রগতি

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বে রয়েছে তিনটি স্তর-আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বা কারণ। এ ছাড়া রয়েছে একটা মানসাতীত স্তর। মানবীয় অস্তিত্বেও তিনটি স্তর রয়েছে-স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এ ছাড়া এখানে রয়েছে এক প্রতিফলিত চৈতন্য। এই চৈতন্যের স্তরে বিকাশের কোন প্রশ্ন নেই। কারণ আত্মা গুণাতীত অতীন্দ্রিয় সত্তা। যেখানে রয়েছে অপূর্ণতা ও নশ্বরতা, সেখানেই রয়েছে বিকাশের সুযোগ। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে গতিই হ'ল প্রগতি। মানসাতীত স্তরে কোন প্রগতি নেই। কারণ তা পূর্ণ ও শাশ্বত। মানসিক স্তরে এই প্রগতির পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। স্থূল শরীর যে পাঞ্চভৌতিক উপাদানে তৈরী সেই পাঞ্চভৌতিক উপাদান ভূমামানসের স্থূল অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। এই পাঞ্চভৌতিক সত্তার সমন্বয়েই সকল সত্তার দেহ- সংরচনা গড়ে ওঠে।

সকল সত্তার যিনি মূল উৎস–তিনি হলেন পরম পিতা। তিনি সমভাবে সকলের। এই বিশ্ব তাঁরই প্রকাশ। তাই এই বিশ্বকে ভোগ করবার ও নিরাপত্তা লাভের জন্মগত অধিকার প্রতিটি সত্তার আছে। অতিরিক্ত সম্পদ কুক্ষিগত করার অধিকার কারও নেই। অতিরিক্ত ভৌতিক সম্পদ লাভ করার বাসনা বা তা সঞ্চয় করা সমাজের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণজনিত পাপ। এটা একটা বড় ধরণের অনৈতিক ও সমাজ–বিরোধী কাজ। এইসব কায়েমী স্বার্থের ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত।

এই ভৌত দেহ অপূর্ণ ও নশ্বর। কারণ তা স্থান, কাল, পাত্রের বন্ধনে আৰদ্ধ। আপেক্ষিকতার ৰন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার এক অপ্রতিহত ও অদম্য স্পৃহা মানুষের রয়েছে। এই এষণা যদি মানুষের না থাকত, তা হলে তার কোন ৰৌদ্ধিক বিকাশই ঘটত না। যারা দৈহিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে দিন–রাত্রি কঠোর সংগ্রাম করে চলেছে তারা তাদের মানসিক উন্নতির জন্যে খুব কমই সময় পায়। তাদের খাওয়া–পরার সমস্যাই তাদের মনের বিকাশকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মনুষ্যত্বের বিকাশ তথা সার্বিক উন্নতির জন্যে প্রতিটি মানুষের সমান

সুযোগ ও ন্যূনতম প্রয়োজনের গ্যারান্টির ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

ভৌতদেহ স্থান-কাল-পাত্রের ৰন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে না। ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে এই ৰন্ধনের ঘনত্বের তারতম্য থাকে বা থাকৰে, কিন্তু এই তারতম্যের হার যাই হোক না কেন, প্রতিটি মানুষকে তার বৌদ্ধিক প্রগতির জন্যে সীমাহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ঘটা সম্ভব নয়। সংগ্রাম জীবনের মূলমন্ত্র আর কর্মহীনতাই মৃত্যু। সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া কপটতার নামান্তর মাত্র।

যারা হীনমনা ও কায়েমী স্বার্থবাদী, মানবতার মুক্তি ও সমাজের প্রগতি চায় না, তারাই নানান ধরণের 'ইজমে'র উদ্ভাবন ও প্রচার করে। উদ্দেশ্য এইসৰ ডগ্‌ম্মা বা ভাবজড়তার আড়ালে থেকে সমাজের অজ্ঞ জনসাধারণকে শোষণ করা। 'ইজমে'র নামে এরা বিভিন্ন মত-পার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদের ৰীজ বপন করে তাদের শোষণযন্ত্রকে সুরক্ষিত করে। মানব-সমাজ এক ও অবিভাজ্য। মানুষে মানুষে কোন মূলগত পার্থক্য নেই। সকল মানুষই তার সঞ্জীবনী রস ও জীবনী শক্তি পেয়ে চলেছে সেই এক অদ্বিতীয় উৎস থেকে।

তাই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ও বৈষম্যের কথা মানবতা বিরোধী।

ভূমার ক্ষেত্রে যেমন স্থূল জগতের ঊর্ধ্বে রয়েছে সূক্ষ্ম জগৎ। অনুচৈতন্যের ক্ষেত্রেও তেমনি রয়েছে। মানুষকে তার বৌদ্ধিক প্রগতির জন্যে অনলস চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় মানুষের মন স্থূল জাগতিক বস্তুর দিকে ছুটবে। আর অনবরত এই স্থূল চিন্তা-স্থূল তরঙ্গের অধ্যারোপণের ফলে মন শেষ পর্যন্ত জড়ে রূপান্তরিত হয়। মন জড়ত্বের মধ্যে বাঁধা থাকতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেকেরই উচ্চ ও সূক্ষ্ম বিষয়ের চিন্তা করা বা ভূমা-চৈতন্যের ভাবনা নেওয়া উচিত।

স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম মানসিক দেহ পরমাত্মার মানসদেহেরই অংশবিশেষ। সুতরাং আমরা কাউকেই অবজ্ঞা করতে পারি না। প্রত্যেকের তার দৈহিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ভৌতিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করার যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি মানসিক প্রগতির জন্যেও প্রত্যেককে সমান সুযোগ দিতে হবে।

হীনম্মন্যতা একটি মানসিক রোগবিশেষ। এমন বহু মানুষ রয়েছে যারা দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব ও সামাজিক অবিচার-

হেতু নিজেদের নিকৃষ্ট ও অকেজো ভাবে। এই রোগগ্রস্ত মানুষদের তথা নিপীড়িত মানবতার রোগ- মুক্তির ব্যবস্থা করা সমস্ত ধর্মপ্রাণ ও শুভানুধ্যায়ী মানুষেরই কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের কথা, এইসব তথাকথিত ধর্মীয় (রেলিজিয়াস) নেতারা আবহমানকাল থেকেই মানুষের এইসব মানসিক কমপ্লেক্সগুলোকে জীইয়ে রেখে নানান ধরণের ইজমের প্রচার করে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে চলেছে। ভৌতিক ক্ষেত্রে এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতির সমর্থকদের যদি শয়তান আখ্যা দেওয়া যায়, ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রে এই সৰ মারাত্মক নীতির প্রবক্তাদের বলতে হৰে মার্জিত শয়তান। ভৌতিক ৰন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অনিবার প্রয়াস ছাড়া যেমন মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়, তেমনি মানসিক ক্ষেত্রে মুক্তির জন্যে বিরামহীন প্রচেষ্টা যদি না থাকে, তাহলে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও কোন প্রগতি সম্ভব নয়। তাই ৰৌদ্ধিক চর্চা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে একান্ত প্রয়োজন- যদিও এই ৰৌদ্ধিক চর্চা যে মুক্তি এনে দেয় তা অস্থায়ী।

ভৌতিক-মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিটি গতিই সঙ্কোচ-বিকাশাত্মক। সাধারণ ভৌতিক ক্ষেত্রে এটা দৃশ্যমান নয়। সঙ্কোচ-বিকাশাত্মক গতি প্রকৃতপক্ষে গতি ও বিরতির সমন্বয়।

এই বিরতির অবস্থাটা অনুভূত হয় ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রে। ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রে এই বিরতিকে আমরা বলি ৰৌদ্ধিক মুক্তি। যে অবস্থায় মন কিছুক্ষণের জন্যে সকল সন্দেহ ও সমস্যা থেকে মুক্ত হয়- সেটাই বিরতির অবস্থা বা ৰৌদ্ধিক মুক্তির অবস্থা। ৰৌদ্ধিক স্তরে সংঘর্ষের ফলে যে মানসিক শক্তি তৈরী হয় তা কারণ মনের ওপর আঘাত হেনে একে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। এর ফলে অবশেষে কারণ মন অণুচৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধিক স্তরে সংঘর্ষের ফলে যে বোধিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটে তাই মনকে চৈতন্যে রূপান্তরিত করে দেয়। কিন্তু ৰৌদ্ধিক চর্চা কখনও জড়াভিমুখী হওয়া উচিত নয়। মানস-তটিনী স্থূল সূক্ষ্ম উভয়দিকেই প্রবাহিত হতে পারে। যদি মনের স্রোতধারা সূক্ষ্মের দিকে প্রবাহিত হয়, তা আনে মুক্তি। কিন্তু যদি তা স্কুলের দিকে প্রধাবিত হয় তাতে ৰন্ধনের গ্রন্থিগুলি দৃঢ়তর হয়। তাই যাঁরা জ্ঞানী, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান-তাঁরা সত্য ও অমরত্বের পথ বেছে নেবেন, আর 'লেখাপড়া শেখা' নির্বোধেরা স্থূল ও অন্ধকারের পথ ধরে চলবে।

রেনেসাঁ আন্দোলনের লক্ষ্য হ'ল মানুষের সূক্ষ্মতর উচ্চতর চিন্তার রাজ্যকে আলোকিত ও পুনরুজ্জীবিত করা।

আমি চাই, প্রতিটি মানুষ জীবনের ন্যূনতম ভৌতিক প্রয়োজন-পূর্তির গ্যারান্টি পাক। প্রতিটি মানুষ তার মানসিক ক্ষেত্রের সমস্ত সম্ভাবনার পূর্ণ সুযোগ পাক, প্রতিটি মানুষ শাশ্বত সত্য উপলব্ধির সমান সুযোগ পাক ও বিশ্বের সকল উৎকর্ষ ও গৌরবের অধিকারী হোক। প্রতিটি মানুষ সেই শাশ্বত অনন্ত সত্তার দিকে এগিয়ে চলুক। এই আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষ জীবনের অর্থ ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠুক।

(মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)

সভ্যতা, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক প্রগতি

আজকের আলোচনার বিষয় হ'ল, সভ্যতা, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক প্রগতি। মানুষের বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তির সামূহিক নাম 'কালচার' বা 'সংস্কৃতি'। শুরুতেই আমি তোমাদের বলে রাখছি, গোটা মানুষ জাতির সংস্কৃতি একটাই।

সভ্যতা কী? আমাদের জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যে শিষ্টাচারের যে সূক্ষ্ম ভাবের সংস্পর্শে আমরা আসি, তাকেই ৰলে সভ্যতা। একটা উদাহরণ দিই, মনে কর, বাড়ীতে একজন অতিথি এসেছেন। আমরা নিরুত্তাপ ভাবে তাকে "এসো" বা "আসুন" বলে আহ্বান করতে পারি, আবার স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে এও বলতে পারি, "অনুগ্রহ করে আসুন" বা "আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন"। এই যে অতিরিক্ত ভাষা বা ভাবের দ্বারা ভদ্র সম্ভাষণের অভিব্যক্তি এটাই সভ্য বা সভ্যতা-সম্মত আচরণ। কারণ এখানে শিষ্টাচারের সূক্ষ্মভাবটা স্বতঃস্ফূর্ত। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, সাধারণ নিরুত্তাপ আহ্বান সূচক 'এসো' বা 'আসুন' কথাটা সম্ভাষণের উত্তাপরহিত-এটা শিষ্টাচারের অভাবেরই ফল। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, সংস্কৃতি বা কালচারের ক্ষেত্রে ভাল মন্দ দু'টো দিকই আছে, কিন্তু শিষ্টাচারের যে সূক্ষ্মভাব-এটাই সভ্যতার কষ্টিপাথর। সংস্কৃতি বা কালচারের মাধ্যমে শিষ্টাচারের যে সূক্ষ্ম ৰোধ আমরা পাই, সেটা মানুষের সূক্ষ্ম বিচার-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আমরা মানুষের সেই সব আচার- আচরণকেই সভ্য ৰলতে পারি যা বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষের সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন বিশেষ গোষ্ঠীর

জনসাধারণের আচার-আচরণ বিচারের সমর্থন লাভ করেছে, কিন্তু অন্য এক গোষ্ঠীর আচার-আচরণ বিচারের সমর্থন লাভ করছে না। এখন যদি ওই বিশেষ বিচারে প্রথমোক্ত গোষ্ঠীকে সভ্য ও অপর গোষ্ঠীকে অর্ধসভ্য বলি, তাহলে সেটাও যুক্তিযুক্ত হবে না।

ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায়, নারীকে মায়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাদের সেরকম সম্মান দেখানো হয় না। অপরপক্ষে ইয়ুরোপীয় সমাজে যদিও মায়ের মর্যাদা নেই, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নারীরা নিশ্চিতভাবে পুরুষের সমান অধিকার ও সম্মান ভোগ করে থাকেন। এখন এই দু'টোর মধ্যে কোনটি অধিকতর সভ্য, এটা বলা খুবই শক্ত। এক্ষেত্রে আমি বলবো, কাজ-কর্মে, আচার-আচরণে বিচারের সমর্থন যতটা বেশী থাকৰে, সভ্যতার প্রকাশ তথা বিকাশও তত বেশী হৰে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যেকার পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম। সংস্কৃতি জীবনের সকল অভিব্যক্তির সামূহিক রূপ। সংস্কৃতি ৰৌদ্ধিক স্তরের অভিব্যক্তি, কিন্তু সভ্যতা জীবনের ভৌতিক দিকটার প্রকাশ। সুতরাং একজন মানুষ ভৌতিক উন্নতির ব্যাপারে সভ্য হতে পারে, কিন্তু তার মানসিক বিকাশের দিকটা

বিচার করলে সে উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন নাও হতে পারে। বস্তুতঃ ৰৌদ্ধিক বিকাশ না হলে একজন মানুষের পক্ষে যথার্থ সভ্য হওয়া সম্ভব নয়।

সভ্যতার বিকাশ কেমন করে ঘটে? সভ্যতার সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে, একই সঙ্গে এই দু'য়ের উন্নতি হয়। কিন্তু যেখানে বৈজ্ঞানিক উন্নতি, সভ্যতার উন্নতিকে পিছনে ফেলে যায়, সেখানেই সভ্যতার ভরাডুবি ঘটে। উদাহরণ হিসাবে মিশর ও গ্রীসের ইতিহাসের কথা ধরা যাক। যতদিন এই দুই দেশের বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, সভ্যতার অগ্রগতিকে অতিক্রম না করেছিলো, ততদিন এই দুই দেশে সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহতই ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতিতে যখন ভোগ্য-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেল, তখনই উভয় দেশের সভ্যতা ক্রমে ধ্বংস হয়ে গেল, কারণ তখন. বিজ্ঞান সভ্যতার ওপরে স্থান অধিকার করেছে।

বিজ্ঞান কী? যা বস্তুর যথাযোগ্য ব্যবহার শিখিয়ে দেয় তাই বিজ্ঞান। সভ্যতার বিকাশ যেখানে একেবারেই নগণ্য, সেখানে যদি বিজ্ঞানের অগ্রগতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌঁছায়, সেখানে বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে ধ্বংসেরই পথ প্রশস্ত করে। সুতরাং বিজ্ঞানের গবেষণা ও চর্চা যদিও

অপরিহার্য তবুও একে সভ্যতার ওপরে স্থান দেওয়া মোটেই সঙ্গত কাজ নয়।

এখন আমি তোমাদের বোধি-জ্ঞান সম্পর্কে দু'চার কথা বলবো। ভারতবর্ষে তন্ত্রের যুগ থেকে শুরু করে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত সভ্যতা ও বিজ্ঞান পাশাপাশি বিকাশ লাভ করে চলছিল, বিজ্ঞান কখনই সভ্যতার থেকে বেশী সম্মান পায়নি। গুপ্ত যুগ ভারতের সুবর্ণ যুগ। গুপ্ত যুগের পর বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হয়নি। এর ফলে হয়েছিল ক্রমাবনতি ও অধঃপতন। পাঠান যুগে সভ্যতা ও বিজ্ঞান কোনটিরই বিকাশ হয়নি, তাই সে যুগে সমাজের উন্নতিও স্তব্ধ ছিল।

মানব সমাজের সার্বিক প্রগতির তথা উন্নতির জন্যে সভ্যতা ও বিজ্ঞান উভয়কে একই সঙ্গে প্রোৎসাহিত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেখানেই তুমি সভ্যতার উন্নতি দেখবে, সেখানেই লক্ষ্য করবে বৌদ্ধিক উন্নতি এর সঙ্গে রয়েছে। আবার যেখানে বিজ্ঞানের চর্চা রয়েছে, সেখানেও বৌদ্ধিক বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাই সভ্যতা ও বিজ্ঞান উভয়ের ক্ষেত্রেই বৌদ্ধিক জ্ঞান অপরিহার্য। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের সুন্দর সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই আধ্যাত্মিক ও বোধি জ্ঞানের বিকাশ সম্ভব। যেখানে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়

আদৌ নেই, সেখানেও বোধিজ্ঞানের বিকাশ সম্ভব হলেও, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের মধ্যে সুষম সমন্বয় থাকলে, আধ্যাত্মিক প্রগতি ত্বরান্বিত হবে। সুতরাং যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এই দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেই প্রগতির পথে এগিয়ে চলবেন। এই দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন ছাড়া বোধির জগতে প্রকৃত প্রগতির কথা চিন্তা করা অর্থহীন।

আজ আমাদের কর্তব্য কী? আমরা বিজ্ঞানের চর্চা করবো, কিন্তু সেই সঙ্গে সভ্যতার উন্নতির দিকেও সমান লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ভারতের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে আজকের যুগের বিজ্ঞানের উন্নতি সে-যুগের বিজ্ঞানের উন্নতি থেকে অনেক বেশী। কিন্তু সে যুগের সভ্যতা, বিশেষ করে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও অষ্টাবক্র মুনির যুগে সভ্যতা অবশ্যই অনেক উন্নত স্তরের ছিল। আজকের যুগে সভ্যতা ক্ষয়িষ্ণু, কারণ বিজ্ঞান পাচ্ছে সভ্যতার চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা। আজকে বিজ্ঞানের উন্নতির মত, যদি সভ্যতাকেও উঁচুতে তুলে ধরা যায়, তাহলে উন্নতির চরম শিখরে ওঠা সম্ভব হবে।

(মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)

জাতি, ভাষা, ধর্মমত ও সংস্কৃতিতে বিশ্বজনীনতা

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হ'ল "জাতি (race), ভাষা প্রভৃতিতে বিশ্বজনীনতা"। যদিও মানুষের ভাষা, বর্ণ ইত্যাদিতে কিছু কিছু আপাত বৈষম্য রয়েছে, তথাপি মানুষের এই সকল অপরিহার্য বিষয়গুলি কিন্তু এসেছে একই উৎস থেকে, এইসব এসেছে সেই একক সত্তা পরমপুরুষ থেকে। ভাষাগত বৈষম্য, বর্ণগত বৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য আছে ঠিকই, কিন্তু এই সৰই বাহ্য ও আপাতদৃষ্ট। মুখের ভাষা নয়, আসলে হৃদয়ের ভাষা, সেন্টিমেন্টের ভাষাই শুণতে হবে।

কোন ভাষাই আদি ভাষা বলে দাবী করতে পারে না, তা সে ইংরেজীই হোক, বা তাগালগ হোক বা বাংলাই হোক। ইংরেজী ভাষা আদি ভাষা (original language) নয়। ৯০০ বছর আগে ইংরেজী ভাষা ছিল না। ১৫০০ বছর আগে বাংলা ভাষা ছিল না। ৮০০ বছর আগে অঙ্গিকা, মৈথিলী, অসমীয়া ভাষা ছিল না। আধুনিক ইংরেজী ভাষা হ'ল স্কচ,

পুরানো নর্মান্ডি, অ্যাংলো–স্যাক্সন, ব্রিটন, কেল্ট, ল্যাটিন ও গ্রীক কথ্যভাষার মিশ্রণ। এই সকল কথ্য ভাষাই মিলিত ভাবে জন্ম দিয়েছিল আধুনিক ইংরেজী কথ্যভাষা। 'আলফ্রেড দি গ্রেট্'-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় কোন স্বীকৃত শব্দভাণ্ডার ছিল না। এমনিভাবে দেখা যায়, ৰাংলা ভাষা সংস্কৃত ধাতু ও শব্দ, বিপুল সংখ্যাক ইংরেজী শব্দ, জাপানী, পর্তুগীজ, আরবীয় প্রভৃতি শব্দ দিয়ে তৈরী। এমনিভাবে তাগালগ ভাষা তৈরী হয়েছে ক্যান্টনীজ, চাইনিজ, ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ান শব্দ ও বেশ কিছু সংস্কৃত শব্দ নিয়ে।

ঠিক এমনিভাবে কোন জনগোষ্ঠীই তার রক্তের পুরোপুরি বিশুদ্ধতা দাবী করতে পারে না। হিটলার যে আর্য রক্তের বিশুদ্ধতা দাবী করতেন, সেটা বস্তুতঃ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই। এক ইয়ুরোপেই রয়েছে নানা জনগোষ্ঠী, যেমন নর্ডিক, ভূমধ্যসাগরীয় অ্যালপাইন, মঙ্গোলীয়ান, মঙ্গোলো–নিগ্রোয়েড প্রভৃতি। ভারতবর্ষে রয়েছে অস্ট্রিক, অস্ট্রিকো–নিগ্রোয়েড, দ্রাবিড়ীয়, মঙ্গোলীয়, মঙ্গোলো–নিগ্রোয়েড–এমনি সৰ জনগোষ্ঠী। সুতরাং কোন জনগোষ্ঠীই এই রক্তগত সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়। সর্বত্রই চলছে এই বিশ্বজনীন সংমিশ্রণ। বিশ্বের কোথাও একটা মৌলিক জনগোষ্ঠী বা ভাষা খুঁজে

পাওয়া যাবে না। মানব-সমাজ একটা একক সত্তা। সমাজের সকল দোষ গুণ সে-সব আমাদের সকলের। সৰ কিছু আমাদের সকলের আর সব খারাপগুলো অপরের-এরকম দাবী করা নির্বুদ্ধিতা।

এই বিশ্বে সকল সত্তাই দিব্যসত্তা-এটাই মানুষকে উপলব্ধি করতে হৰে। কেউই এই বিশ্বে একা বা অসহায় নয়। বিশ্বের সঙ্গে আমাদের রয়েছে ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। যেহেতু বিশ্বের সকল সীমিত সত্তার মধ্যে অসীমের ক্ষুধা রয়েছে তাই সকল মানুষকেই তাদের মনের পরিভূ বাড়িয়ে চলতে হবে। এটা তাদের অবশ্য করণীয়। সর্ববন্ধন মুক্ত পরম সত্তাই সৰার লক্ষ্য। মানুষকেও এমনভাবে মনের বিস্তার ঘটাতে হবে- যাতে সে সমস্ত সীমার ৰন্ধন অতিক্রম করে যায়। কারুর মনের মধ্যে কোন হীনম্মন্যতা বা মহাম্মন্যতা থাকৰে না-থাকা উচিতও নয়। যারা ব্যষ্টিগত বা জাতিগত শ্রেষ্ঠতা প্রচার করে, তারা পাপ কাজ করছে। তারা মানব- ধর্মের বিরোধিতা করছে। মাটি, জল, বায়ুর মত ধর্মও সকলের সাধারণ (common) সম্পদ। সবাইকেই ভূমাসত্তার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে হবে।

প্রখ্যাত আমেরিকান কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গের ভাষায়–

"There is only one man in the world

And his name is All-men

There is only one woman in the world

And her name is All-women.

There is only one child in this universe

And his name is All-children".

ঠিক এই কথাটিকেই অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এশিয়ার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে

সে জাতির নাম মানুষ জাতি

একই পৃথিবীর স্তন্যে পালিত,

একই রবি শশী মোদের সাথী।।"

সৈদ্ধান্তিক তত্ত্ব ও প্রয়োগ-ভৌমিক তত্ত্ব

যে সিদ্ধান্ত প্রয়োগভূমি থেকে আত্মপ্রকাশ করে তাকে স্বল্পায়াসেই বাস্তবে রূপায়িত করা যায়। সে সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাস্তবায়িত হৰে, তবে তা প্রচেষ্টা, সময় ও সংযোগের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু যখন প্রয়োগের দিকটা সিদ্ধান্ত তৈরী করার পরে আসে, তখন তা বাস্তবে রূপায়িত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

এই ধরণের সৈদ্ধান্তিক তত্ত্বের ব্যর্থতার চারটি কারণ। কারণগুলি নিম্নে প্রদত্ত হ'ল:

প্রথমটি হচ্ছে **ভণ্ড-মনস্তত্ত্ব** (হিপোক্রাইটস্ সাইকোলজি)। কপটাচারী সিদ্ধান্ত 'তৈরী করে ঠিকই কিন্তু তা প্রয়োগ-ভূমিতে অসিদ্ধ। তত্ত্বের নাম ভাঙিয়ে সে তার ও দলের স্বার্থ-সিদ্ধি করে। সুতরাং তা কখনোই বাস্তবায়িত হবে না। তা শুধুমাত্র লোক দেখানো। প্রাচীন যুগে, মধ্য যুগে ও এমনকি বর্তমান যুগেও অনেক সংখ্যায় ওই ধরণের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এর প্রবর্তকেরা কপট। এরা জনসাধারণকে বড় বড় কথা বলে

তাদের বিভ্রান্ত করে থাকে। এই ধরণের লোক সম্পর্কে সদাশিব বলেছেন 'লোক ব্যামোহ কারকঃ'। অর্থাৎ এরা জনগণের মনে রোগের সঞ্চার করে থাকে। সমস্যার সমাধান করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। মানব সমাজে অবক্ষয়, দুর্দশা ও অধঃপতনের এটাই প্রধান কারণ। এটাই মানব–সমাজের বর্তমান সংকটের মূল। এই ধরণের সিদ্ধান্ত অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে। এগুলোর পেছনে রয়েছে কপটের মনস্তত্ব কপটাচারীদের ৰৌদ্ধিক অমিতাচার (intellectual extravaganza)। তোমরা অবশ্যই সামাজিক স্তরে, অর্থনৈতিক স্তরে ও জীবনের বিভিন্ন স্তরে এই ধরণের বেশ কিছু সংখ্যক সিদ্ধান্ত দেখে থাকৰে। এটা শুধুমাত্র একটা বিশেষ দেশের সমস্যা নয়, সমগ্র বৌদ্ধিক জগতের সমস্যা। আমি সভ্যতার সংকট সম্পর্কে তোমাদের বলেছি যে, এই সংকটের কারণ হ'ল মার্জিত শয়তানদের ৰৌদ্ধিক অমিতাচার। উদাহরণ স্বরূপ যেমন **মিশ্র অর্থনীতি।** যাঁদের এই বিষয়ে জ্ঞান আছে তাঁরা সকলেই জানেন যে, এটি একটি প্রহসন মাত্র। অতীতে তা কোনও দিন বাস্তবায়িত হয়নি আর ভবিষ্যতেও হবে না। এটা মিথ্যার মার্জিত রূপ মাত্র। এর বাস্তবায়ন কখনই সম্ভব নয়। এর প্রবর্তকেরা এই সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নয়,

আর তারা ওয়াকিবহাল হতেও চাইবে না। কেননা, তাদের উদ্দেশ্য হ'ল অন্যকে ধোঁকা দেওয়া। অন্য একটি উদাহরণ হ'ল **শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।** এটি কখনো কার্যে পর্যবসিত হয়নি, হচ্ছে না আর হবেও না। আরেকটি হ'ল, **গণতান্ত্রিক সমাজবাদ।** একে সোণার পাথরবাটি বলা যেতে পারে। পাথরবাটি পাথরেরই হয়, সোণার নয়। এই কাজের পেছনে রয়েছে কপট বুদ্ধি। কোনও সিদ্ধান্তের অসাফল্যের চতুর্বিধ কারণের এটি অন্যতম।

পরবর্তীটি হচ্ছে–**তাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ব।** এখানে ভণ্ড–মনস্তত্ত্ব কাজ করে না। যখন কোনও তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত রচনা করে তখন সে বাস্তব জগতের দিকে তাকায় না। তারা দেখে না তাদের পায়ের তলায় কী আছে। তারা হাওয়ার ওপরে দুর্গ রচনা করে। কারণ বাস্তবের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। তর্কজীব্য দর্শনও এইরূপ। কিছুদিন পর সিদ্ধান্ত বিলুপ্ত হয়। ভারতের জনজীবনে বহু সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয়েছে, কোন কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োগের দিকও রয়েছে। তাই এগুলো কিছুটা পরিমাণে সার্থক হবে। কিন্তু তোমরা. লক্ষ্য করে থাকবে অন্য পাঁচটি আস্তিক্য দর্শনের তুলনায় ন্যায় দর্শন বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে অনেক দূর পরিক্রমা করেছে। তবে তা

কণাদের ন্যায় দর্শন নয়, গৌতমীর ন্যায় দর্শনের বেলায় প্রযোজ্য। তাই **গৌতমীয় ন্যায় দর্শনের** ওপর ভিত্তি করে কোনও বাস্তব কার্য সাধিত হতে পারে না। মধ্য যুগে বহু নৈয়ায়িক 'পাত্রাধার তৈল' কিংবা 'তৈলাধার পাত্র' এই নিয়ে গবেষণা করে গেছে। মূলতঃ এর সঙ্গে বাস্তব জগতের কোনও সম্পর্কই নেই।

তাত্ত্বিক মনস্তত্ত্বের (থিয়োরিটিসিয়ান সাইকোলজি) অন্য একটি দিক হ'ল: মানুষের জীবন ত্রিধা প্রকাশিত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। এরা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে না। এর ফলেই এরা সৈদ্ধান্তিক তত্ত্বকে প্রয়োগ-ভৌমিক তত্ত্বে রূপান্তরিত করতে পারে না। প্রথমতঃ সিদ্ধান্ত অবাস্তব। দ্বিতীয়তঃ বাস্তব রূপায়ণে প্রচেষ্টার অভাব।

তৃতীয়টি হ'ল-প্রয়োগের ক্ষেত্রে অক্ষমতা (ইএফিসিয়েন্সি ইন দি ফিল্ড অব্ এ্যাপ্লায়েন্স)। সিদ্ধান্ত যথাযথ হলেও অনভিজ্ঞতার ফলে অথবা অন্য কোনও ত্রুটির জন্যে তা বাস্তবে রূপায়িত হয় না। অনেক সময় কোনও মানুষ ব্যষ্টিগত জীবনে অনেক দক্ষ, কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে পুরোপুরি অসফল। ভারতে ৰৌদ্ধ যোগাচারের যুগে মহান সাধকগণ শুধু মাত্র ব্যষ্টিগত জীবনেই সফল ছিলেন। তাঁরা জগতের কথা

ভাবতেন না, আর মানুষকে বাস্তব জীবনে কর্মক্ষম করে তুলতে চেষ্টা করেন নি। তৎকালীন ভারতের জীবন সম্পর্কে যাঁরা সামান্যতম ওয়াকিবহাল আছেন–তাঁরা জানেন যে, সত্যিকারের সিদ্ধান্তের অনুপস্থিতির জন্যে (না তাত্ত্বিকদর্শন, না বাস্তব দর্শন) সেই সময় ৰৌদ্ধ সাধকগণ শংকরাচার্য কর্তৃক পরাস্ত হয়েছিলেন। এর ফলে শংকরাচার্যের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে এক বৌদ্ধিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই শূন্যতা ভারতের জন্যে অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। এই শূন্যতার স্থায়িত্বকাল ছিল– শংকরাচার্য থেকে চৈতন্য মহাপ্রভু পর্যন্ত।

চতুর্থটি হচ্ছে পরিবেশগত ৰাধা (এনবায়রণমেন্টাল ডিফিকাল্টি)। এখানে ভণ্ড মনস্তত্ত্ব, তাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অক্ষমতা কাজ করে না, কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয় তখন প্রবক্তা এক বিশেষ মানসিক পরিবেশে থাকে। সে মনের মধ্যে এক জগৎ সৃষ্টি করে সিদ্ধান্তকে নিজের মনেই প্রয়োগ করে। উদাহরণ স্বরূপ মার্কস্বাদ। প্রবর্তকের প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। তাঁর মানসিক পরিবেশে তিনি যে সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছেন– একদিক থেকে তা ঠিক। কিন্তু পৃথিবীর কঠিন মৃত্তিকা ও মানসিক পরিবেশ এক নয়। পৃথিবীর মাটি অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যখন সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ ভূমিতে আনা

হ'ল–তখনই তা অসফল হ'ল। ৰৌদ্ধিক পরিবেশে সিদ্ধান্ত অবশ্যই যথার্থ। কিন্তু প্রয়োগভূমিতে বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে তা মিল খায় না। উদাহরণ স্বরূপ তোমার মানসিক ক্ষেত্রে তুমি ধরে নিতে পার গঙ্গানদীতে জল নেই–তার পরিবর্তে রয়েছে দুধ। তখন তুমি সুস্বাদু মিষ্টি তৈরীর পরিকল্পনা করতে পার। আর এই মিষ্টি নিজেও খাওয়া যাবে ও বাইরেও রপ্তানি করা যাবে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে গঙ্গানদীতে মোটেই দুধ নেই। রয়েছে জল। সুতরাং এক বিশেষ ৰৌদ্ধিক পরিবেশে তৈরী সিদ্ধান্ত প্রয়োগ–ভূমিতে সম্পূর্ণ অসফল। যেখানে প্রথমে সিদ্ধান্ত আসে, তারপর আসে প্রয়োগের দিক সেখানে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন খুবই কঠিন।

এখন সেই দিকটা দেখা যাক–যেখানে সিদ্ধান্ত প্রয়োগ–ভূমিকে অনুসরণ করে। প্রথমে প্র্যাক্টিক্যাল বা রূপায়ণের দিক–তারপর সিদ্ধান্ত বা থিওরী। প্রথমে বাস্তব জগতকে পর্যবেক্ষণ করে প্রথমে তাকে অনুধাবন করা হ'ল– তারপর সিদ্ধান্ত তৈরী হ'ল। উদাহরণ স্বরূপ আপেল মাটিতে পড়ার পর সিদ্ধান্ত তৈরী হ'ল–সিদ্ধান্ত তৈরী হবার পর আপেল মাটিতে পড়ে নি। এইসব ক্ষেত্রে যেখানে সিদ্ধান্ত প্রয়োগভূমিকে অনুসরণ করে–সেখানে তা বাস্তবায়নযোগ্য হয়। সদাশিব

এইটা প্রথমে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভগবান সদাশিব ছোট বড় সব ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন। যেসব ঘটনার আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি–ঘটনার পেছনে কি কারণ রয়েছে–সে সম্পর্কে আমরা কমই জানি। তিনি প্রতিটি ঘটনার কারণ নির্ণয় করলেন, আর একটি সিদ্ধান্তের প্রবর্তন করলেন। তিনি–শিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্য, নৃত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সবকিছুকে পর্যবেক্ষণ করে এদের পেছনে কী তত্ত্ব রয়েছে তা খুঁজে বের করলেন। যেমন, তিনি একটা বিশেষ নৃত্যের ধারাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর তিনি একটা তত্ত্ব দিলেন। তন্ত্রের ক্ষেত্রে, তাঁর প্রদত্ত তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে হাতে কলমে কর্মরত একজন বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটারী–নোট বুকের মত। একটা বিশেষ নৃত্যের উদাহরণ নেওয়া যাক। তিনি দেখলেন, এই নৃত্য মানুষের লিম্ফ্যাটিক গ্রন্থিগুলিতে স্পন্দন সৃষ্টি করে মানুষের পৌরুষ বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং নৃত্যটা যথাযথ বলে বিবেচিত হ'ল। এর নাম রাখা হ'ল 'তাণ্ডব'। 'তাণ্ডব' শব্দটি এসেছে 'তত্ত্ব' থেকে, 'তত্ত্ব' মানে লাফানো। যেহেতু এর দ্বারা 'তণ্ডু' অর্থাৎ লম্ফ সাধিত হচ্ছে– তাই এর নাম 'তাণ্ডব'। ঠিক এমনিভাবে, একধরণের নৃত্য মানুষের লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যান্ডগুলিতে কোমল স্পন্দন সৃষ্টি করে সেগুলিতে সংকোচন এনে মনে কোমল ভাব

(লাস্য) সৃষ্টি করে। লাস্যের তত্ত্ব অনুসারে তাই এটা যথার্থ। এই নৃত্যের নাম হ'ল ললিত নৃত্য।

মানুষের নানান ক্রিয়াকলাপের পেছনে যে মূল ভাৰ রয়েছে সদাশিব তা উপলব্ধি করে একটা তত্ত্ব দিলেন আর সেই তত্ত্ব মানুষের সামনে হাজির করলেন। সুতরাং, প্র্যাক্টিসের পর যে তত্ত্ব আসে তাই যথার্থ।

এখন যদি দু'টো তত্ত্বের যথাযথ ফলকে মিশ্রিত করা যায়, তাতে তার পরিণামে একটা নূতন সিদ্ধান্ত তৈরী হয়। এইভাবে একটা বিশেষ পরিণামভুক্ত ফলের সঙ্গে আর একটা সিদ্ধান্তকে মিলিত করা হলে আবার একটা বিশেষ প্রকারের সিদ্ধান্তের সৃষ্টি হয়। এইভাবে বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ছয় রাগ-ছত্রিশ রাগিণী তৈরী করা হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে সঙ্গীত-বিজ্ঞানের। এটা সফল হয়েছে কারণ এক্ষেত্রে তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত (থিওরী) গ্রহণ করা হয়েছে প্রয়োগের (প্র্যাক্টিস) পর। অপরপক্ষে তার্কিকের সিদ্ধান্তের (থিওরী) পর আসে তার প্রয়োগ (প্র্যাকটিস)। সদাশিব প্রবর্তিত তাণ্ডব-নৃত্যের 'তা' ও পার্বতী-প্রদত্ত ললিত নৃত্যের 'ল নিয়ে তৈরী হ'ল নূতন সিদ্ধান্ত-যার নাম রাখা হল 'তাল'।

এইভাবে চলতে থাকে। তোমরা এই ব্যাপারে সৰ সময় নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখৰে কোনটা আগে আসছে, কোন্টা পরে আসছে। যদি সিদ্ধান্ত পরে আসে তাহলে তা বাস্তবায়িত হৰেই। কেবল প্রচেষ্টা ও কেমনভাবে হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করবে কতটা সময়ে তা বাস্তবায়িত হৰে। চেষ্টা অধিক হলে অল্প সময়েই বাস্তবায়িত হৰে।

আমি তোমাদের আগেই বলেছি, সভ্যতা সংকটজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। আর এই সংকটের প্রধান কারণ, আগে সিদ্ধান্ত (থিওরী) তৈরী করে নেওয়া হচ্ছে, প্রয়োগের (প্র্যাক্টিস) দিকটা আসছে তার পরে। এইটাই প্রধান কারণ।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ভণ্ড মনস্তত্ত্ব যা কপটদের বৌদ্ধিক অমিতাচারমাত্র (intellectual extravaganza)-তা থেকে অবশ্যই দূরে থেকো।

প্রগতি ও পঞ্চবেদনা

প্রগতি কী? "প্রকৃষ্ট গতি ইত্যর্থে প্রগতি।" যেখানে গতি আছে আর সেই গতি শুভের দিকে তাকেই ৰলে প্রগতি। যেখানে গতি শুভের সঙ্গে যুক্ত নয় তা হ'ল অধোগতি। যেমন পাহাড়ের ওপরে ওঠা আর নামা দু'টোই গতি কিন্তু বিভিন্ন দিকে।

প্রকৃত অর্থে 'প্রগতি' কাকে বলে? সাধারণতঃ লোকে প্রগতি কথাটাকে বৈজ্ঞানিক প্রগতির অর্থেই ব্যবহার করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রগতি অর্থে প্রগতি হতেও পারে নাও হতে পারে। প্রগতির আসল অর্থ হ'ল শুভের দিকে গতি।

মানুষের অস্তিত্ব ত্রিস্তরীয়। মানুষের জাগতিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক দিক আছে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই গতি আছে। আর এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রগতি হতে পারে। এখন প্রধান বিচার্য হ'ল এই গতির লক্ষ্য কী? অর্থাৎ জীবনের মূল উদ্দেশ্য কী? গতি যা শুভ থেকে পরম শুভের দিকে নিয়ে যায় তাই হ'ল প্রগতি।

এখন পরীক্ষা করে দেখা যাক, সাধারণ ভাবে জাগতিক ক্ষেত্রে 'প্রগতি' ৰলতে কী বোঝায়। অনেকে মনে করেন, গোরুর গাড়ির জায়গায় মোটর গাড়ি অথবা মোটর গাড়ির জায়গায়

বায়ুযান বা বায়ুযানের জায়গায় রকেট ব্যবহার করাটা হ'ল প্রগতি। অন্য দৃষ্টান্তের কথাই ধরা যাক। লোকে গোড়ার দিকে ভূমিতেই শয়ন করত। তারপরে খাট ব্যবহার করতে শুরু করল, তারপরে স্প্রিংয়ের গদিতে শুতে লাগল। একেও 'প্রগতি' বলে। প্রাচীন কালে লোকে তালপত্রে অথবা ভূর্জপত্রে লিখত। এখন লোকে কাগজের ওপর লেখে। এইসব ক্ষেত্রে প্রগতির বৈশিষ্ট্য হ'ল সম্পদভোগের মাধ্যমে আরো বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করা। ভাষান্তরে, অধিক সুখ ভোগই প্রগতির অপর নাম। মাটিতে ঘুমানোর চেয়ে স্প্রিং দেওয়া গদিতে ঘুমোনো অনেক সুবিধাজনক। অনুরূপভাবে, বায়ুযানে ভ্রমণ অনেক একঘেয়েমি লাঘব করে দেয়। সুতরাং প্রগতিকে মনে হয় জাগতিক সুখভোগের অগ্রদূত। এই সুখ শুধু জাগতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও এই সুখ পাওয়া যায়। আর কে সেই সুখভোগের কর্তা?-না–মন। মনই শারীরিক ও মানসিক সুখভোগ করে। আধ্যাত্মিক সুখের অনুভূতিটা হ'ল মানসাধ্যাত্মিক। সেখানেও এই সুখ আংশিক ভাবে মানসিক।

সৰ রকম সুখই মনের মাধ্যমে উপভোগ করা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানসিক তরঙ্গের পরিভূতেই এইসব সুখের

উৎপত্তি। শারীরিক সুখের মতন মানসিক সুখকেও মন উপভোগ করে। তাই তারা সবই স্পন্দনাত্মক। স্পন্দনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ধনাত্মক ও ঋণাত্মক এই দু'টি বৈপরীত্যের সমাবেশেই বজায় রাখা সম্ভব হয়। অর্থাৎ যে হারে সুখ উৎপন্ন হৰে ঠিক সেই হারেই সুখহীনতা বৃদ্ধি পাৰে। এইভাবে আমরা দেখি জাগতিক স্তরে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রগতি মানুষের সুখ ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোরুর গাড়ির বদলে মোটর গাড়ির ব্যবহার যেমন শারীরিক ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়, সেই সঙ্গে অধিকতর দুর্ঘটনার ঝুঁকিও থেকে যায়। বায়ুযানের ব্যবহার ভ্রমণ-স্বাচ্ছন্দ্য ৰাড়িয়েছে কিন্তু একই হারে ঝুঁকিও বেড়েছে। এইভাবে আমরা দেখি জাগতিক স্তরে ভৌত সম্পদের উপভোগের মাধ্যমে যে সুখ তা একই হারেই দুঃখানুভূতির ঋণাত্মক অনুভূতির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করছে। জাগতিক স্তরের তুলনায় মানসিক স্তরের ক্ষেত্র অনেক বেশী বিস্তৃত।

মনের মাধ্যমে সুখের উপলব্ধিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়-

১। অনুকূল-বেদনীয়ম্

২। প্রতিকূল-বেদনীয়ম্

৩। অবেদনীয়ম্

৪। নিরপেক্ষ-বেদনীয়ম্

৫। আপ্লুত-বেদনীয়ম্

অনুভূতির মাধ্যমে গৃহীত এই পাঁচ রকম সুখ মানুষ উপলব্ধি করে। সব প্রগতিরই এই অনুভূতির মধ্য দিয়ে উপলব্ধি হয়। যেখানেই প্রগতি সেখানেই-এক অথবা একাধিক বা এই সমস্ত অনুভূতিগুলোই অভিব্যক্তি লাভ করে। জাগতিক প্রগতির ক্ষেত্রে আমরা প্রধানতঃ শারীরিক সুখ হিসেবে দু'টো অনুভূতিকে প্রকাশ হতে দেখি। শারীরিক সুখ বলতে শারীর-মানসিক। প্রকৃত পক্ষে মানুষের শারীরিক কোনো সুখানুভূতি নেই। শারীরিক সুখ বলতে স্নায়ুগুলির বিশ্রাম। সেই অবস্থায় স্নায়ুগুলো এক ধরণের মানসিক তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলে। তাকেই বলে 'অনুকূল-বেদনীয়ম্।" যেখানে স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনা থাকে সেখানে অন্য আরেক ধরণের স্পন্দন উৎপন্ন হয়। সেই ধরণের মানসিক তরঙ্গ হল "প্রতিকূল-বেদনীয়ম্" অনুভূতি। বাকি তিনের অভিব্যক্তি শারীরিক স্তরে দেখা যায় না। সুতরাং জাগতিক স্তরের যে প্রগতি তাকে শুধু অনুকূল-

বেদনীয়মের উপলব্ধিকেই বোঝায়। ঠিক এরই পাশে অবস্থান করে যে প্রতিকূল-বেদনীয়ম্ তাকে আমরা হয় বুঝতে পারি না আর না হয় উপেক্ষা করি। অনেক সময়ই সচেতনভাবেই আমরা প্রতিকূল-বেদনীয়কে অস্বীকার করি, আর অনুকূল-বেদনীয়মের ঘরেই সৰকিছু বসিয়ে আর প্রতিকূল বেদনীয়মের ঘরে শূন্য বসিয়ে মনে করি আমরা এগিয়ে চলেছি। প্রকৃত পক্ষে আমরা যদি দু'টো দিকই দেখতে পারতুম তাহলে দেখতুম যে লাভের ঘরে শূন্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে জাগতিক স্তরে সত্যি কোনো প্রগতি নেই। এ যেন বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কর্মচারীদের মাইনে ৰাড়ানোর ব্যাপারটা। সরকারের পক্ষ থেকে কার্যতঃ মেনে নেওয়া আর অধিকতর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো। এটাকে কি অর্থনৈতিক প্রগতি বলা চলে? নিশ্চয়ই না। কারণ এতে লোকের ক্রয়- ক্ষমতা বাড়ে না। এটাকে জাগতিক ক্ষেত্রে প্রগতি বলে ধরে নিলে খুৰই ভুল করা হবে।

এখন মানসিক স্তরের কথায় আসা যাক। এই স্তরে চারটি অনুভূতিকে অভিব্যক্তি লাভ করতে দেখা যায়। যেমন- অনুকূল-বেদনীয়ম্, প্রতিকূল- বেদনীয়ম্, অবেদনীয়ম্ আর নিরপেক্ষ-বেদনীয়ম্। জাগতিক স্তর থেকে এই স্তরের পার্থক্য

আর একটা বিষয়ে সূচিত হয়, মানসিক স্তরে স্নায়ুর বিশ্রামের কোনো ব্যাপার নেই। মানসিক স্তরের প্রশন বৈশিষ্ট্য হ'ল যে মানসিক ক্ষুধার বৃদ্ধি। মানসিক ক্ষুধা বাড়ে কিন্তু তা পরিমাণগত নয়। সুতরাং মানসিক স্তরে অনুকূল-বেদনীয়ম্ বলতে মনের এমন একটা অবস্থা যখন সে আরো খাদ্য পেতে চায়। স্বভাবতই সেই সঙ্গে প্রতিকূল-বেনদীয়ম্ বাড়ে-যাতে মানসিক তরঙ্গের ভারসাম্য বজায় থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। প্রাচীনকালে মানুষ যখন বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল তখন তাদের মধ্যে আবেগ-অনুভূতির ক্রিয়াটাও কম ছিল। যার মধ্যে বুদ্ধির অভাব আছে তার মধ্যে আবেগের সঞ্চার কম হয়। খুব উন্নত ৰৌদ্ধিক গুণসম্পন্ন মানুষ আবেগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণ। তারা অকারণে অপ্রয়োজনীয় সমস্যার সৃষ্টি করে আর রাতের পর রাত বিনিদ্র রজনী যাপন করে। এইভাবে অনুকূল-বেদনীয়ম্ ও প্রতিকূল-বেদনীয়মের সহায়তায় বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে।

তুলনামূলক ভাবে দুঃখ অথবা সুখের অনুভূতিরহিত অবস্থাকেই বলে নিরপেক্ষ-বেদনীয়ম্। এটা মানসিক চাপ বা দমনের ফলশ্রুতি। এটা মনের এক অস্বাভাবিক অবস্থা। এই

অবস্থা পাঁচ মিনিট অথবা দশ মিনিট, পাঁচদিন অথবা দশদিন অথবা কয়েক বছরও থাকতে পারে। কিন্তু যখন এই অবস্থাটা সরে যাবে তখন তা হয় অনুকূল-বেদনীয়ম্, নয়তো প্রতিকূল-বেদনীয়ম্ রূপে দেখা দেবে। সুতরাং নিরপেক্ষ-বেদনীয়ম্ অর্থাৎ মানসিক চাপ বা দমন কাউকেই প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে না।

আর 'অবেদনীয়ম্' কী? সাধারণ পরিস্থিতিতে অবেদনীয়কে এক অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে ধরা যায়। এই অবস্থায় হয় স্নায়ুকোষের ক্রিয়া সমূহ বন্ধ হয়ে যায় নয়তো জোর করে সেগুলোকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। অন্য পরিস্থিতিতে মানসিক স্তরে স্থূল জাগতিক অস্তিত্বকে 'অবেদনীয়ম্' অস্বীকার করে-স্থূল জাগতিক সত্তাকে সে স্বীকার করে না। এটা এক ধরণের ভ্রান্তি। যার ফলে জাগতিক অস্তিত্বকেই মিথ্যা বলে মনে হয়। একে এক ধরণের আত্মপ্রতারণা বলা চলে। 'অবেদনীয়ম্' অবস্থাটা মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয়। এই ধরণের মনোভাব শূন্যবাদকেই প্রতিষ্ঠা করে। জীবনের লক্ষ্য শূন্যবাদ নয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত 'অবেদনীয়মের' ফল-স্বরূপ অনুকূল-বেদনীয়ম্ অথবা প্রতিকূল-বেদনীয়ম্ দেখা দেয়। ভেতর থেকে

বা বাইরে থেকে মনে কোন প্রচণ্ড আঘাত এলে এই জিনিসটা দেখা দেয়।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে মানসিক স্তরেও প্রগতি নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে দু'-হাজার বছর আগে ভারতের লোকেরা বৌদ্ধিক দিক থেকে আজকের তুলনায় অনেক পেছিয়ে ছিল। এটাও ঠিক যে আজকের ভারতবর্ষের লোকেরা যে মানসিক সুখভোগ করছে প্রাচীনকালে এর তুলনায় তা খুৰই কম ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে আজকের মানুষ যে মানসিক উদ্বেগ ভোগ করছে, প্রাচীনকালের মানুষ ততটা উদ্বেগ ভোগ করেনি। এইভাবে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিকগুলো বিচার করলে আমরা দেখি যে ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও প্রগতি নেই।

এখন আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপারটা বিবেচনা করা যাক। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 'অনুকূল-বেদনীয়ম্' ও 'প্রতিকূল-বেদনীয়ম্' নেই। এমনকি অবেদনীয়ম্ ও নিরপেক্ষ-বেদনীয়ম্ নেই। এর কারণ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য-বস্তুটা কোন সীমিত সত্তা নয়। তাই এখানে অনুকূলবেদন, প্রতিকূলবেদন, অবেদন বা নিরপেক্ষ-বেদন স্তরগুলোও নেই। এক্ষেত্রে একটা অনুভূতিই শুধু অভিব্যক্তি লাভ করে। আর তা হ'ল আপ্লুতবেদন। এই যে

আপ্লুতবেদনের অভিব্যক্তি এটা হয় অপার্শ্বিক (nonlateral) নয়তো বহুপার্শ্বিক (multilateral)। অভিব্যক্তি যখন কোন দিকেই হচ্ছে না অর্থাৎ অপার্শ্বিক (nonlateral) হয় তখন কোন প্রতিক্রিয়ার (reactive momenta) সৃষ্টি হয় না। আর যদি এই অভিব্যক্তি বহুপার্শ্বিক অর্থাৎ অধ্যাত্ম-তরঙ্গ যখন সর্বদেশিক বা সর্বপার্শ্বিক হয় তাকে সংস্কৃতে বলা হয় সংস্কৃতবেদন। অপার্শ্বিক বা অভিব্যক্তিকে (non-lateral expression or non-subjective vibration) সংস্কৃতে বলা যেতে পারে 'বহুপ্রজ্ঞা-বেদন' বা আরও ভালভাবে বলতে গেলে 'ভাসোত্তর বেদন'। আপ্লুত- বেদন এখানে সূচ্যগ্র-মানস-অস্তিত্বের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল থাকে। ভাসোত্তর- বেদনের বৈশিষ্ট্য এই যে, দোলকের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এখানে ঋণাত্মক গতির কোন স্থান নেই। ঋণাত্মক গতি না থাকায় গতির প্রতিটি অংশই প্রগতি। সুতরাং বিয়োগের কোন প্রশ্ন নেই, সবটুকুই যোগ। এই গতি হ'ল ঋণাত্মক দিক থেকে ধনাত্মক দিকে। আর এই কারণে এটাই হ'ল যথার্থ প্রগতি।

সংস্কৃত-বেদন হ'ল আসলে মানসাধ্যাত্মিক। যদিও এটা ঘটে মানসিক স্তরে তবু আধ্যাত্মিক স্তরকেও তা স্পর্শ করে। জাগতিক স্তরে কোন প্রগতি নেই, তার কারণ ধনাত্মক আর

ঋণাত্মক উভয় মিলে ফলাফল শূন্য থাকে। বৌদ্ধিক স্তরেও তাই। কিন্তু মানসাধ্যাত্মিক স্তরে প্রগতি সম্ভব। আর এই প্রগতি কিছুটা পরিমাপ করাও যায়। কিন্তু বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক স্তরে যে প্রগতি তা পরিমাপ করা যায় না, কারণ পরিমাপ করার কোনো মানদণ্ড নেই।

সংস্কৃতে তথাকথিত জাগতিক প্রগতির যে স্তর তাকে 'কাম' আর বৌদ্ধিক প্রগতির যে স্তর তাকে বলা হয়েছে 'অর্থ'। 'অর্থ' কথাটা দু'টো অর্থে ব্যবহৃত হয়। একদিকে এটা 'তাৎপর্য' বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, অন্যদিকে সম্পদ বা টাকা–যা আমাদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনে লাগে–এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানসাধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে প্রগতি তাকে বলা হয় ধর্ম। আর বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রগতিকে বলা হয় মোক্ষ। মানসাধ্যাত্মিক প্রগতি ও আধ্যাত্মিক প্রগতির মধ্যে তফাৎ হ'ল এই যে, প্রথমটাকে মাপা যায় কিন্তু পরেরটাকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। 'কাম', 'অর্থ', 'ধর্ম', 'মোক্ষ'-এসবের মিলিত নাম হ'ল 'চতুর্বর্গ। মানুষের উচিত ধর্ম ও মোক্ষকেই জীবনের লক্ষ্য করা–কাম ও অর্থকে নয়। কারণ কেবল ধর্ম ও মোক্ষের মাধ্যমেই সত্যিকারের প্রগতি সম্ভব।

আগেই বলেছি যে জাগতিক ও বৌদ্ধিক স্তরে কোন প্রগতি নেই। তাহলে কি এই দু'টি স্তরের সৰ প্রচেষ্টা ৰন্ধ করে দিতে হবে? তাহলে কি ভৌত-বিজ্ঞানের উন্নতির কোন প্রয়োজন নেই? না, তা নয়। আমরা এইসব ক্ষেত্রে উন্নতির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাৰ। কেবল মানব-সমাজের ওপর, মানবমনের ওপর ও এমনকি মানবদেহের ওপর এইসব প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

জাগতিক স্তরে তথাকথিত প্রগতির ক্ষেত্রে যা ঘটে তা হ'ল জীবনের গতি অতিরিক্ত সংবেগ লাভ করে-যা মানুষের স্নায়ুর ওপর তার প্রভাব ফেলে। তা করোটিকার কাজ ৰাড়িয়ে দেয়। ফলে হৃদ্যন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই যতই জাগতিক প্রগতির জন্যে ভৌতবিজ্ঞান এগিয়ে যায়, হৃদ্যন্ত্রের ও মনের ব্যাধিও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষেরা তাদের স্নায়ুর ওপরে অতিরিক্ত চাপের দরুন রাত্রে ঘুমোতে পারেন না। যেসৰ ব্যাধিগুলোকে দু'শ বছর আগেও মারাত্মক বলে মনে করা হ'ত, আজকের দিনে সেগুলো আর মারাত্মক নয়। সেগুলো আজ সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আজকের দিনে মারাত্মক ব্যাধি বলতে হৃদ্যন্ত্রের ও স্নায়ুর ব্যাধিকেই বোঝায়।

জাগতিক অধিক্ষেত্রে তথাকথিত প্রগতির এই হচ্ছে পরিণতি। ভবিষ্যতে মানুষের দৈহিক সংরচনাও এইসব বিষয়গুলির দ্বারা প্রভাবিত হবে। মানুষের স্নায়ুগুলো আরো দৃঢ় হবে আর করোটিকা বৃদ্ধি পাৰে। আর হাড়গুলো হয়ে যাবে সরু। মানুষের চেহারার পরিবর্তন এসে যাবে। মানুষের হাত-পা-গুলো হৰে সরু সরু। আর সেই তুলনায় মাথাটা হৰে অতিরিক্ত বড়। এই পরিবর্তন খুব শীঘ্র ও দ্রুতগতিতে হৰে।

তথাকথিত ৰৌদ্ধিক প্রগতি মনের ওপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করবে। স্নায়ুতন্ত্র ও মন এক জিনিস নয়। স্নায়ুকোষগুলো ভৌতিক, তাই তার সঙ্গে যেসৰ ব্যাধি সংযুক্ত থাকে-তাও ভৌতিক। যাকে আমরা পাগলামি বলি সেটা হয় স্নায়ুতন্ত্রের বিশৃঙ্খলা অবস্থা অথবা মানসিক বিশৃঙ্খলা অথবা দু'টোই। ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রে প্রগতির ফলস্বরূপ মানসিক আবেগ সমূহের মধ্যে অধিকতর সংঘর্ষ দেখা দেবে, আর যার ফলে মানসিক রোগ বৃদ্ধি পাবে। সমাজে উন্মাদদের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যাবে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বৌদ্ধিক প্রগতি কোন প্রগতি নয়। প্রকৃত প্রগতি হ'ল আধ্যাত্মিক প্রগতি। আধ্যাত্মিক পরিভূতে প্রতিক্রিয়া না থাকায়

কোন সংঘর্ষ দেখা দেবে না। কেবল সম্মুখ-গতি থাকৰে। আর এটাই হ'ল প্রকৃত প্রগতির বৈশিষ্ট্য।

আধ্যাত্মিক প্রগতি জাগতিক ও মানসিক ভিত্তিতে অবলম্বন করেই সম্ভব হয়। আর সেই কারণে জাগতিক ও মানসিক ভিত্তিকে স্থান-কালের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে প্রগতিশীলভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। আধ্যাত্মিক সাধককে জাগতিক ও ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার উপায় বের করতে হয়। ভবিষ্যতে যখন মানুষের স্নায়ুগুলো মোটা হয়ে যাবে আর মাথাটা বড় হয়ে যাবে, তখন সাধকদের জীবনেও পরিবর্তন দেখা দেবে। এর প্রভাব থেকে বাঁচার উপায় কি? উপায় হ'ল, স্কুল স্পন্দনগুলোকে সূক্ষ্ম স্পন্দনে রূপান্তরিত করা। যখন জাগতিক অধিক্ষেত্রের সুখ-দুঃখের স্পন্দনগুলো ভৌতমানসিক স্পন্দনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, তখন সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলো আর তত তীব্র হয়ে দেখা দেৰে না, যদিও জাগতিক ক্ষেত্র আগের মতই বিস্মৃত থাকৰে। এই পদ্ধতি মনকে প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে। যেহেতু স্থূল সুখভোগের প্রতি মানুষের সে রকম আকর্ষণ থাকবে না, সেহেতু সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক ভাবেই দুঃখের অনুভূতি থেকে মানুষ মুক্তি পাৰে। ঠিক একই

ভাবে, প্রতিক্রিয়ার সংবেগকে এড়াতে বৌদ্ধিক স্পন্দন-সমূহকে মানসাধ্যাত্মিক স্পন্দনে রূপান্তরিত করতে হবে। এতে মানসিক স্তরের প্রতিক্রিয়া থেকে মানুষ কিছুটা রক্ষা পাৰে। যার ফলে সুখ দুঃখের কোনটাই মনকে অভিভূত করতে পারবে না। এই অবস্থাটাকে গীতায় বলা হয়েছে- "দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন মনঃ, সুখেষু বিগত স্পৃহঃ"। সুখের আকাঙ্ক্ষা অনেক পরিমাণে কমে আসবে আর দুঃখের অনুভূতিও তার থাকবে না।

সুতরাং মানুষের প্রগতি ৰলতে একমাত্র আধ্যাত্মিক প্রগতিকেই বোঝায়। এই কারণে জ্ঞানীজনের আধ্যাত্মিক স্তরকেই প্রধান রূপে গ্রহণ করা উচিত। বাকি দু'টো স্তর অর্থাৎ জাগতিক ও বৌদ্ধিক স্তরকে শুধু আধ্যাত্মিক প্রগতির উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর জন্যে ব্যবহার করা উচিত। জাগতিক ও বৌদ্ধিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা-কালে সাধক অবশ্যই স্থূল স্পন্দনগুলোকে সূক্ষ্ম স্পন্দনে রূপান্তরিত করবেন। পদ্ধতির কথা আগেই বলা হয়েছে। এই রূপান্তরণ ক্রিয়া না চললে অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানী ব্যষ্টি মাত্রই মনে রাখবেন যে সূক্ষ্মতমের দিকে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের লক্ষ্য। সেই পরম কল্যাণঘন সত্তাকে লাভ করার জন্যে তাঁকে সতত

প্রয়াসশীল হতে হৰে। এটাই হ'ল প্রগতির একমাত্র উপায়। অন্য কোন উপায় নেই–

"ন্যান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।।

প্রাণ–ধর্ম

বিশ্বের বুকে ক্বচিৎ এমন কিছু মানুষ দেখা যায় যাদের অভ্যন্তরীণ চিন্তাধারা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বাহ্যিক আচার–আচরণ একই। হতে পারে, তাদের মধ্যে বহুলাংশে মিল রয়েছে, তবুও হুবহু এক–এমনটি দেখা যায় না। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার অনুযায়ী তাদের মানসিক সংরচনা, চরিত্র–বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে ও তদনুযায়ী তাদের বাহ্যিক আচার– আচরণে তার প্রতিফলন পড়ে। মানুষে মানুষে এই কারণেই আমরা প্রভেদ দেখতে পাই। ব্যষ্টিমানুষের যেমন তার নিজস্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্য থাকে, তেমনই একই ভৌগোলিক পরিবেশ, একই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক

আবেষ্টনীর মধ্যে যাদের জন্ম ও লালন-পালন, সেই জনগোষ্ঠী অপর জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্নতর গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। পরবর্তীকালের এই গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যগুলোই সমগ্র জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ভাবধারার সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে এতে করে একটা জাতীয় (national) স্বভাব তৈরী হয়। তা দিয়েই একটা গোটা জাতির (nation) মানস-প্রবণতা, বাহ্যিক আচরণ, জীবন ও সমাজের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী-এককথায়, একটা বিশেষ জাতীয় (national) দৃষ্টিকোণ গড়ে ওঠে-যা সেই জাতিকে (nation) অন্য জাতি (nation) থেকে এক পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এই কারণেই তাদের জগৎ ও জীবনের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ গড়ে উঠেছে। এই পার্থক্য যতখানি বাহ্যিক, তার চেয়ে অনেক বেশী অভ্যন্তরীণ। বৈয়ষ্টিক তথা সামূহিক জীবনে সুসংহত জীবনযাত্রা ও শিক্ষার মাধ্যমে মনের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে তুলতে পারা যায়। বৈয়ষ্টিক জীবনে মনোরাজ্যের এই যে এক অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা (internal discipline)-একেই বলবো ব্যষ্টিজীবনের প্রাণধর্ম। আবার যখন জাতীয় (national) গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলো এক বিশেষ পথ ধরে

প্রকাশিত হয়ে উঠছে–তখন তাকেই বলৰো জাতির (nation) প্রাণধর্ম।

ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা–সবগুলি দেশই পাশ্চাত্যের হলেও তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হুবহু এক–একথা বলা যায় না। আবার সমগ্রভাবে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের মানসিক ভাবধারা ও আচার আচরণে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আবার প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের চিন্তাধারা প্রাচ্যের অন্যদেশের চেয়ে বহুলাংশে পৃথক।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ তার নিজস্ব প্রাণধর্মের অনুশীলন করে আসছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ভারত অবশ্যই অন্তর্মুখী, স্বভাবগতভাবেই বাল্যকাল থেকে ভারতীয়েরা 'পরাভিমুখী'। প্রতিটি চিন্তা ও কাজকে তারা আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ মনে করেই তা করে থাকে। এর কারণ, প্রাচীনভারতে বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীরা ৫ বৎসর বয়সে গুরুগৃহে যেতো ও ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত গুরুগৃহে থেকেই সৎ, নিয়মনিষ্ঠ ও পবিত্র জীবন–যাপন করে বেশীর ভাগ পরাজ্ঞান ও যৎসামান্য অপরা–জ্ঞানের পাঠ নিতে হ'ত। এইভাবে ছাত্রজীবন শেষ হলে তারা গার্হস্থ্য–ধর্ম পালন করতো ও গৃহস্থ জীবনেও তারা পরা ও অপরা উভয় প্রকার বিদ্যাই

চর্চা করতো। এইভাবে জীবনের ৫০ বৎসর কেটে গেলে তারা গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতো যেখানে হ'ত কেবল পরাজ্ঞানের চর্চ্চা। এই কারণে সমগ্র ভারতীয় জীবনধারাটাই হয়ে পড়েছে আধ্যাত্মিক। এই অর্ন্তমুখী জীবনধারাই হ'ল ভারতের প্রাণধর্ম। আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় সমাজ জীবনের এতখানি গভীরে প্রবেশ করেছে যে এই দেশের কুখ্যাত নরঘাতক দস্যুর দলও ডাকাতি করতে যাবার আগে মা-কালীর কাছে পূজো দিয়ে যায়, কর্ম-সিদ্ধির জন্যে তারা মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করে ও মানত জানায়। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাও এই মূল প্রাণ-ধর্মের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলস্বরূপ, ভারতীয় বিদ্যার্থী হয়ে উঠেছিল শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী ও উন্নত আচরণপরায়ণ।

কোন ব্যষ্টি বা জাতির সঙ্গে খুব বড় রকম শত্রুতার সূক্ষ্ম উপায় হ'ল- সেই ব্যষ্টি বা জাতিকে প্রাণ-ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা। হয় জোর করে তার প্রাণ-ধর্মের অনুশীলনের অধিকার কেড়ে নেওয়া অথবা তার সামনে তার নিজস্ব প্রাণ-ধর্মের প্রতিকূল এক জীবনাদর্শ খাড়া করা। তাহলে তার শক্তি সামর্থ্য বিপথে চালিত হবে ও ফলস্বরূপ সে হয়ে পড়বে ক্রমাগত হীনবল। পাখীকে যেমন তার অবাধ স্বচ্ছন্দ-বিহারের

অধিকার কেড়ে খাঁচায় পুরে দিলে সে ধীরে ধীরে একটা দ্বিপদ প্রাণীতে পরিণত হয়, প্রাণধর্মের অনুশীলন থেকে বিচ্যুত মানুষের অবস্থাও হয় তদ্রুপ।

মোগল শাসন ও ভারতীয় প্রাণধর্ম: মোগলযুগে ভারতে রাজনৈতিক অত্যাচার যথেষ্ট হয়েছিল। মোগল ও পাঠান যুগের রাজা-বাদশাহরা প্রত্যক্ষভাবে না করে পরোক্ষভাবে ভারতীয় প্রাণ-ধর্মে আঘাত হানার চেষ্টা করেছিলেন। তবে উচ্চ রাজপদের প্রলোভন দেখিয়ে বা অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করেও ভারতীয় প্রাণ-ধর্মের খুব বেশী ক্ষতি তাঁরা করতে পারেন নি। এর কারণ হ'ল ইসলামিক সমাজ-জীবনের প্রাণশক্তি ইজিপ্ট, সাইবেরিয়া ও পারস্যের দেশগুলির সমাজ-জীবনের বিপরীতধর্মী তরঙ্গগুলিকে আত্মস্থীকরণের ফলে অনেকটা নিজেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই মুসলমান আক্রমণের পর ইসলামিক প্রাণধর্ম ভারতীয় প্রাণধর্মের পাশাপাশি বাস করেও এর বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি।

ব্রিটিশ শাসন ও ভারতীয় প্রাণধর্ম: ইংরেজ শাসকেরা ছিল সুচতুর। তাই প্রত্যক্ষভাবে তারা ভারতীয় প্রাণধর্মে আঘাত না হেনে এক কূটনৈতিক পথ অবলম্বন করলো। তারা দেখলো যে ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েম করতে গেলে

একদল দেশীয় সমর্থক গড়ে তুলতে হবে যারা হৰে জন্মের দিক থেকে ও শারীরিক বর্ণের বিচারে ভারতীয় কিন্তু আদব-কায়দায়, শিক্ষায়, রুচিতে ও সংস্কৃতিতে হৰে সম্পূর্ণ ইয়ুরোপীয়। তাই তাদের প্রাণধর্মের অনুশীলনে আঘাত হানার জন্যে তাঁরা নিজেদের দেশের অনুকরণে এমন এক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করলেন যার ফলে এদেশের মানুষ নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ল। ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি এদেশের গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতো, তা ৰন্ধ হয়ে গেল। বরং **পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার মোহে অন্ধ হয়ে এই দেশের যুব-সমাজও হয়ে উঠলো সন্দেহবাদী, জড়বাদী ও নাস্তিক। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কুফলে শিক্ষিত এমন একদল মানুষের উৎপত্তি হ'ল যারা না হ'ল ইংরেজ, না রইল ভারতীয়। এদেশের Indian Civil Service সম্বন্ধে জনৈক পণ্ডিত বলেছিলেন যে, এরা না রইল Indian না রইল Civil, না এটা হ'ল একটা সার্বিস্।** ভারতীয় মূল জনজীবন থেকে এরা হয়ে পড়ল বিচ্ছিন্ন। কারণ ভারতের অগণিত জনসাধারণের আচার-আচরণ, আদব-কায়দা, চিন্তা-চরিত্র থেকে এদের সব কিছুই ছিল পৃথক ধরণের। গ্রাম-ভারতের সরল নিরীহ

মানুষদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য বাবুর দল তাদের আপন জন ৰলে গ্রহণ করতে পারল না। সুচতুর ইংরেজ শাসক এমন কৌশল অবলম্বন করল যাতে করে এরা ভারতীয়দের চেয়ে ব্রিটিশ-শাসককেই বেশী আপন ভাবতে শুরু করলো। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল ও তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ সুদৃঢ় হ'ল।

ইংরেজ শাসন ও চৈনিক প্রাণধর্ম: চীন দেশেও ইংরেজ চীনবাসীর প্রাণধর্মকে নস্যাৎ করে দেয়। চীনের কুয়োমিন্টাং রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত চীনের জনসাধারণ ছিল সরল, শান্তিপ্রিয়, কর্মঠ ও ধর্মপরায়ণ। কিন্তু ইংরেজ জাতি, তাদের দেশে সস্তায় প্রচুর আফিং আমদানি করে সেই কর্মঠ ও ধার্মিক জাতিকে অলস ও কর্মবিমুখ করে তুলল। পরবর্তীকালে তাই প্রাণ-ধর্ম-বিচ্যুত চীনা জাতিকে কমিউনিজম্-এর পথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছিল। ইংরেজ জাতি নষ্ট করলো চীনাদের প্রাণধর্ম আর কমিউনিষ্টরা চীনাদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ইংরেজের আরব্ধ কার্যকে সুসম্পন্ন করে তুললো।

ধনতন্ত্র ও ভারতীয় প্রাণধর্ম: ধনতন্ত্র প্রাণধর্মের প্রতিকূলতা যদিও

প্রত্যক্ষভাবে করে না তবুও ধনতন্ত্রের সর্বগ্রাসী শোষণ মানুষকে সর্বস্বান্ত করে পথের ভিখারী বানিয়ে দেয়। এই ধরণের মানুষদের প্রাণ-ধর্মের সুষ্ঠু অনুশীলন করা কার্যতঃ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভারতীয় সমাজ-জীবনে সামন্ততান্ত্রিক যুগে শোষণ থাকলেও তা প্রাণধর্মের প্রতিকূলতা করেনি। কিন্তু বর্তমানে বৈশ্য-শোষণের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় প্রাণধর্মের অনুশীলন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। ভারতীয় প্রাণধর্মের এই সংকটের যুগেই জড়বাদী দর্শনগুলি মাথা তুলবার সুযোগ পাচ্ছে। তাই আনন্দমার্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শনে ধনতন্ত্রের বিনাশের কথা সরবে ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষের ন্যূনতম চাহিদাগুলির পূরণের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে ও সামূহিক সম্পদের সর্বাধিক উপযোগিতার দ্বারা ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের ভিত্তিতে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের দ্বারা এক আদর্শ অনুকূল সামাজিক পরিবেশ তৈরীর কথা বলা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি মানুষই আপন প্রাণধর্ম অনুশীলনের সমস্ত প্রকার সুযোগ পাবে।

কমিউনিজম্ ও ভারতীয় প্রাণ-ধর্ম: জড়বাদ কোন দেশেই কখনও মানবজীবনের ভিত্তি হতে পারে না। কারণ তাতে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ রুদ্ধ। অথচ কমিউনিজমের দার্শনিক ভিত্তি হ'ল এই জড়বাদ। কমিউনিষ্টরা এই ভ্রান্ত জড়বাদকে প্রচার করে মানব-ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। ভারতীয় প্রাণ-ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত এই কমিউনিজম্। তারা যদিও মানব- মুক্তি ও প্রগতির ফাঁকা বুলি কপচে চলেছে, তথাপি মানুষের কল্যাণ তাতে হতে পারে না। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোতে জড়বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর সমধিক জোর দেওয়া হয়ে থাকে। তাতে হয়তো দেশের ধনোৎপাদন বাড়তে পারে, সেদেশের মানুষদের আর্থিক সমস্যার কিছুটা সমাধানও হতে পারে। কিন্তু আর্থিক সমস্যার সমাধানই সকল সমস্যার সমাধান নয়। তাহলে পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে আজ কোন সমস্যাই থাকত না। মানুষ শুধুমাত্র উদর-উপস্থজীবীই নয়। সে আরও কিছু। সে হল ঈশ্বরের সন্তান। তার অনন্ত সুখের পিপাসা। তাই সীমিত ভৌতিক সম্পদের চাহিদার যোগানের দ্বারা তার অনন্ত ক্ষুধা মিটবার নয়। তাই তার প্রাণ-ধর্ম হবে এমন যা তাকে এই অনন্ত ক্ষুধার নিবৃত্তির পথ-নির্দেশনা দেবে। কমিউনিজমে

মানবিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। মানবাত্মাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আজকের কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে মানুষের অবস্থা হয়েছে ঠিক ডেয়ারী ফার্মের সযত্ন-পোষিত জন্তু-জানোয়ারদের মত।

আনন্দমার্গ সমগ্র বিশ্বের প্রাণধর্মের প্রতিষ্ঠা চায়: সমগ্র বিশ্বের প্রাণ-ধর্মের কথা বিবেচনা করে আনন্দমার্গের দর্শন রচিত হয়েছে। তাই আনন্দমার্গের শ্রুতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, সাধনা পদ্ধতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও শিক্ষা পদ্ধতি সর্বত্রই এই প্রাণ-ধর্মের প্রতিষ্ঠাকে সহজ করে তুলবে। একজন যথার্থ আনন্দমার্গী বৈয়স্টিক ও সামূহিক জীবনে যা কিছুই করুক না কেন, সমস্তই তার প্রাণ-ধর্মের অনুকূল। মায়াবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের মত আনন্দমার্গ দর্শন এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দেয় না। বরং এই জগৎকে আপেক্ষিক সত্য বলে মেনে নিয়ে এর অভ্যন্তরীণ সমস্যার মোকাবিলার জন্য সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি চালায়। প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য দুই-ই মানুষকে তার প্রাণ-ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে। তাই আনন্দমার্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শনে, যাতে কেউ অর্ধাহারে অনাহারে তিল তিল করে শুকিয়ে না মরে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হয়েছে।

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতিও প্রাণ-ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করে। ব্রিটিশ আমলে ভারতে তাই হয়েছিল। আনন্দমার্গ এই বিষয়ে সদা-সতর্ক। তাই আনন্দমার্গের শিক্ষাপদ্ধতি এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে মানুষের মূল প্রাণ-ধর্মকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আমাদের আশ্রমিক স্কুলগুলির শিক্ষাপদ্ধতি এই প্রাণধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। **আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকগুলির যুগোপযোগী পঠন-পাঠনকে যেমন যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনই শিক্ষার্থীর মনে যাতে শ্রদ্ধা, সৌজন্য, বিনয়, সম্ভ্রম, সামাজিক চেতনা বিকাশ লাভ করে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রছাত্রাদের মধ্যে এই গুণগুলির বিকাশ ঘটাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।** স্বাধীনোত্তর ভারতে এই ত্রুটিপূর্ণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কার হলে, ভারতীয় প্রাণধর্মভিত্তিক এক যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ভারতবর্ষ আজ অনেক অবাঞ্ছিত সমস্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত। দেশীয় প্রাণ-ধর্মের ওপর ভিত্তি করে এই ধরণের নূতন এক শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে ভারতের শিক্ষা- সংস্কারকেরা আজও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

পৃথিবীর সকল দেশই এইভাবে আপন আপন প্রাণ-ধর্ম অনুসারে আনন্দমার্গ দর্শনকে নিজের দেশে প্রয়োগ করতে পারে। আনন্দমার্গীয় দর্শনে এই ধরনের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

প্রঃ ১। জড় ও চেতনে তফাৎ কোথায়?

উত্তর: আমরা যাকে সাধারণতঃ জড় আখ্যা দিয়ে থাকি তা চৈতন্যেরই প্রকৃতিৰদ্ধ পাঞ্চভৌতিক রূপ মাত্র। জটিলতর জড়দেহ সোজাসুজি ব্রহ্মমনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে ব্রহ্ম মানসের অণুকেন্দ্র অনুমানসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অণুমানস জড়েরই প্রতিসঞ্চরকালীন অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম অবস্থা, যাতে জড়ের তুলনায় তমঃ প্রকৃতির প্রভাব কিছুটা কম। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই অনুমানস আসলে চৈতন্যের প্রকৃতিবদ্ধ অবস্থার আর একটি বিশেষ নাম মাত্র। এই অনুমানসের ওপর পরমাত্মতত্ত্বের প্রতিফলনই জীবাত্মা নামে খ্যাত। সুতরাং সে-ও

চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। চৈতন্য, মন বা জড় তিনই এক ধাতুতে গড়া। তফাৎ কেবল বন্ধনী শক্তির প্রভাব-সম্প্রয়োগের মাত্রাতে।

প্রঃ ২। জড়বাদের মনস্তাত্ত্বিক ত্রুটি কী?

উত্তর। মনের ধর্ম ব্যাপ্তির পানে ছুটে যাওয়া আর এই ব্যাপ্তি ঘটে একটি বিশেষ ভাবকে কেন্দ্র করে। জড়ের ভাব সীমিত, তাই জড়ভাবকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপ্তি-সাধনা করে শেষ পর্যন্ত তাকে হতাশ হতেই হবে- আনন্দ সে পেতেই পারে না। কারণ ধন-সম্পদ, বিষয়-সম্পত্তি, ভোজ্য- পরিধেয় কোনো কিছুই অনন্তভাবে তৃপ্তি মিটিয়ে কেউ পেতে বা ভোগ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, মানুষ তার অনন্ত ক্ষুধা জড়ভাবকে কেন্দ্র করে একটু বেশী দূর নিয়ে গেলেই অন্যের সাথে তার স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেবে। কারণ সে ক্ষেত্রে সে অধিক পরিমাণে ধন সম্পদ, বিষয়-সম্পত্তি বা ভোজ্য- পরিধেয় সংগ্রহ করতে গিয়ে অন্যকে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক ধন-সম্পদ, বিষয়-সম্পত্তি বা ভোজ্য-পরিধেয় থেকে বঞ্চিত করতে চাইবে!

যেখানে জড় ছাড়া অন্য কোন ভাব নেই সেখানে মানুষকে তার এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে সব সময়েই তার মনের ওপর চাপ দিতে হবে। মনের ওপর চাপ মানুষ সহ্য করতে পারে না। তাই, সে তা চায়ও না। যে বা যারা চাপ দেয় তাদের কিছুটা অতর্ক অবস্থায় দেখতে পেলেই এই বিক্ষিপ্ত-মানস মানুষেরা বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লবের পথই বেছে নেয়। জড়বাদ কিন্তু চাপ দিয়ে ভোগবৃত্তি নিরস্ত করবার পথটাকে একমাত্র পথ বলে মনে করে। আর তাই জড়বাদী সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষকে সদা-শঙ্কিত হয়ে, সর্বদাই একে অন্যের প্রতি সংশয়াকুল হয়ে অথবা গুপ্তচর বাহিনীর ওপর নির্ভর করে দিন কাটাতে হয়। আধ্যাত্মিক আদর্শ না থাকায় নৈতিক ভূমির দৃঢ়তা থাকে না। জড়বাদী দেশে বা সমাজে যে নৈতিকতা দেখা যায় সেটা আসলে পারস্পারিক স্বার্থ রক্ষায় একটা অপবিত্র চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আধ্যাত্মিক আদর্শ না থাকায় বিশ্বপ্রেম-ভিত্তিক পবিত্র নৈতিকতা সে সমাজে জাগতেই পারেনা। কারণ সর্বজীবের স্রষ্টা ঈশ্বর যেখানে অস্বীকৃত সেখানে পিতৃসত্তার অস্বীকৃতিতে বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কও অসিদ্ধ থেকে যায়।

কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক আদর্শ তথা আধ্যাত্মিক ভোগস্পৃহাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে। বিশ্বৈক ভাব তথা ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মানন্দ জড় পঞ্চভূতের মত সীমিত নয়। তাই একে নিয়ে ব্যাপ্তি-সাধনায় সিদ্ধ হলে অন্যের স্বার্থ বা অস্তিত্ববোধ আদৌ বিপর্যস্ত হয় না।

মানুষকে তাই আধ্যাত্মিক পথে চলবারই প্রেরণা দিতে হবে, অন্যথায় তার স্থায়ী উপকার করা যাবে না। যতক্ষণ না সেই আদর্শ সে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারছে ততক্ষণ তাকে উপযুক্ত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তার পরস্ব গ্রহণের লোভ সংযত করবার জন্যে সামাজিক বা বাহ্যিক চাপ অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই চাপটাই সবকিছু নয় ও আদর্শ গ্রহণ করবার পরে এই চাপটার প্রয়োজনও আর থাকবে না। যারা আধ্যাত্মিক আদর্শে বিশ্বাসী কিন্তু চাপ দেবার নীতি অর্থাৎ violence (চণ্ডনীতি) যাঁরা সমর্থন করেন না তাঁদের পক্ষে সাফল্যলাভ করা অসম্ভব। কারণ এই পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা খুবই বেশী যারা ভাল কথা শুণতে মোটেই রাজী নয়। তাদের ওপর সামাজিক বা বাহ্যিক চাপ দিতেই হবে, অন্যথায় কবে তাদের শুভবুদ্ধি জাগবে সেই আশায় বসে

থাকলে কোন কালেই সমস্যার সমাধান হবে না। জড়বাদের মত এধরণের অচণ্ড (non-violence) নীতি- ভিত্তিক অধ্যাত্মবাদও মানুষের কোনো কাজে লাগবে না যদিও তাদের কথাগুলো শুণতে খুব সুন্দর ও ঋষিজনোচিত, কিন্তু বাস্তবের কঠোর মাটিতে তার মূল্য এক কানাকড়িও নেই।

প্রঃ ৩। জাতিভেদ জিনিসটা কি একেবারেই মূল্যহীন?

উত্তর: না, জগতের কোনো জিনিসই মূল্য-রহিত নয়। অনগ্রসর বিজ্ঞানের যুগে যখন শিল্পমাত্রই ছিল উটজ (কুটীর) শিল্প তখন পরিবার বিশেষ পুরুষানুক্রমে একই জীবিকা নিয়ে থাকত। তার ফলে পুত্র-পৌত্র পরম্পরাগতভাবে একই শিল্পের দীর্ঘকাল অনুশীলন তথা গবেষণা করার ফলে শিল্প উৎকর্ষ লাভ করত। সুতরাং বৃত্তিগতভাবে পরিবার বিশেষকে চিহ্নিত করে' দেওয়া সে যুগে মন্দ জিনিস ছিল না। কিন্তু আজ যুগ পালটেছে। শিল্প আজ আর পরিবারগতভাবে সংরক্ষিত নেই। যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক বিস্তার ঘটায় তা' রাখাও সম্ভব নয়। তাই শিল্পগত জাতি বিভাগ আজকের দিনে একেবারেই অর্থহীন। তাছাড়া সে যুগে অর্থাৎ যে যুগে **শিল্পগত জাতি বিভাগের আবশ্যকতা ছিল তখনও উচ্চ-নীচ জাতিভেদের কোনো প্রয়োজন ছিল না।**

প্রঃ ৪। সমাজ জীবনের জন্যে সর্বদেশে, সর্বকালে বা সমাজের সকল শাখার জন্যে কি একটি বিশেষ অর্থনৈতিক মতবাদকে চরম বলে গ্রহণ করা যেতে পারে?

উত্তর: **না, সামাজিক আদর্শ তথা ব্যবস্থাগুলি মানুষের সর্বাত্মক বিকাশের কথা ভেবে তার দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তৈরী করতে হয়।** একটি বিশেষ দেশ, কাল বা পাত্রের কাছে যা' খুবই উপযোগী, পরিবর্তিত দেশ-কাল বা পাত্রের কাছে হয়তো বা তা' একেবারেই মূল্যহীন!

সমাজ একটি গতিশীল সত্তা, সে স্থিতিশীল নয়। তাই বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে যে আদর্শ তৈরী হয়েছিল অথবা যা একদিন সত্য সত্যই কল্যাণকর বলে গৃহীত হয়েছিল, সমাজের আগে চলার সঙ্গে সঙ্গে তার দেশ-কাল-পাত্রিক পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে আদর্শ অনেক পেছনে পড়ে যায় সে নীতি প্রাগৈতিহাসিক নীতিরূপে দূর অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। মার্কসবাদ-ই বল অথবা অন্য যে কোন সমাজ-আশ্রয়ী অর্থনৈতিক মতবাদই বল কাউকে অভ্রান্তরূপে বেশীদিন ধরে রাখা সম্ভব নয়, কারণ সামাজিক বা অর্থনৈতিক নীতিগুলি একটি বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রেই সর্বোচ্চ মূল্য বহন করে ও সেই বিশেষ দেশ-কাল-

পাত্রিক আবেষ্টনীতে তার প্রয়োগ-ভৌমিক সার্থকতা দেখে বা বুঝে অজ্ঞ লোকে মনে করে এই জিনিসটা বুঝি চিরকাল থাকবে- এই নীতিটা বুঝি একেবারেই একটা অভ্রান্ত জিনিস।

প্রঃ ৫। মানব সভ্যতাকে তথা মানুষের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে হলে আনন্দমার্গ ব্যতিরেকে অন্য কোন পন্থা নেই কেন?

উত্তর: একতাবদ্ধ মানবগোষ্ঠী সভ্যতাকে গড়ে তোলে, সম্মিলিত ৰাঁচবার প্রয়াসই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। সমাজ কিন্তু একটা গতিশীল সত্তা। তাই এর বেঁচে থাকাটা চলমানতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানে এক বিশেষ আদর্শ নিয়ে একই পথে একদল মানুষ চলেছে, সৰাইকে তাদের সঙ্গে তাদের সুখ- দুঃখের সমভাগী হয়ে একসঙ্গে চলবার আহ্বান জানাতে জানাতে- তাদের চলাই সার্থক, তারাই হয় মৃত্যুঞ্জয়ী।

এই দেশ-কাল-পাত্রগতভাবে দ্রুত-পরিবর্তনশীল জগতে কোনো বিশেষ আর্থিক বা রাজনৈতিক বা 'রেলিজন'গত মতবাদ স্থায়ীভাবে কারো লক্ষ্য হতে পারে না কারণ তারা বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রে জাত হয়, বিশেষ দেশ- কাল-পাত্রে

ধ্বংস হয়। একমাত্র পারমার্থিক সত্তা যা' দেশাতীত, কালাতীত ও পাত্রাতীত–তাকেই জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করলে ও সেই চলার পথের ছন্দ বুঝে জগতের প্রবৃত্তিমূলক কার্যাবলীকে পরিচালনা করলেই মানুষ

সর্বকালের জন্যে কল্যাণ লাভ করতে পারে। আনন্দমার্গ সেই কল্যাণেরই পথ, আর তাই সভ্যতা তথা অস্তিত্বকে বাঁচাতে হলে আনন্দমার্গ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। বহিরঙ্গিক তথা অনুষ্ঠানমূলক (ritualistic) ধর্মসমূহ, যাকে আসলে ধর্ম না বলে 'রেলিজন' বলাই অধিকতর সঙ্গত তা' যুগে যুগে, দেশে–দেশে ও পাত্রে–পাত্রে বদলে যেতে থাকে। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ থাকায় আর পাঁচটা আপেক্ষিক তত্ত্বের মত রেলিজন জিনিসটা বহু অনর্থ, বহু রক্তপাত, বহু পৈশাচিকতার সৃষ্টি করে মানুষজাতের অনেক অকল্যাণকেই ডেকে এনেছে। তাই রেলিজন মানুষকে শান্তির সন্ধান দিতে পারবে না।

সপ্তম খণ্ড

সূচীপত্র

বিশ্বজুড়ে এক জাতি আছে

বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই প্রকার সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি তাঁর অন্তহীন সৃষ্টিলীলা করে চলেছেন। সৃষ্টির প্রতি স্তরে, প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি পদক্ষেপে এই বৈচিত্র্যের মাধুর্য, বহুত্ব ও বিস্ময় বিরাজ করছে। সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চরের পথে সৃষ্টিধারার চরম পরিণত স্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের যে আবির্ভাব ঘটেছে, সেই মানুষের মধ্যেই বাহ্যতঃ রয়ে গেছে কত বহুমুখী বৈচিত্র্য, কত আপাত-পার্থক্য।

কোন দেশের মানুষের গায়ের বর্ণ কালো, দেহ দীর্ঘ, চোখের মণি কালো, চুল কালো, ওষ্ঠ মোটা, নাক বিস্তৃত, আবার কোন দেশের মানুষের বর্ণ শাদা, দেহ নাতিদীর্ঘ, চোখের মণি নীল, কিম্বা নাক উঁচু। চুল, চোখ, ত্বক, নাক, ঠোঁট, দেহসংরচনা ইত্যাদির মধ্যে এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মানুষের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের পার্থক্য ও আশ্চর্য বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য দেখে মানুষ বিস্মিত হয়। বিস্ময়ের সে চমক তার মধ্যে ভাবনার জাগরণ তোলে। সে ভাবে শাদা মানুষ হয়ত

বা কালো মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ, কালো মানুষ হয়ত জন্তু জানোয়ারেরই এক উন্নত স্তর। বৈচিত্র্যের এই রহস্যকে ভেদ করতে না পেরেই মানুষ একদিন জাত্যাভিমান তত্ত্ব (Racial Supremacy) প্রচার করেছে। মানুষ মানুষকে নির্মম হৃদয়হীনতায় ঘৃণা করেছে ও মানব-সমাজে ডেকে এনেছে বর্বর অসভ্যতার রণরক্ত রিরংসা আর অশ্রুঝরা দিনের গ্লানি। আজও সেই অজ্ঞতার অভিশাপ ইয়ুরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা বা রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশে ঘটে চলেছে। কিন্তু এই জাত্যাভিমান কি বিজ্ঞান-সম্মত? -কি মানবধর্ম-সমর্থিত? নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান কী বলে? মানুষের উৎসস্থান কী? নানা বর্ণের মানুষ কি নানা ধরণের উৎস-স্থান হতে উৎসারিত, না তাদের পূর্বপুরুষ ছিল এক? নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান বলে, মানুষের পূর্বপুরুষ এক। সেই একই উৎস থেকে আজকের আর্য-অনার্য, মঙ্গোলিয়ান ও নিগ্রোরা জন্ম নিয়েছিল। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান সেই পূর্বপুরুষের নাম দিয়েছে অস্ট্রালোপিথেসিন (Australopithecine)। আজ থেকে প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর আগে এই শ্যামলী ধরণীর আরণ্যক পরিবেশে সুদূর অতীতে যে মানব শিশুর জন্ম হয়েছিল তার আবির্ভাব-লগ্ন ছিল এক মঙ্গল-মুহূর্ত। অস্ট্রালোপিথেসিনের দু'টি

শাখার একটি শাখায় জন্ম নিয়েছিল শিম্পাজী ও ওরাং ওটাং আর অন্য শাখায় জন্মেছিল জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ।

এদের প্রথম আর্বিভাব ঘটেছিল জাভাদ্বীপ ও প্যালেষ্টাইনের মধ্যবর্তী বৃহৎ ভৌগোলিক পটভূমিতে। অস্ট্রালোপিথেসিন থেকে ধীরে ধীরে মানুষ তার মানব-আকৃতি লাভ করেছে কিন্তু এই মহাপরিবর্তন একদিন বা এক শতাব্দীতে ঘটেনি, ঘটেছে অতি ধীরে। নৃতত্ত্ববিদ্রা তাঁদের সূক্ষ্ম বিচারের `দৃষ্টি দিয়ে তাদের দু'য়ের মধ্যবর্তী স্তরের আর এক ধরণের স্পেসিস্ (species)-এর কল্পনা করেছেন যারা অস্ট্রালোপিথেসিনও নয় আবার ঠিক মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিও পুরোপুরি অর্জন করেনি। এই মধ্যবর্তী স্তরের জীবকে তাঁরা নাম দিয়েছেন হোমো-ইরেক্টাস (Homo-Erectus)। এদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে জাবা, চীন, পূর্ব আফ্রিকা ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। সেই অজ্ঞাত অতীতে পৃথিবীর বুকে যেদিন প্লেইস্টোসিন (Pleistocene) যুগ বিরাজ করছিল সেদিন হোমো-ইরেকটাসরা (Homo- Erectus) এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। সবকিছুই চরৈবেতির নিয়ম অনুযায়ী এগিয়ে চলে। ধরাপৃষ্ঠের পরিবেশ ও প্রকৃতির অবস্থায় যুগে যুগে বড় পরিবর্তন এসেছে। এসব পরিবর্তনের ফলে কত লক্ষ লক্ষ ধরণের প্রাণীকে পৃথিবী থেকে

চির-অবলুপ্ত হয়ে যেতে হয়েছে। এই অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী হোমো-ইরেকটাসকেও পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হয়েছে। আজ আর পৃথিবীর কোথাও তাদের চিহ্ন নেই। কিন্তু তাদের অবলুপ্তির পূর্বে তারা দিয়ে গেছে আর এক ধরণের উন্নত ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ বংশধরকে যারা আজ মানুষ নামে পরিচিত। নৃতত্ত্বের ভাষায় যাদের বলা হয় হোমো-স্যাপিয়েনস্ (Homo-Sapiens)। এই হোমো-স্যাপিয়েনস্ (Homo-sapiens)-রাই আজকের পৃথিবীর সকল মানুষের প্রথম পূর্বসূরী।

হোমো-ইরেকটাস (Homo-Erectus)-দের বিভিন্ন গ্রুপ ছড়িয়ে পড়েছিল নানান দিকে। এদের কোন দল অধিকতর প্রকৃতির প্রতিকূলতার আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আর কোন কোন দল অধিকতর অনুকূল পরিবেশে বাস করার সুযোগ পেয়ে উন্নত প্রাণী মানুষের জন্ম দিয়েছিল। যারা মানুষের জন্ম দিল শেষ পর্যন্ত তারাও বেঁচে থাকতে পারল না, কারণ পৃথিবীর প্রকৃতির পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্গে পরবর্তীকালে তারা আর মানিয়ে চলতে পারেনি।

প্রথম মানুষ বা হোমো-স্যাপিয়েনস্রাও এক স্থানে স্থাবর জীবনযাপন করেনি। তারাও অধিকতর নিরাপদ, সুখকর ও

সহজতর জীবনের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর দিদিগন্তে। তারা ইয়ুরেশিয়া থেকে আর্কটিক সাগর পর্যন্ত, পরে বেরিং প্রণালী থেকে মেলানিন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আবার সেখান থেকে তারা ছুটে গিয়েছিল নবজীবনের সন্ধানে, নবদিগন্তের আঙ্গিনায় বাসা বাঁধতে। এমনি করে সেই এক হোমো-সাপিয়েনস্রা ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর নানা স্থানে। সেদিন কিন্তু বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া হোমো-সাপিয়েনদের আকারে দেহগত, বর্ণগত দিক থেকে এত বেশী পার্থক্য ছিল না। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, যত দীর্ঘ দিন ধরে তারা নানান্ ধরণের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে লাগল তত তাদের দেহ, বর্ণ, আকার ও আঙ্গিকের মধ্যে অধিক থেকে অধিকতর বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকলো। প্রাকৃতিক পরিবেশ এমনিভাবে মানুষের মধ্যে আনলো বৈচিত্র্য।

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয় এখানে আছে বরফাচ্ছন্ন মেরু প্রদেশ, আছে ঊষর ধূসর জ্বলন্ত খাঁ খাঁ মরুভূমি, আছে দিদিগন্ত বিস্তৃত গর্জন-মুখর অশান্ত নীলসমুদ্র, আর আছে নীরব নিথর বিপুল পাহাড়-পর্বতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। কোথাও নদী বইছে- তাদের দুই ধারে জেগে উঠেছে নদীবিধৌত বিশাল সমতলক্ষেত্র, কোথাও ভূ-ভাগ

বেষ্টিত জল-বলয় কলকল ছলছল শব্দে লীলায়িত হচ্ছে। এমনি ধরণের চার বিপরীতমুখী প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষকে পড়তে হয়েছে। এই বিপরীত পরিবেশে থেকে মানুষকে বিশেষ বিশেষ ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ বিশেষ সমস্যা ও প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের সংরচনায়ও মানুষের পার্থক্য এসে গেছে ঢের।

যেখানে সূর্যের উত্তাপ বেশী সেখানে সূর্যালোকেতে 'আলট্রা-বায়োলেট রে'-র (Ultra-violet ray) পরিমাণও থাকে অধিক। সূর্যালোকের উত্তাপে কেন এত তারতম্য হচ্ছে সেটা সকলেই ভৌগোলিক জ্ঞানের দ্বারা অবগত হতে পেরেছে। যেখানে সূর্যালোক তির্যকভাবে এসে পড়ছে সেখানে সূর্যের উত্তাপ হয় কম, আর যেখানে যত বেশী সোজাসুজিভাবে পড়ছে, সূর্যের তাপ সেখানে তত প্রখর। অতিরিক্ত গরম-প্রধান স্থানে শাদা রঙের মানুষদের বসবাস করতে কষ্ট হয় খুবই। তার কারণ হ'ল ত্বকের মধ্যে মেলানিন (Melanin) নামক রাসায়নিক পদার্থ যদি কম থাকে তবে সেই ধরণের ত্বক অধিক সূর্যতাপ সইতে অপারগ হয়। আর ত্বকে এই মেলানিনের আধিক্য হলে গাত্র-বর্ণও হয় জেট-ব্ল্যাক বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মেলানিন

(Melanin)-এর পরিমাণ কম হলে তার ত্বকের বর্ণও হবে শাদা।

আর যদি কখনও শাদা চামড়ার মানুষ কোন কারণে উত্তপ্ত পরিবেশে অধিকদিন বাস করে তবে তাদের গায়ের রং হয়ে যায় ব্রাউন। ১৯৩৯-৪০ সালের যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যরা যখন ভারতে এসেছিল তাদের গায়ের রং অতিরিক্ত সূর্যতাপে ব্রাউন হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ ছিল ব্রিটিশ সৈন্যদের ভারতের উত্তপ্ত পরিবেশের সঙ্গে সমতা রক্ষা (adjust) করার জন্যে তাদের গাত্র-ত্বকেও সূর্যালোকের প্রখরতা- ধারণোপযোগী রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। যার ফলে তাদের ত্বকে মেলানিন-এর ভাগ কিছুটা বেড়ে যায় ও চামড়ার রঙও ব্রাউন হয়ে যায়।

উত্তপ্ত স্থানের লোকদের চোখের মণির রঙও হয় কালো! তার কারণ প্রখর সূর্যালোকের ঝলসান আলোকছটাকে সহ্য করার জন্যে চক্ষুৰলয়ের রাসায়নিক সংঘটনেও অধিকতর মেলানিনের প্রয়োজন হয়, ফলে তাদের চোখের মণির রঙ-ও হয় কালো।

ঠিক উত্তপ্ত স্থানের লোকদের নাকের ছিদ্রও হয় বড় ও নাসিকাগ্র হয় তুলনামূলকভাবে প্রসারিত। কেন এমনটি হয়? কারণ বাইরের প্রখর উত্তাপ দেহের বায়ুকেও করে তোলে উত্তপ্ত। দেহের তাপ বেড়ে গেলে ভেতরের উত্তপ্ত বায়ু দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। ঘন ঘন উত্তপ্ত ভারী নিঃশ্বাস দ্রুত বেরিয়ে আসার কারণে নাসিকাগ্রের পরিধিও যায় বেড়ে। এই কারণে নাকের সম্মুখ ভাগও প্রসারিত হয়ে যায়।

যারা খুব শীত প্রধান স্থানে বসবাস করে তাদের দেহের ভেতরে ফ্যাটি টিসু (fatty tissue) গড়ে ওঠে। এই ধরণের টিসু শরীরের উত্তাপ ধরে রাখতে সুবিধা করে। আর তাদের নাসিকা উন্নত হলেও নাসিকার ছিদ্রপথ হয় খুব ছোট। এর কারণও রয়েছে। এক দমে যদি অধিক পরিমাণ তীব্র শীতল হাওয়া ভেতরে প্রবেশ করে, তবে ফুসফুস ও কন্ঠনালী অনিবার্যভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। প্রকৃতি তাই এমন সুন্দরভাবে শীতপ্রধান মানুষদের দেহ তৈরী করেছেন যে সেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের সময় একসঙ্গে নাক দিয়ে অধিক পরিমাণ হাওয়া প্রবেশ করতে পারে না। তাই শীতপ্রধান দেশের মানুষদের নাকের ছিদ্র হয় ছোট।

এমনিভাবে প্রকৃতির পরিবেশ ও আবহাওয়ার বৈচিত্র্য অনুসারে মানুষের দেহসংরচনায়ও পরিবর্তন এসেছে। কোন মানুষের গায়ের রঙ হয়েছে খুব কালো, কারও বা দুধে আলতায় মেশানো রঙ, কারও বা রঙ পীত, কারও বা শ্যামবর্ণ। সেই হোমো–স্যাপিইয়েনরাই এমনি ভাবে নানা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে পড়ে আজ চারটি প্রধান রেস (race)-এ ভাগ হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে তারা একই উৎস থেকে উৎসারিত। সেই অস্ট্রালোপিথেসিন থেকে Homo-Erectus, তারপর Homo-Sapiens। তারাই আজ শাদা, কালো, পীত ও শ্যামবর্ণে বিভক্ত হয়ে তথাকথিত নানা জাতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মেঘনা, গঙ্গা, পদ্মা, ভাগীরথী–এদের সবারই উৎসস্থল সেই গঙ্গোত্রীই।

পৃথিবীতে মুখ্যত চার ধরণের racce বা জাতি আজ রয়েছে– (১) আর্য, (২) অস্ট্রিক, (৩) নিগ্রো ও (৪) মঙ্গোলিয়ান।

আর্যরা পশ্চিম এশিয়া থেকে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর চর্তুদিকে। কৃষ্ণসাগর থেকে দানিয়ুৰ উপত্যকা, পরে মধ্য ও পশ্চিম ইয়ুরোপ পর্যন্ত এরা অভিযান চালায়। ভূমধ্যসাগরের তীর ধরে এরা ইরান, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইজিপ্ট, উঃ আফ্রিকা

ও স্পেনে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। পশ্চিম ফ্রান্স থেকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, পরে আফগানিস্তান, সিন্ধু নদীর উপত্যকা, লোহিত নদীর উপত্যকা, কোরিয়া ও জাপান–সর্বত্র এরা ছড়িয়ে পড়ে।

মঙ্গোলয়েডদের প্রধান বাসস্থান ছিল চীনে। এরপর এরা ছড়িয়ে পড়ে আর্কটিক সাগর থেকে বেরিং প্রণালী ও শ্বেতসমুদ্র পর্যন্ত। এশিয়ার বিভিন্ন পর্বতমালার জন্যে পশ্চিম দিকে ওরা সহজে যেতে পারেনি। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে তাই তারা যাত্রা করেছে। এরা চীন থেকে দক্ষিণ দিকেও চলতে থাকে। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, জাবা, বালী, বোর্ণিয়া, ফিলিপাইন, জাপান প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জসমূহের অস্ট্রোলয়েড আদিবাসীদের সঙ্গে এরা মিলিত হয়।

নিগ্রোরা বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে আফ্রিকা, নিউগিনি অঞ্চলে ও ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ তটরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। দক্ষিণ ভারতে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে, মালয়ে, ফিলিপাইন ও সমগ্র মালয়েশিয়ায় এদের পাওয়া যায়।

এই বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন শাখা নিয়েই মানুষের সমাজ। এদের মধ্যে কাউকে শ্রেষ্ঠ বা কাউকে নিকৃষ্ট বলার মধ্যে

কোন যৌক্তিকতা নেই। যেটুকু বাহ্যিক শারীরসংরচনাগত পার্থক্য আমরা দেখে থাকি তা তাদের ভেতরের মানব-সত্তাকে প্রভাবিত করেনি। স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম, যন্ত্রণা, ক্ষুধা, আনন্দ-এসৰ অন্তরের জৈবিক ও মানসিক অনুভূতিগুলি সৰ দেশের সব বর্ণের সর্বকালের মানুষের মধ্যেই রয়েছে। একথা ঠিক যে ছোটনাগপুরের কোন এক অখ্যাত পাহাড়ী গ্রামের অর্ধনগ্ন, অশিক্ষিত রমণীর অন্তরে যেমন তার সন্তানের প্রতি মাতৃত্বের স্নেহ-বাৎসল্য রয়েছে, নিউইয়র্কের অভিজাত পাড়ার কোন শিক্ষিত পরিবারের কোন জননীর অন্তরেও তার সন্তানের প্রতি তেমনই মাতৃহৃদয়ের মমতা উৎসারিত হয়ে চলেছে। হৃদয়ের এই অন্তঃসলিলা ভাবধারা তো সবারই মধ্যে প্রবহমান। দুঃখে তো সকলেই কাঁদে, সুখেও সকলেই আনন্দিত হয়। হয়তো বিভিন্ন ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অন্যান্য পরিবেশে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বিশেষ ধরণের জীবনযাপনের-তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি মানসিক প্রবণতার আধিক্য দেখা দেয়, কিন্তু মূলগত বিচারে তাদের মানস ধাতু একই ভাব ও চেতনার খাত বেয়ে জীবন পথে এগিয়ে চলেছে। একই পরম প্রেরণা ও এষণা নিয়ে তারা

জীবনের হাসি-কান্নার ও জীবন মরণের খেলা খেলে চলেছে। তাই এদের মধ্যে মূলগতভাবে কোন পার্থক্য নেই।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানবজাতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা মিলে মিশে বিভিন্ন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। আলপাইন, মেডিট্যারেনিয়ান-শ্বেত জাতির দুই শাখা হেলেনিক সভ্যতার, সুমেরীয় সভ্যতার ও ইজিপ্টের সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। নর্ডিক ও দ্রাবিড় শাখা সৃষ্টি করেছে ভারতীয় সভ্যতার। পীতজাতি সৃষ্টি করেছে চীন ও জাপানের সভ্যতা। আমেরিকান সভ্যতার সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে রেড ইন্ডিয়ানরা। কালো জাতির লোকেরাও বসে নেই। অন্যান্য জাতির তুলনায় তাদের মানব সভ্যতায় তেমন বেশী অবদান নেই। এর কারণ তাদের জাতিগত নিকৃষ্টতা নয়। তথাকথিত সভ্য সমাজ রাজনৈতিক স্বার্থে এদের সভ্য হওয়ার সুযোগ করে দেয়নি। শুধু তাই নয়, ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক পরিবেশ তাদের জীবনকে কখনও অন্তর্মুখী হতে দেয়নি। সমুদ্র-ঘেরা আফ্রিকা মহাদেশের বুকে আজও সাহারার আগুন জ্বলছে, আজও নিবিড় অরণ্যের ঘন অন্ধকার তাদের চলার পথকে দুর্গম করে রেখেছে। প্রকৃতির এই বিরুদ্ধতা তাদের জীবনকে অন্তর্মুখী হতে সুযোগ দেয় নি। তাই অতীতে তারা বড় সভ্যতা গড়তে পারে নি। কিন্তু

তাদের মধ্যেও মানবিক সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে। শুধু সেই সম্পদগুলিকে আজ উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে।

পৃথিবীর প্রতি দেশের জনগণের মধ্যেও বিভিন্ন Race-এর মিশ্রণ রয়েছে। এই ভারতে আর্য, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো চার প্রধান জাতিরই মিশ্রণ ঘটেছে। ফিলিপাইনের বর্তমান জনগোষ্ঠীও গড়ে উঠেছে নিগ্রো, মঙ্গোলীয় ও আর্য ইত্যাদির মিশ্রণে। অবশ্য সেখানে মঙ্গোলীয় জাতির প্রাধান্য বেশী রয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্গণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, আজকের ফিলিপাইন জাতি গড়ে উঠেছে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, চীন, আফ্রিকা ও আরব দেশের লোকেদের সংমিশ্রণে। ঠিক তেমনই আজকের জাপানী জাতি গড়ে উঠেছে আমুর নদীর তীরবর্তী অঞ্চল হতে আগত এ্যানুস নামক শ্বেত জাতির শাখা, কোরিয়া থেকে আগত পীত জাতির এক মঙ্গোলীয় শাখা আর মালয় ও ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত এক সংকর জাতির (যাদের গায়ের রং ছিল Brown-black) মিশ্রণে। চীনে এসে মিলেছে মঙ্গোলীয়া, দক্ষিণ রাশিয়া ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী। আজকের মহাচীনের জনগণ এদেরই এক মিশ্রিত সংস্করণ। জার্মান জাতিকে হিটলার একদিন এ্যারিয়ান

সুপ্রিম্যাসির (Aryan Supremacy) আভিজাত্য ও মহামন্যতার মাদকতায় মাতাল করে যুদ্ধের অগ্নিস্তূপে ঠেলে দিয়েছিলেন। তাঁর সদম্ভ উক্তি ছিল, Aryans are not to be ruled but to rule. জার্মান জাতির এমন উগ্র ও অন্ধ আর্য–আভিজাত্য কি নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের দিক থেকে গ্রহণীয়? নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে আজকের তথাকথিত জার্মান জাতি এক নয়। অনেক জাতির সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছে। এমনই ভাবে খুঁজে দেখলে দেখা যাবে যে পৃথিবীতে এমন একটিও কোন বৃহৎ জাতি নেই যাদের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেনি। তাই Racialism-এ purity of blood কথাটা বলা অর্থহীন। কারণ সত্যিকথা বলতে কি 'There cannot be any purity of blood, rather blood is always pure.' ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে বাঙালীদের মধ্যে। রাঢ় দেশেই বাঙালী জাতির জন্ম হয় আর্য, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রোদের রক্তের মিশ্রণে। বিহার, ওড়িষ্যা, বর্তমান বাঙলাদেশ, উত্তর প্রদেশের কায়স্থ গোষ্ঠীর লোক এই বাঙালী জাতির অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ ভারতেও অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে এসে মিশল নিগ্রো রক্ত ও তৈরী হ'ল (অস্ট্রিক নিগ্রো = দ্রাবিড়) দ্রাবিড়রা।

যুগে যুগে, দেশে দেশে দূর অতীতের অজানা অধ্যায়ে এমনই করে মানুষে মানুষে ঘটেছে মিলন, মিশেছে এক রক্ত অন্য রক্তের সঙ্গে, ও সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তৈরী হয়েছে আজকের তথাকথিত নোতুন নোতুন অনেক জাতি। মানুষের চিরন্তন যাযাবরী মন তাকে টেনে নিয়েছে এই বিশ্বের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে–এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে। একাধিক কারণে মানুষ তার গণ্ডিবদ্ধ জীবনের অচলায়তন ভেঙ্গে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে ও একে অন্যের সঙ্গে মিশেছে। তাদের এই মিশবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ–

(১) জীবন রক্ষা ও প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে লড়বার জন্যে,

(২) ক্ষত্রিয়দের পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ, জয়–পরাজয়ের ও রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে,

(৩) ধর্মীয় সম্পর্কের আন্তরিক আকর্ষণে,

(৪) ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে,

(৫) ব্যবসা–বাণিজ্য ও পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে ও

(৬) ভাষা ও সাংস্কৃতিক আদান–প্রদানের পথে।

এসব কারণের জন্যেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একে অন্যের কাছে এসেছে। আর মানুষ তার সহজাত প্রেরণার তাগিদেই একে অন্যের সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশেছে। এই সাযুজ্য, সামীপ্য ও সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট হয়েছে আজকের তথাকথিত বিভিন্ন জাতি।

শেষ পর্যন্ত তাদের এই মেলামেশার সার্থক পরিণতি ঘটেছিল বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি আন্তঃবৈবাহিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে মিশে গেছে ও ধীরে ধীরে তথাকথিত নোতুন জাতির সৃষ্টি করেছে। যেমন দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রো, ইয়ুরোপীয়ান ও ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ত্রিজাতির রক্ত মিশ্রণ ঘটে' নোতুন এক জাতির সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক তেমনই কলম্বিয়া ও মেক্সিকোতে ইয়ুরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে আজকের এ্যাংলো–ইন্ডিয়ান (Anglo- Indian) গোষ্ঠী জন্ম নিয়েছে। ঠিক এমনিভাবে সমস্ত দেশেই এক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য জনগোষ্ঠীর রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে।

নাসিকা, চক্ষু, চুল, দেহের দৈর্ঘ্য বা বাহ্যিক অন্যান্য আপাত– পার্থক্যগুলিকে তাই বড় করে দেখা কখনই উচিত নয়।

মানবসমাজ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও বহুর মধ্যে একের সাধনাই করে চলেছে। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ৰাধা, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ৰন্ধন, ভৌগোলিক ব্যবধান ও দুর্গমতা, আচার বিচারের বিধি-নিষেধ, এদের কোন কিছুই মানবসমাজের অখণ্ড লক্ষ্যের দিকে ধীর ও সুনিশ্চিত গতিতে এগিয়ে চলার বেগকে রুদ্ধ করে দিতে পারেনি। তাই বর্ণবৈষম্য, জাত্যভিমান, উগ্র জাতীয়তাবাদ বা প্রাদেশিকতাবাদ-এসব আপেক্ষিক তত্ত্ব বা সমাজ-দর্শন কোনটিই ক্রমপ্রসারমান মানবসমাজের জয়যাত্রাকে রুদ্ধ করতে পারেনি। আজ জাতীয়তাবাদের জীর্ণ প্রাচীরগুলি খসে খসে পড়তে শুরু করেছে। উদার মুক্ত বন্ধনহীন বিশ্ব-দিগন্তের অসীমে আজকের নব জাগরিত মানুষ অখণ্ড মানব সমাজের মঙ্গলঘট স্থাপন করতে চায়। পৃথিবীর সব দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মিলনের রাখি বেঁধে এক সাথে, এক সুরে, এক হানয়ে বলতে চায়-

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি
একই পৃথিবীর স্তন্যে পালিত
একই রবি-শশী মোদের সাথী।

সূচীপত্র

এই অভেদের সুর, এই অখণ্ড ঐক্যের এমন পরিপূর্ণ ঔদার্যের আহ্বানই মানবাত্মার বাণী–মনুষ্যত্বের শাশ্বত পরিচয়।

মানুষের সমাজ এক ও অবিভাজ্য–১

মানুষের উৎপত্তির উৎস ও তার গতির পরিসমাপ্তি একই। একই সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়ে একই সত্তায় মিলে যাওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই পৃথিবীর যত মানুষ তাদের সবার মৌলিক উপাদান হ'ল চৈতন্য সত্তা। সৰাই 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', মানুষের তাই কোন ভেদ–বিভেদ নেই। Fundamentally all men are equal. কিন্তু বহির্জগতে আমরা দেখে থাকি মানুষে মানুষে কলহ চলছে–

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দু
ঘোর–কুটিল পন্থা তাহার লোভ–জটিল ধন্ধ"।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ-ভগ্নাংশ নিয়ে কত না মারামারি, কত না হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিরোধ, দেশে দেশে বিরোধ, আজ ঘরে ঘরে সংগ্রাম। পৃথিবীতে কত না যুদ্ধ হয়ে গেল! কত না মানুষের রক্তে এই পৃথিবীতে নদী বয়ে গেল! তৰে কি করে বলতে পারি যে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, কোথায় তবে সেই যোগসূত্র, কোথায় তৰে একতা? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে মানুষের মনস্তত্ত্বের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে, কারণ ঐক্য যেটুকু রয়েছে তা অন্তর জগতে। বাইরের পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন সংস্কারের জন্যে তাদের বাহ্যিক মন অভিভূত হয়ে যায়, সমাজের আরোপিত সংস্কারের পরিণতিতে এক মানুষ অপর মানুষকে ঘৃণা করতে শুরু করে; কিন্তু যতই না বিরোধ করুক, যতই না বিদ্বেষ থাক, তা সৰ বাইরে, ভেতরে সৰাই একে অপরের সঙ্গে অনুভব করে নিগূঢ় আকর্ষণ, এই আকর্ষণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। ভূমামানসে যত বস্তু উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে যদি কোন সামঞ্জস্য-বিধায়ক শক্তি কাজ না করত তাহলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই সংরচনা চুরমার হয়ে যেত। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই সংরচনাকে ঠিক রাখবার জন্যে প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি ব্যাষ্টির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বিদ্যমান। প্রতিটি অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে

বিকশিত-আত্মা মানুষ-প্রত্যেকে একে অন্যকে আকর্ষণ করে চলেছে। যে বৃহৎ প্রেমের দ্বারা তিনি প্রতিটি অণুসত্তাকে নিজের সাথে বেঁধে রেখেছেন, সেই বৃহৎ প্রেমের তরঙ্গে, তাঁর রস-সমুদ্রে বয়ে চলেছে তাঁরই ক্ষুদ্র বিকাশ প্রাণীরাও। তারাও জন্মগত-সূত্রে সেই প্রেমের অধিকারী হয়েছে। তাই মনে রাখতে হবে-Attraction is the law of nature. It is not negative repulsion, rather repulsion is negative attraction. মানুষে মানুষে যে বাহ্যিক জগতে বিভেদ দেখতে পাই তা আর কিছুই নয়, এই নেগেটি এ্যাট্রাক্সান্ (Negative attraction)। বিভেদ করতেও তো সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়। তাছাড়া কোন বিভেদই চিরকালের জন্যে জীবন্ত থাকতে পারে না। আজকের বিবাদ আবার কালকের মৈত্রী। "আবাদ করে বিবাদ করে সুবাদ করে তারা।" ধর্মে ধর্মে লড়াই হয়েছে। আবার সে লড়াই গেছে থেমে, তাদের মধ্যে হয়েছে মিলন। ভাষা নিয়ে সংগ্রাম হয়েছে, আবার তারা মিলে-মিশে জন্ম দিয়েছে আর এক মিশ্র ভাষার।

তাই মানুষের যে বাহ্যিক পার্থক্য তাকে বড় করে' না দেখে দেখতে হবে তার অন্তর্নিহিত ভাব-ঐক্যটিকে। বিভিন্ন কারণে যে বিভেদ, যে মনোমালিন্য আজ সমাজে বিদ্যমান,

মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণের তাগিদে সে বিভেদকে দূর করতে হবে- এই কার্য সাধন করতে হলে জনগোষ্ঠীর জীবনধারার বহুমুখীতার মধ্যে, বিভিন্নতার মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে সাধারণ সূত্র (Common point)-গুলোকে-সেগুলোকে উৎসাহ দিতে হবে আমাদের। আর যেখানে যেখানে বিভেদ (Points of differences) রয়েছে সেগুলোকে কোনদিন উৎসাহ দেওয়া উচিত হবে না। আচার-আচরণ, খাদ্য, ভাষা, পোশাক ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে যে অমিল ও অনৈক্য রয়েছে সেগুলোকে গুরুত্ব দিলেই বিরোধ বিসংবাদ আরও বেড়ে উঠবে। জোর করে বিভিন্নতার বিষয়গুলোকে এক করতে গেলেও বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। তাই আমাদের অবলম্বন করতে হবে ধনাত্মক পথ-ঋণাত্মক নয়, আমাদের নীতি হওয়া উচিত-Points of unity should be encouraged and points of differences should be discouraged. এই নীতি অবলম্বন করলে মানুষের মধ্যে যেমন একতা বৃদ্ধি হৰে তেমনি অনৈক্যের মাত্রা হ্রাস হতে থাকবে ধীরে ধীরে। আগেই বলা হয়েছে যে কোন অনৈক্য স্থায়ী নয়, তাই এদের উৎসাহ না দিলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক মিশ্রণ ও আকর্ষণের মাধ্যমে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ঐক্যসূত্র মানব সমাজ গ্রহণ করে নেবে।

একথা সৰ সময়ই মনে রাখতে হবে, সমাজ কল্যাণ ও ঐক্যের জন্যে বিভেদ-সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোকে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়। যেখানে পার্থক্য রয়েছে সেখানে কিছু না বলাই হৰে বুদ্ধিমানের কাজ। যদি একান্ত কিছু বলতেই হয় তবে বলা উচিত এইসব পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাবার উপযুক্ত সময় এখন নয়। যেমন ধরা যাক্, অনেকে আজ রাষ্ট্র-ভাষার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান কিন্তু এটা কি ভাষা নিয়ে লড়াই করবার উপযুক্ত সময়? ক্ষুধা, বেকারী, দুর্ভিক্ষ, রোগ ও অভাবের তাড়নায় ভারতের কোটি কোটি মানুষ এখন না খেতে পেয়ে মরছে। এই সময় এই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা দরকার, কিন্তু তা না করে যারা এইভাবে গুরুত্বহীন সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে আরও সমস্যার সৃষ্টি করেছেন তারা মানবতার শত্রু, জাতীয় ঐক্যের নাম করে দেশকে ছোট ছোট বিরোধী শক্তির সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পরিণত করে মানবতার বড় ক্ষতি করে চলেছেন। দেশের উন্নতি তথা একতার জন্যে সাধারণ ঐক্যসূত্রগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে, সাধারণতঃ যেগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি:-

(১) সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র (Socio-economic sphere)

(২) মানসিক ক্ষেত্র (Psycho-sentimental sphere)

(৩) আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র (Spirituo-sentimental sphere)

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রঃ

সমাজের মধ্যে যদি একতা আনতে হয়, তবে সর্বপ্রথম যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য, উচ্চ-নীচ মনোভাব রয়েছে তাকে দূর করতে হবে। কারণ যেখানে একজন বিলাস-ব্যসনে দিন কাটায়, আর একজন না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে, সেখানে কখনও মৈত্রীর বন্ধন কল্পনা করা যায় না। ঠিক তেমনিই সামাজিক ক্ষেত্রে একজন বড় আর একজন ছোট, একজন উঁচু জাতের আর একজন নীচু জাত হিসেবে ঘৃণ্য-এই ব্যবস্থা বজায় থাকলে কখনও ভ্রাতৃত্বের রাখী-বন্ধন সম্ভব নয়। যাঁদের অর্থ আছে তা দিয়ে হয়তো অপরকে তাঁরা কিনে রেখে নিজের কাজ করিয়ে নিতে পারেন কিন্তু সেই ক্রীতদাসের সাথে ক্রেতার কখনও ঐক্য হতে পারে না।

"টাকা দিয়ে শুধু মাথা কেনা যায়
হৃদয় যায় না কেনা।"

এই হৃদয়ের পরশ পেতে হলে কৃত্রিম বিভেদের অভিমানকে পরিত্যাগ করতে হবে। তার জন্যেই প্রথমে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে করতে হবে অনবরত সংগ্রাম। ভারতের মানুষ দারিদ্র্যের কবলে নিপীড়িত–Poverty is the common enemy of all the Indians. এই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যখন তীব্র আঘাত হানার চেষ্টা হবে তখনই স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলেই এক উদ্দেশ্য–প্রণোদিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে। এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অভিযান চালাতে হবে ধাপে ধাপে। প্রথমতঃ শোষণ–বিরোধী মনোভাবকে জাগরিত করা দরকার। প্রত্যেকটি মানুষকে বোঝাতে হবে যে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ প্রত্যেকের সাধারণ সম্পত্তি। সবারই একে ভোগ করার জন্মগত অধিকার রয়েছে। এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা কখনোই চলবে না।

"তোমার দেওয়া এই বিপুল পৃথ্বী সকলে করিৰ ভোগ এই
পৃথিবীর নাড়ী সাথে আছে সৃজন দিনের যোগ।"

সূচীপত্র

তাই প্রত্যেককেই জীবন-যাত্রার নিম্নতম মান দিতেই হবে। আর এর জন্যে চাই যথেষ্ট ক্রয়ক্ষমতা (Purchasing capacity) প্রদান করা। শুধু সর্বনিম্নমান প্রদানই যথেষ্ট নয়, দেশের সামুহিক সম্পদ বৃদ্ধি করে যেতে হবে এর সঙ্গে সঙ্গে। মানুষের ক্রমবর্ধমান অভাবকে পূরণ করার জন্যে যদি উপযুক্ত সম্পদের যোগান না দেওয়া হয় তাহলে মানুষের মধ্যে থেকে যাবে পুরানো অসন্তোষ। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি একান্ত দরকার। কিন্তু ভারতের বর্তমান তথাকথিত নেতৃবৃন্দের সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। নানান ধরণের উন্নয়নমূলক কাজের দ্বারা দেশের সম্পদ-অল্পতার অভিশাপকে দূর করা যায়, যেমন ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশ। এখানকার কৃষি, বিশেষ করে রবিশস্য মৌসুমী বৃষ্টির ওপর এখনও ষোল আনা নির্ভরশীল। যদি এখানে কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা করা যেত তবে ওড়িষ্যায় বর্তমান শস্য উৎপাদনের তিনগুণ বেশী উৎপাদন হতে পারত। আজ ওড়িষ্যা মাত্র দেড় কোটি মানুষের খাদ্য যোগায়। উন্নত কৃষি ব্যবস্থা হলে চার কোটি লোকের খাদ্য এই ওড়িষ্যা থেকেই সরবরাহ করা যেত। ঠিক তেমনিভাবে ওড়িষ্যা খনিজ

সম্পদেও ধনশালিনী। প্রভূত পরিমাণে কয়লা, ক্লোরিণ, রক্সাইট, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি ওড়িষ্যা সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু ভারতের নেতৃবৃন্দ সেই খনিজ সম্পদকে বিদেশে রপ্তানী করে থাকেন। যদি এগুলোকে কাজে লাগিয়ে অন্তর্দেশীয় শিল্প-কারখানা বিস্তারের পরিকল্পনা নেওয়া হয় তবে বড় বড় চারটা ষ্টীল-প্ল্যান্ট সহজেই চালানো যেতে পারা যায়। এর ফলে মাথাপিছু আয়ও বাড়তো যথেষ্ট। কিন্তু নেতৃবৃন্দ ওদিকে নজর না দিয়ে খেয়ালখুশী মত পরিকল্পনা করে চলেছেন, যাতে না হয় অর্থনৈতিক ব্যবধান-লোপ, না হয় সামুহিক সম্পদের বৃদ্ধি।

এই উভয় কার্য সমাধা করতে হলে বর্তমান যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে তার আমূল পরিবর্তন করা দরকার। প্রথমেই অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের সুবিধার জন্যে অর্থনৈতিক প্রদেশ (Economic zone) তৈরী করে ফেলা উচিত। রাজনৈতিক ও ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্য সীমা নির্ধারিত হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যথাযথভাবে করা যায় না। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর ওপর উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তাই অর্থনৈতিক প্রদেশ দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির জন্যে অপরিহার্য। বর্তমানে একই রাজনৈতিক প্রদেশের

মধ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যাবহুল স্থান রয়েছে। যেমন, বিহারে ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলে প্রতিবছর সেচের সমস্যা দেখা দেয়। আবার উত্তর বিহারে সমতল এলাকায় বন্যার জল বহিষ্করণের সমস্যা। ঠিক তেমনই রয়ালসীমা, শ্রীকাকুলাম ও তেলেঙ্গানা অঞ্চল একই রাজনৈতিক প্রদেশ অন্ধ্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন। তাই সেখানকার মানুষের স্বার্থে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো বিবেচনা করে অর্থনৈতিক প্রদেশ গড়া উচিত। শাসন সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্যে হয়ত এক্ষুণি এই ধরণের রাজনৈতিক প্রদেশগুলোকে অর্থনৈতিক প্রদেশে রূপান্তরিত করতে গেলে অসুবিধা হতে পারে। তাই, দু'টো রাজনৈতিক প্রদেশের মধ্যেও একটি অর্থনৈতিক এলাকা তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে বা একই রাজনৈতিক এলাকায় একাধিক অর্থনৈতিক অঞ্চল থাকতে পারে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ তৈরীর কোন অর্থই হয় না।

এর দ্বারা জন-ঐক্য, জাতীয় ঐক্য কখনোই আসা সম্ভব নয়। শোষক, পুঁজিপতি, কারখানার মালিক আর শ্রমিকবৃন্দ যদি একই ভাষায় কথা বলে তবে তাদের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকবে, এ কথা মেনে নেওয়া বাতুলতা মাত্র।

মানসিক ক্ষেত্রঃ

আবেগপ্রবণ মানুষের মন তার দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর অনেক জিনিসের সঙ্গে তার আত্মীয়তা গড়ে তোলে। এই আত্মীয় বস্তুর প্রতি মানুষের যে সেন্টিমেন্ট তা যদি সমষ্টিগত সেন্টিমেন্টের সঙ্গে খাপ খায় তবে সেই সেন্টিমেন্ট-কে মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে হবে। অবশ্য অনেক সময় এমন সব বস্তুর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে যা সমষ্টি-ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্যকে বাড়িয়ে তোলে। সেই ধরণের সেন্টিমেন্টগুলোকে পরিহার করে যে সমস্ত সেন্টিমেন্ট সাধারণ ঐক্যের অনুকূল তাকেই গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃতের প্রতি প্রতিটি ভারতবাসীর এক সাধারণ মনোভাব রয়েছে। এই ভাষা থেকে ভারতের প্রায় সৰ ভাষারই সৃষ্টি হয়েছে। একদিন ছিল যখন ওই ভাষাতে আসমুদ্র-হিমাচল দৈনন্দিন কাজকর্মে ভাবের আদান প্রদান চলত। আজকে যেসব ভারতীয় ভাষা রয়েছে সবার ওপরই সংস্কৃত ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত। যেমন **বাংলা ভাষায় শতকরা ৯২ ভাগ হ'ল সংস্কৃত শব্দ। ওড়িয়াতে ৯০, মৈথিলীতে ৮৫ ভাগ, মালয়ালামে ৭৫ ভাগ, আর তামিলে তিন ভাগ হ'ল সংস্কৃত। সুতরাং স্বভাবতই এই**

সংস্কৃত ভাষার প্রতি কারুর কোন বিরোধ থাকতে পারে না। জাতীয় ঐক্যই যদি লক্ষ্য হ'ত তবে নেতৃবৃন্দ এই সংস্কৃত ভাষাকেই জাতীয় ভাষা করবার প্রস্তাব করে, দেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ব্যবস্থা করতে পারতেন।

শুধু ভাষা নয়, গৌরবময় অতীতের প্রতি মানুষের এক স্বভাবগত দুর্বলতা রয়েছে। প্রত্যেকেই অতীতের জাতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আচার-বিচারকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। এই ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে মানসিক ব্যাপার। এই সাইকিক্ সেন্টিমেন্ট (psychic sentiment)-কে দেশের ঐক্য বৃদ্ধির কাজে লাগাতে পারা যায়, যেমন, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতা। গৌরবময় ইতিহাসকে শুধু বিদ্যালয়ের পাঠ্য ও গবেষণার বিষয় করে না রেখে জনগণের কাছে এর চিত্র তুলে ধরতে হবে। এতে গণমনে প্রত্যয় ও গৌরবের ভাবনা সঞ্চারিত হবে, এতে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ঠিক তেমনই অতীতের ইতিহাসও মানুষের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব গড়ে দেয়। ইতিহাস আর ইংরেজী History-এই দুটো শব্দ কিন্তু সমার্থক `নয়। History মানে হ'ল ইতিকথা,

অতীতের ঘটনাবলীর বিবৃতিমাত্র। আর ইতিহাস মানে হ'ল অতীতের ঘটনাগুলোকে মানুষকে নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্যে বর্ণনা করা। শুধু ঘটনার বিবৃতি নয়, তার শিক্ষাগত মূল্যও থাকৰে। যেমন মহাভারত একটি ইতিহাস, অতীত থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে প্রেরণা দিয়ে আসছে, আজও পল্লীর মানুষেরা কেরোসিনের বাতির নীচে প্রতি সন্ধ্যায় মহাভারতের পাঠ ও আলোচনা করে আনন্দ পায়। এর প্রতি প্রত্যেকেরই এক সাধারণ ভালোবাসার মনোভাব রয়েছে। এর প্রসার ও. প্রচার জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে। বৈষয়িক সমস্যা সমাধানে দৈনন্দিন জীবনের কর্মাবলীতে এই মহাকাব্য থেকে ঘটনা উদ্ধৃত করে মানুষকে তার অতীতের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া উচিত। সর্বশেষ হ'ল, অতীতের ঋষি-মনীষী মহাপুরুষের জীবনালেখ্য সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরলে তাদের মধ্যে ঐক্য বেড়ে ওঠে। কারণ ওইসৰ ঋষি-মনীষীদের প্রতি মানুষের মনে অন্তঃসলিলা হয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রবাহিত হয়ে রয়েছে। মনীষী মাত্রই সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে একতা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে গেছেন। সেই সমস্ত মহাপুরুষের বাণী ও রচনা জনমানসে সৃষ্টি করে এক আলোড়ন। তাই

জন-ঐক্যের জন্যে জন-সমাজে সেই মহান ব্যষ্টিত্বের প্রচার একান্ত দরকার।

আজকের নেতৃস্থানীয় যাঁরা মুখে তাঁদের ভাষণের তুৰড়ী ছড়ান কিন্তু কাজকর্মে তাঁরা উপরি-উক্ত পন্থাগুলির একটিকেও বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা কখনও করেন না। অতীতের মহাপুরুষেরা আজ শুধু জন্মশতবার্ষিকীর উৎসবের উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁদের ওপর দু'টো বানানো কথা বলে দিতে পারলেই যেন তাঁদের প্রতি বড় বেশী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হ'ল ৰলে এঁরা মনে করেন। দেশের উন্নতিতে এই মহাপুরুষদের অবদান এখনও কত বড় কাজে লাগতে পারে তা এঁরা বুঝতে চেষ্টা করেন না। জনজীবন থেকে তাই মহান আদর্শ ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে আর জনগণের মধ্যে বেড়ে চলেছে অনৈক্য ও বিরোধিতা।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রঃ

উপরি-উক্ত দু'টি সেন্টিমেন্ট ছাড়া মানুষের সমাজে স্থায়ী ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে চাই আধ্যাত্মিকতা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে সাধারণ মনোভাব তৈরী করে' যে ঐক্য

আনা যায় তা বৃহত্তর ঐক্যের পথে প্রাথমিক স্তর। এর দ্বারা একটি Nation বা একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ঐক্য আসতে পারে। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে এই Sentiment তৈরী করা হয় তা শেষ হয়ে গেলে বা তার সমাধান হয়ে গেলে পুনরায় ঐক্যসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। তাই স্থায়ী ঐক্যের জন্যে প্রয়োজন আধ্যাত্মিক মনোভাবের। কারণ প্রত্যেকটি মানুষেরই রয়েছে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ খুঁজে বেড়ায় সেই পরম সত্তাকে। পথ না জানার জন্যেই সে বিভ্রান্ত। যাকে সে খোঁজে তাকে পায় না বলেই তার জীবনে এত বড় tragedy! সারা জীবন– "হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে"–এই করে তার দিন কাটে। যদি তাকে সত্যিকারের পথ দেখানো যায় তবে বিশ্বের সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে এসে দাঁড়াবে একই রাস্তায়, একই পথের যাত্রী হিসেবে, সবাই চলবে এক তালে, এক ছন্দে, একই পরম লক্ষ্যের দিকে। তাই বিশ্বমানবের একতার জন্যে অপরিহার্য তত্ত্ব হ'ল অধ্যাত্মবাদ। এই পরম সম্পদ মানুষকে শিক্ষা দেয় যে পরমপুরুষ সকলের পিতা, পরমা প্রকৃতি মাতা আর সমস্ত বিশ্ব আপন বাসস্থান। সে তখন আপন মনে গাইবে–

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে যাই,
তারই মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধান লৰ বুঝিয়া, ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয় তারে আমি মরি খুঁজিয়া।”

তাই 'Cosmic sentiment alone can be the unifying force which shall strengthen humanity to smash the bondages, and abolish all narrowistic walls of fissiparous tendencies'.

এর কারণ হ'ল এই ভূমাদর্শ চরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত–যা স্থান–কাল–পাত্রের ৰন্ধনের মধ্যে আৰদ্ধ নয়। তা অনন্ত বলে সীমিত মন যখন তাঁকে তার বিষয়রূপে গ্রহণ করে তখন মানসাধ্যাত্মিক নিয়মানুসারে তা বিস্তৃত হতে থাকে। এর পরিধি হয় অবশেষে 360°। এই সমান্তরালতা রক্ষা করবার জন্যে যে পদ্ধতি তাকেই ৰলি আধ্যাত্মিক সাধনা। এই আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা মানুষ যখন বিশ্বের সবাইকে নিজের মনের আয়তনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারবে তখনই সাধিত

হৰে এক বিশ্ব, এক বিশ্ব সমাজ। জাতীয়তাবাদের মনোভাব যতক্ষণ সজাগ থাকৰে ততক্ষণ পারস্পরিক সংঘাত ও সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। সীমিত মন থাকার ফলে সেই সীমার বাইরে যারা, তাদের হাসি, কান্না, দুঃখ, বেদনার সম্পর্কে চিন্তা করার মনোভাব আসা সম্ভব নয়। তাই এক জাতীয়তাবাদী অন্য জাতির ওপর আক্রমণ চালিয়েছে নিজের জাত্যাভিমানকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। শুধু জাতীয়তাবাদ কেন, কোন ইম্, এমনকি আন্তর্জাতিকতাবাদও মানসিক বিস্তারের সর্বোচ্চ সীমার পরিচায়ক নয়। এই বিশ্বে অনেক গ্রহ উপগ্রহ রয়েছে সেখানে যে মানুষের সভ্যতা গড়ে ওঠেনি, তা কে বলতে পারে। তাই, যে শুধু এই পৃথিবীর বিভিন্ন নেশান সম্পর্কে চিন্তা করে, তার মনের আওতা থেকে আরও অনেক সভ্যতা বাইরে থেকে যায়। সুতরাং বিশ্বভ্রাতৃত্ব ৰোধের প্রতিষ্ঠা তার দ্বারা সম্ভব নয়। যখন আন্তগ্রহ সংগ্রাম শুরু হবে তখন আজকের আন্তর্জাতিকতাবাদ-জাতীয়তাবাদেরই রূপ গ্রহণ করবে। সুতরাং বিশ্বৈকতাবাদ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হ'ল আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা মানসিক বিস্তার সাধন করা। এই আধ্যাত্মিক মনোভাবের দ্বারা ছোট ছোট নেশান-এর গণ্ডী দৃঢ় করা যাবে না সত্য, কিন্তু এর দ্বারা ভবিষ্যতে গড়ে তোলা যাবে এক

বিশ্বরাষ্ট্র। তখনই হৰে one nation a world nation, এক জাতি, এক প্রাণ, একতা। সেই জাতির নাম হৰে 'মানবজাতি'।

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম মানবজাতি,
একই পৃথিবীর স্তন্যে পালিত,
একই রবি শশী মোদের সাথী।"

-এই সত্য তখন প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিভেদসৃষ্টিকারী তত্ত্ব (Point of differences)

উপর্যুক্ত কার্যক্রমের দ্বারা পৃথিবীর মানুষকে একসূত্রে বাঁধা সম্ভব হৰে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে মানুষের সমাজের যে বাহ্যিক কতকগুলো পার্থক্য রয়েছে, সেগুলোকেও উপযুক্তভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। সাধারণতঃ এইসব পার্থক্য স্বাভাবিক মিশ্রণের দ্বারা দূর হয়ে যায়। এদের জোর করে দূর করা সম্ভব নয়। মানুষ যখন একতার ভাবনা নিয়ে একে অপরের নিকটে আসবে, অপরের সুখ দুঃখের ভাগী হৰে

তখন স্বভাবতই যে বাহ্যিক বিভেদ রয়েছে তাও ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মানুষের সমাজে মূলতঃ চারটি ক্ষেত্রে বাহ্যিক পার্থক্য দেখা যায়। সেগুলো হ'ল খাদ্য, বস্ত্র, ভাষা ও ধর্মমত।

খাদ্যঃ

পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন ধরণের খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। প্রাচ্যের খাদ্য ও প্রতীচ্যের খাদ্য-এই দুই-এর মধ্যেই কতই না পার্থক্য। এই পার্থক্য নির্ভর করে মূলতঃ ভৌগোলিক পরিবেশ ও উৎপাদনের ওপর। যে দেশে যে ধরণের খাদ্য উৎপাদিত হৰে-সে দেশের মানুষ সেই খাদ্যকেই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হবে। যেমন ভারতবর্ষে সাধারণতঃ চার প্রকারের খাদ্যাঞ্চল রয়েছে চার প্রকারের খাদ্য উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে। যেমন-এক অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় সরিষার তেল, আবার কোথাও বা ঘি ব্যবহার করে। পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের লোকেরা রুটি খেতে অভ্যস্ত, আবার পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের লোকেদের ভাত না হলে চলে না। এইভাবে মানুষের প্রধান খাদ্যগুলি বিভিন্ন জল-বায়ুর ওপর নির্ভরশীল। এই খাদ্যের বিভেদকে কখনও জোর করে সমান করার চেষ্টা করা উচিত নয়, জাতীয় খাদ্য

ৰলে কোন খাদ্যকে জোর করে মানুষকে খেতে বাধ্য করা অযৌক্তিক। তাছাড়া প্রত্যেকের ব্যষ্টিগত রুচি-অরুচির প্রশ্ন আছে। যে সমস্ত দেশে কমিউন (commune) ব্যবস্থা করে, সমষ্টিবাদ তত্ত্বের দোহাই দিয়ে সবাইকে একই খাদ্য খেতে বাধ্য করা হয় সেখানকার মানুষ হয়ত ভয়ে কিছু বলতে পারছে না, কিন্তু ভেতরে তারা কখনোই সুখী নয়। খাদ্য মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের মধ্যে সর্বপ্রধান। তাতেই যদি সে সন্তুষ্ট হতে না পারল তবে স্বভাবগত কারণেই তার মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলৰে ধিক্কিক করে'- এককালে বিরাট অগ্নিকান্ড ঘটাৰার সুযোগ খুঁজৰে।

পোশাক:

খাদ্যের মত পৃথিবীতে পোশাকেরও রয়েছে বৈচিত্র্য। ওই বৈচিত্র্যের পেছনে কাজ করে পরিবেশের প্রভাব। যেমন আরব দেশের লোকেরা শুষ্ক মরুভূমির ওপর বাস করে। দুপুরের প্রখর রৌদ্রে বালুকণা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ও হাওয়ায় উড়তে থাকে সেই উত্তপ্ত বালুরাশি। তাই সেখানকার লোকেরা গরম বালু থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যে আপাদমস্তক ঢেকে থাকে, এমন পোশাক পরার অভ্যাস করেছে। তাদের মাথা কান

পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হয়, ঘরগুলোও তারা তৈরী করে মাটির নীচে, যাতে করে গরম বালুকণা তাদের গায়ে না লাগতে পারে। বিপরীতভাবে ভারতের উত্তর বিহারের লোকেরা এই ধরণের পোশাক পরলে ভীষণ অসুবিধায় পড়বে, কারণ এখানে প্রচুর বৃষ্টির জন্যে নদী-নালার প্রাচুর্য। তাই যদি আপাদমস্তক ঢাকা পোশাক পরে বাইরে বেরোতে হয় তবে এক পাও এগোনো যাবে না। তাই এখানকার লোকেরা সুবিধামত ধুতি কাপড় পরে থাকে। এতে প্রয়োজনবোধে হাঁটুর ওপর ধুতি গুটিয়ে নালা পেরিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় পথ চলতে অসুবিধা হয় না। এইভাবে শীতপ্রধান দেশের মানুষের পশমের পোশাক গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেরা পরতে পারবে না, তাই এই পোশাকের বৈচিত্র্যকে জোর করে সমান করে দেওয়া সম্ভব নয়।

ভাষা:

পৃথিবীতে ভাষার অন্ত নেই। বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, আবার একই দেশের মধ্যে অনেক ভাষা রয়েছে। এই 'ভাষার বৈচিত্র্যের কারণ হ'ল রেসিও-ক্যালচারাল ইনফ্লুয়েন্স (Racio-cultural influence)। পৃথিবীতে রয়েছে

বিভিন্ন জাতি, তাদের বিভিন্ন প্রকারের ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ কথা বলে বিশেষ বিশেষ ধ্বনির সাহায্যে। এই ধ্বনির উৎপত্তি হয় ফুসফুস থেকে ঠেলে দেওয়া নিঃশ্বাস বায়ু থেকে। এই নিঃশ্বাস বায়ু শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে এসে কন্ঠনালীতে পড়ে ও সেখান থেকে গলা ও নাকের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই বেরিয়ে আসা ধ্বনি আমরা শুণতে পাই। তাই মুখ ও নাকের পার্থক্য অনুযায়ী এই ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিভিন্ন দেহ সংরচনার পার্থক্য নিয়ে যে বিভিন্ন রেস্ (Race) পৃথিবীতে রয়েছে তাদের এই পার্থক্যের জন্যে ভাষাতেও পার্থক্য হয়। সাধারণতঃ ওই পার্থক্য ছয়টি বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল, তা হ'ল রক্ত, নাক, চোখ, ত্বক ও দৈর্ঘ্য–এই ছয়টি অঙ্গের পার্থক্য অনুসারে পৃথিবীতে চার ধরণের রেস (Race) রয়েছে–আর্য, মঙ্গোলীয়, অষ্টিক ও নিগ্রো। আর্যদের ত্বক লালচে–শাদা, রক্ত উষ্ণ, চুল লালচে, চোখ বিড়ালের মত, নাক টিয়াপাখীর মত, আর দৈর্ঘ্য লম্বা। নিগ্রোদের ত্বক ঘন কালো, রক্ত কম গরম, চুল কুঁচকানো, চোখ কালো, আকার দীর্ঘকায়, ঠোঁট পুরু। মঙ্গোলীয় ও অস্ট্রিকদের দৈহিক সংরচনার মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর্যদের মধ্যে আবার তিনটি শাখা–নর্ভিক, আল্পাইন, মেডিট্যারেনিয়ান। নর্ডিক– এদের

দেহগত বৈচিত্র্য উপর্যুক্ত আর্যদের মত। আল্পাইন শাখায় ত্বক লালচে, রক্ত নর্ডিকদের থেকে কম গরম, চুল কালো, চোখ নীল। মেডিটেরিয়ান শাখার লোকেদের ত্বক সাধারণ শ্বেতবর্ণ, রক্ত খুব গরম নয়, চুল কালো, নাক সাধারণ, দৈর্ঘ্য মাঝারি ধরণের। দক্ষিণ ফ্রান্স, আরব ও ৰল্কান রাজ্যে এই ধরণের লোক বাস করে।

এই সমস্ত জাতিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। মিশ্রণও হয়েছে তাদের মধ্যে। কিন্তু বিশেষ জলবায়ুতে যে বিশেষ জাতি প্রথম থেকে বাস করে আসছে তাদের সংরচনাগত বৈশিষ্ট্য, যারা অন্যদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের থেকে বেশী প্রকট। সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাষাতেও বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। ভারতের মধ্যে যে প্রধান জাতিগুলো রয়েছে তাদের নাম হ'ল মঙ্গলোটিবেটিয়ান শাখা–লাদাক, কিন্নরী, গাড়োয়াল, নেপালী, সিকিমী, ভুটানী, নেওয়ারী, মিজো ও গারো পাহাড়ের বাসিন্দারা এই দলের মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয় শাখাটি হ'ল মেডিট্যারেনিয়ান জাতি। কশ্মীরের ব্রাহ্মণ ও ওখানকার যে সমস্ত লোকের রঙ লালচে শাদা তারা ওই শাখার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় হ'ল দ্রাবিড় শাখা। অন্ধ্র, মহীশূর, কেরালা, তামিলনাড়ুর সাধারণ জন–সমষ্টি এই শাখার

অন্তর্ভুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বর্তমান উত্তর ভারত বিন্ধ্য পর্বতমালার উত্তর খণ্ড থেকে তিব্বত পর্যন্ত সমস্ত এলাকা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল ও বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ অংশ, বর্তমান আরব সাগর, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়ার দেশগুলো মিলে ছিল এক বিস্তৃত অঞ্চল। তাকে বলা হ'ত গণ্ডোয়ানা মহাদেশ, সেই গণ্ডোয়ানা মহাদেশের উত্তর অংশে বাস করত অষ্ট্রিক জাতির শাখা, আর তার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বাস করত নিগ্রোরা, আর এর মধ্য অঞ্চলে বাস করত অস্ট্রীক ও নিগ্রো শাখা। এরাই আজকের ভারতের দ্রাবিড় জাতি।

বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণও হয়েছে এই ভারতের মাটিতে, এর ফলে বিভিন্ন ভাষারও সৃষ্টি হয়েছে এখানে।

১. আর্য-ভারতীয় ভাষার মধ্যে রয়েছে মারাঠী, রাজস্থানী, গুজরাটি, পঞ্জাবী, কশ্মিরী, খড়িৰলি, ব্রজভাষা, বুন্দেলখণ্ডি, অবধি, ছত্রিশগড়ী, ভোজপুরী, অঙ্গিকা, মাগধী, মৈথিলী, বাংলা ভাষা, ওড়িয়া, অসমিয়া, গাড়োয়ালী, কুমায়নী, গোর্খালী ভাষা।

২. অস্ট্রিক শাখার ভাষা হ'ল-মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, খড়িয়া, মোমখাম শাখার ভাষা।

৩. টিবেটো-বার্মিজ শাখা-অসমের অসমিয়া ভাষা বাদ দিয়ে আর যে সমস্ত ভাষা রয়েছে, মণিপুরী ও নাগাল্যান্ডের ভাষা।

৪. টিবেটো-চাইনিজ ভাষা-লাদাকের ভাষা, কিন্নরী, কিরাত, লেপচা ইয়ারু, গারো, খাসিয়া, মিজো, নেওয়ারী প্রভৃতি।

ভাষার ওপর সাংস্কৃতিক প্রভাব :

শুধু জাতিগত বৈশিষ্ট্য নয়, ভাষার ওপর সাংস্কৃতিক প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে, এক গোষ্ঠীর সংস্কৃতি অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিয়ম হ'ল এই যে, যে সংস্কৃতি প্রাণশক্তিতে ভরপুর ও শক্তিশালী তা দুর্বল সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এমন কি কখনও কখনও তাকে আত্মসাতও করে ফেলে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল পাশাপাশি বাস করার ফলে উভয়ের মধ্যে আদান প্রদান শুরু হয়। যে অধিক শক্তিশালী তা দুর্বল সংস্কৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার শুরু করে দেয়। সেই সময়ে প্রভাবিত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর লোকেরা, প্রভাব-

বিস্তারকারী সংস্কৃতির সবকিছু গ্রহণ করতে চায়, তার মধ্যে ভাষাও একটি তত্ত্ব।

আর্য-অনার্যদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনার্যরা সংস্কৃত ভাষাকে গ্রহণ করে নেয়। আবার আর্যরা অনার্যদের অন্তর্মুখী সাধনাকে নিজেদের ধর্মমতের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। আর্য ভাষা সংস্কৃত, তাই পূর্ব ও উত্তর ভারতের সমস্ত ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। দক্ষিণ ভারতের ভাষাতেও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান-এর মধ্যে সৰ থেকে বেশী হ'ল মালায়ালমে। তার কারণ হ'ল উত্তর ভারতের লোকেরা মাদ্রাজের [বর্তমানে চেন্নাই] পশ্চিম দিক দিয়ে সমুদ্র পথে কেরালায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। তাই মালয়ালাম ভাষার মূল ধাতু যদিও তামিল থেকে নেওয়া কিন্তু শব্দ ভাণ্ডার সংস্কৃতবহুল। তাই মালায়ালমে সংস্কৃত ভাষার পরিমাণ প্রায়। শতকরা ৭৫ ভাগ।

আর্যদের প্রভাব সমাজের উচ্চস্থানীয় লোকদের ওপর যেমন পড়েছিল তেমনিই পড়েছিল অধঃস্তন শ্রেণীর ওপরও। এই প্রভাব কোথাও কোথাও এত প্রবল হয়ে পড়েছে যে লোকেরা নিজের ভাষায় পরিবারের বাইরে কথা বলতে লজ্জা পায়। যেমন কতকগুলি অস্ট্রিক শাখার লোক, যেমন সাহা

গোষ্ঠীর লোকেরা ঘরে নিজেদের ভাষা ৰলে কিন্তু বাইরে তারা বলৰে ভোজপুরী। তেমনই বিহারের রাঁচী অঞ্চলের সিংমুণ্ডা ও শরণ গোষ্ঠীর লোকেরা ও ত্রিপুরার টিপ্পা গোষ্ঠীর লোকেরা বাংলা ভাষা ৰলে। গাড়োয়ালীরা টিবেটো-চাইনিজ ভাষা পরিত্যাগ করে, আর্য-ভারতীয় ভাষা বলা শুরু করেছে।

এইভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলে ভাষার বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। এই বিভিন্নতাকেও জোর করে দূর করা যায় না। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষাকে জোর করে অবদমিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে।

ভাষার অবদমনের নজির:

পৃথিবীতে যত ভাষা রয়েছে প্রত্যেকটি ভাষার গুরুত্ব সমান। কাজেই কোন ভাষাকেই ছোট ৰলে ঘৃণা করার পেছনে কোন যুক্তি নেই ও এক ভাষার আধিপত্যের জন্যে অন্য ভাষার বিকাশকে রুদ্ধ করে দেওয়া কোন মতেই সমর্থনীয় নয়; কিন্তু প্রাচীন ভারত তথা আধুনিক ভারত ও পাশ্চাত্য দেশের কোথাও কোথাও বিভিন্ন ভাষাকে ধ্বংস করার প্রয়াস

রয়েছে যার ফল কখনও মঙ্গলময় হয়নি। যেমন প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষা সমস্ত প্রাকৃত ভাষাকে অবদমিত করার চেষ্টা করেছে। বৈদিক সংস্কৃত দ্রাবিড় ভাষা ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ভগবান বুদ্ধ যখন জনগণের ভাষা পালীতে তাঁর ধর্মমত প্রচার করা শুরু করেন তখন পণ্ডিতগণ তাঁকে সংস্কৃত ৰলৰার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ তাঁদের সে কথায় কর্ণপাত না করে পালী ভাষাতেই তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। মধ্যযুগীয় ভারতেও সংস্কৃতের অন্য ভাষার ওপর এই ধরণের জুলুম চালানো বন্ধ হয় নি। জনসাধারণের ভাষাকে পণ্ডিতেরা ভাষা না বলে ঘৃণা করে বলতেন ভাখা। মহাত্মা কবীর এই ধরণের আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিলেন, তিনি বলেছিলেন– “সংস্কৃত কুপোদক, ভাখা বহতা নীর" অর্থাৎ সংস্কৃত কূপৰদ্ধ জল আর জনগণের ভাষা স্রোতস্বিনী। এর মধ্যে রয়েছে গতিময়তা। ৰাঙলাদেশেও দেখি বাংলা ভাষাকে এই সংস্কৃত ভাষা মোটেই আমল দিতে চায়নি। ধর্মগ্রন্থগুলোকে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করাও পাপ বলে গণ্য হ'ত। নবাব হোসেন শাহ ব্যষ্টিগতভাবে তদানীন্তন বাংলা ভাষার উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হন। তাঁরই সহযোগিতায় কৃত্তিবাস ওঝা

রামায়ণকে, কাশীরাম দাস মহাভারত ও মালাধর বসু ভাগবতকে বাংলা ভাষায় অনূদিত করেন। তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে কম হট্টগোল হয়নি। তাঁরা হোসেন শাহকে হিন্দুধর্ম-বিনাশকারী বলে অপপ্রচার শুরু করে দেন, কারণ ৰাংলা ভাষায় ধর্মগ্রন্থ লেখা মানে হিন্দুধর্মকে কলঙ্কিত করা। মালাধর বসুকে এঁরা মুসলমান হয়ে যাওয়ার অপবাদ দেন ও গুণরঞ্জন খাঁ ৰলে তাঁকে সমাজে হেয় করার চেষ্টা করেন। এই অনুবাদ-ক্রিয়াকে পণ্ডিতেরা এতবড় পাপ বলে মনে করেছিলেন যে কৃত্তিবাস ওঝা মহাশয়কে তাঁরা সমাজ থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা বেশী দিনের নয়, মাত্র ৪৫০ বছর আগে এই ধরণের ঘটনা ঘটত। ইয়ুরোপেও লাটিন ভাষা অন্য ভাষাসমূহকে অবদমন করতে চেয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের আরবীয় ভাষা পার্শীয়ান ভাষাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে, সম্প্রতি কানাডা ও ওয়েলসের লোকেরা ইংরেজী ভাষার অধ্যারোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তারা চায় তাদের নিজেদের ভাষাকেই ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে রাখতে। বর্তমান ভারতেও স্বার্থপর দলগুলোর রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় ভোজপুরী, মৈথিলী, মাগধী, ছত্রিশগড়ী, অবধী, বুন্দেলখণ্ডি, মাড়োয়ারী প্রভৃতি ভাষা অবদমিত হয়ে চলেছে। একে

অবদমিত ভাষা-ভাষীর লোকেরা নিশ্চয়ই চোখ বন্ধ করে মেনে নেবে না, নিশ্চয়ই এই অন্যায়-অবদমনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠৰে-যেমন সাম্প্রতিক কালে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে জোর করে চাপাৰার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল। তাই বিভিন্ন ভাষাকে জোর করে এক করৰার প্রচেষ্টা না করে, বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষকে কাছাকাছি আনৰার প্রচেষ্টা করা উচিত। এর ফলে নিজের প্রেরণায় অন্যান্য ভাষা শেখৰার বাসনা জাগৰে। জোর করতে গেলেই যত বিপদ।

ধর্মমতঃ

পৃথিবীতে ধর্মমতের অন্ত নেই। বিভিন্ন ধর্ম-প্রবক্তা বিভিন্ন মতবাদের জন্ম দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের এই ধর্মমত পরবর্তীকালে মানুষের সমাজে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা না করে, বরং বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষকে ৰাড়িয়ে তুলেছে। ধর্মমত নিয়ে এই পৃথিবীতে কত না যুদ্ধ, কত না ক্রুশেড হয়ে গেল। তাই রিলিজিয়ন কখনও unifying force হিসেবে কাজ করেনি-তাই এই ধর্মমতকে common point-এর মধ্যে গণ্য না করে Point of difference-এর অন্তর্ভুক্ত করা

উচিত। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হৰে যে ধর্ম আর রিলিজিয়ন সমার্থক নয়। রিলিজিয়ন-এর আরবিক প্রতিশব্দ হ'ল মজহৰ, কিন্তু ধর্মের প্রতিশব্দ হ'ল ইমান। এই ধর্ম মানুষকে যুগে যুগে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করার বাণী প্রচার করেছে। ধর্মমত যেখানে সংখ্যায় অনেক, ধর্ম সেখানে মাত্র একটি ও সেই ধর্ম-মানুষের অসীমকে পাওয়ার এষণা। এই ধর্ম বৈবহারিক জ্ঞান ও যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে রয়েছে পারমার্থিক সত্যোপলব্ধির যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা। ধর্মসাধনার জন্যে বাহ্যিক কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই, সাধনার জন্যে কেবল প্রয়োজন অণুমানস সত্তার; এতে মানুষকে অন্ধ বিশ্বাসের ফাঁদে ফেলে শোষণের কোন সুযোগ নেই। স্বার্থসিদ্ধির বা দলাদলির প্রতি এর কোন সমর্থন নেই। প্রেম, স্বতন্ত্রতা ও সমতা হ'ল তার ভিত্তি। দেশ কাল ও পাত্রের অতীত ৰলে এতে স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ নেই। এই ধর্ম অপরিবর্তনীয়- "এক এব সুহৃদ্ধর্ম নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।"

কিন্তু ধর্মমত বা সম্প্রদায়, ঠিক তার বিপরীত, তিনটি তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১. Psycho-sentiment.

২. Psycho-ritualistic observance.

৩. Tradition.

ধর্মমত সৃষ্টির আদিতে রয়েছে মানুষের সহজাত ভয় বৃত্তি।

পাহাড়, নদী, অরণ্য, সমুদ্র, ঊষা, সন্ধ্যা, বজ্র-বিদ্যুতের ভয়ে মানুষ শুরু করেছিল এদের উপাসনা।

এই উপাসনার মূলে ছিল আত্মরক্ষা। বিভিন্ন প্রকৃতির দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে মানুষের মনে এই প্রাকৃতিক পূজা করবার প্রেরণা জাগে। এই ভয়প্রসূত মনোভাবের জন্যে এক একটি ভৌতিক বস্তুকে মামনে রেখে আরাধনা করা শুরু করে। এর ভিত্তি-ভূমিতে ছিল কাল্পনিক ও মানসিক বিশ্বাস। এই ভৌতিক বস্তুর সংস্পর্শে আসার ফলে এক সেন্টিমেন্ট (sentiment) গড়ে ওঠে-তাকেই ৰলি সাইকো-সেন্টমেন্ট (Psycho- sentiment)। প্রায়ই প্রত্যেক ধর্মমতই একটি না একটি ভৌতিক বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কোথাও চাঁদকে, কোথাও সূর্যকে, কোথাও বা কোন পাথরের

মূর্তিকে কেন্দ্র করে, বিভিন্ন ধর্মমতের সৃষ্টি হয়েছে। পরের দিকে মানুষ ওই সমস্ত মূর্তি বা ভৌতিক বস্তু, যাকে সে পূজো করে, তার জন্যে একটা দর্শন আবিষ্কার করেছে। সীমার দ্বারা, সীমিত বস্তুর দ্বারা অসীমকে পাওয়া যায় বলে তারা দার্শনিক যুক্তির প্রচার করে গিয়েছে। ইটে গড়া মন্দির-মসজিদ প্রভৃতিকে তারা পবিত্র বলে পূজা-অর্চনা করা শুরু করেছে। এইভাবে ভৌতিক বস্তুর সঙ্গে থাকতে থাকতে, তাকে আরাধ্য ৰলে ভাবতে ভাবতে এক দৃঢ় মনোভাব গড়ে ওঠে, এই মনোভাব সম্পূর্ণ অন্ধ। কোন যুক্তি সেখানে কাজ করে না। যেমন ধরা যাক্ গোরু। হিন্দুরা গোমাতাকে পবিত্র ৰলে, দেবতা ৰলে পূজো করে। এর কারণ হ'ল গাই দুধ দেয়। যদি দুধ দেওয়ার জন্যে গাই মা হওয়ার যোগ্য তবে মহিষকেও মা ৰলে ডাকতে দোষ কোথায়? বরং গাই-এর থেকে মহিষ আরো বেশী দুধ দেয়। কিন্তু এই ধরণের যুক্তিতর্ককে তারা মানতে রাজি নয়। কারণ গাই-এর প্রতি তাদের যে মনোভাব-যে রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট গড়ে উঠেছিল তার শেকড় মনের গভীরে প্রবেশ করেছে। এই ৰদ্ধমূল ধারণা শিশু-অবস্থা থেকে পিতামাতার কাছে শুণতে শুণতে মানুষের মনে আরও বদ্ধমূল হয়ে যায়। তখন এদের পরিত্যাগ করা

বা তার বিরুদ্ধে চিন্তা করা হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। বিজ্ঞানের ছাত্র চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণগুলি ভালোভাবেই অধ্যয়ন করেছে। সে ভালভাবেই জানে যে রাহু বা কেতুর গ্রাসে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কিন্তু তবুও তার বদ্ধমূল সংস্কারের জন্যে সে গ্রহণের সময় গঙ্গা নদীতে স্নান করতে যায়, এটা শুধু অন্ধ বিশ্বাস।

এই ফিজিক্যাল সেন্টিমেন্ট (Physical sentiment)-এর তরঙ্গ যখন যুক্তির তরঙ্গ থেকে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে পড়ে তখন তাকে ৰলে অন্ধ বিশ্বাস বা ধর্মান্ধতা। তখন তারা এই কথা প্রচার করে যে– "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর"–'মজহৰমে আক্কল কা দখল নেহি হ্যায়'। ভারতবর্ষে অবশ্য ধর্মমতের জন্যে খুব বেশী উন্মত্ততা দেখা দেয়নি। অন্যান্য ধর্মমতে এই উন্মত্ততা প্রকটভাবে দেখা যায়। এর ফলে পৃথিবীতে কত শত যুদ্ধ হ'য়ে গেল। সামান্য একটি চুল নিয়ে কত শত মানুষের অমূল্য জীবন ধ্বংস হয়ে গেল। যারা ধর্ম নিয়ে উন্মাদ, তাদের বোঝান অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, তাদের মতে অপরের কথা শোণাও মহাপাপ। এসৰ কিছুই আর কিছু নয়, নিছক সেন্টিমেন্ট (sentiment), কোন

বিশেষ ধর্মমতে গোমাংস খাওয়া পাপ, কিন্তু খাদ্যের জন্যে হরিণ বা ছাগ-হত্যা পাপ নয়। এর মধ্যে কোন যুক্তি নেই।

এইভাবে সেন্টিমেন্টের ফলে বিশেষ বিশেষ আচার অনুষ্ঠানের (Ritualistic observance) জন্ম হয়েছে। যেমন, প্রদীপকে এইভাবে জ্বালাতে হবে, এইভাবে ধরতে হবে, এইভাবে বলতে হৰে, এইভাবে দাঁড়াতে হবে, এতবার কাণ ধরতে হবে, এতবার হাঁটু গাড়তে হৰে, এতবার নাকে খত দিতে হৰে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত হ'ল অন্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থা। এর পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাৰে না। এই বিশেষ বিশেষ বিধিব্যবস্থা অনুসরণ করতে গিয়ে মন সর্বদা ওতেই ব্যস্ত থাকে। মন ভৌতিক বস্তুর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। মন যদি বস্তুকেই নিয়ে ব্যস্ত থাকল তৰে পরমাত্মার দিকে কী করে এগোনো যাবে।

অনেকে নিজেদের মন্দিরকেই একমাত্র পবিত্র স্থান বলে মনে করেন, কিন্তু হাস্যকর ব্যাপার হ'ল এই যে, যারা এই মন্দির তৈরী করে তারা ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য। মন্দিরে প্রবেশের অধিকার তাদের নেই। প্রত্যেক ধর্মমতের এক একটি ধর্মশাস্ত্র থাকে, আবার ওই শাস্ত্রকেও দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। ওই শাস্ত্র যে কাগজের তৈরী সে কাগজ হয়ত অন্য ধর্মমতের

লোকে তৈরী করেছে। ছাপান, বাঁধাই, সব কাজ হয়ত ওদের মতে বিজাতীয় লোক সম্পন্ন করেছে। কিন্তু পুস্তকটির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই তা পবিত্র ধর্মগ্রন্থে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন আর প্রথমে যারা গ্রন্থটি তৈরী করেছিল তাদের স্পর্শ করার কোন অধিকার থাকে না। শুধু পবিত্র ধর্মগ্রন্থই নয়, যে কোন পুস্তকই সরস্বতী দেবীর প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। সময়ে অসময়ে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করা ধর্মের অঙ্গ। অনেকে মাটির মূর্তি তৈরী করতে শত শত টাকা খরচ করে থাকেন। আবার সেই মূর্তিটি জাঁকজমক করে নদীতে বিসর্জন দেন। কিন্তু বিধর্মীরা কেউ যদি ওই মূর্ত্তির একটি আঙ্গুলও ভেঙ্গে দেয় তবে নর-রক্তের স্রোত সেখানেই বয়ে যাবে। এই ধরণের ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে যাঁরা রাষ্ট্র গড়ার কথা বলেন, তাঁরা মানুষের সমাজকে টুকরো টুকরো করে মানবতার অপূরণীয় ক্ষতি করৰার প্রয়াসী।

চিরাচরিত প্রথা (Tradition):

প্রাচীনকাল থেকে যে কাজ হয়ে আসছে, যে ধরণের আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে আসছে, মানুষ সাধারণতঃ তাকেই বিনা যুক্তিতে মেনে নেয়। প্রাচীনকাল থেকে সেমিটিক রেস (Semitic Race)-এর লোকেরা 'সুন্নাত' করত। মহম্মদ এই

ব্যবস্থাকে মেনে নেন। বর্তমানে তা এক ট্রাডিশান (Tradition) হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে সাহস করে না। প্রাচীন অস্ট্রিক গোষ্ঠীর লোকেরা সূর্য পূজা করত। উদ্দেশ্য ছিল, সূর্যকে সন্তুষ্ট করে অধিক বৃষ্টি ও শস্যের দান গ্রহণ করা। অস্ট্রিক শাখার সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর স্থান ছিল উচ্চে। তাই পূজাপার্বণে পুরোহিতদের কোন স্থান ছিল না। সূর্যকেও তাই তাঁরা নারীদেবতা বলে মনে করতেন। আর চাঁদকে বলতেন পুরুষ দেবতা। সূর্যকে মা বলে সম্বোধন করা হ'ত ও তাঁর সম্মানার্থে যে পূজা হ'ত তারই নাম ছট পূজা। মগধ দেশে ফসলের ঋতুতে এখনও দু'বার করে ছট পূজা হয়। এই ছট পূজার সেন্টিমেন্ট (sentiment) মগধ দেশে এত বদ্ধমূল হয়েছিল যে আর্য, ৰৌদ্ধ ও মুসলমানদের প্রভাব পড়া সত্ত্বেও এই পূজা এখনও পর্যন্ত হয়ে আসছে। এই পূজার বিধি-বিধানে কিছু পরিবর্তন যে হয়নি তা নয়। কিন্তু সমাজ থেকে তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ভারতীয় মুসলমানেরাও এই ছট পূজা করে থাকে। কোন কোন জায়গায় তারা নিজেরাই করে, আবার কোন কোন জায়গার হিন্দুদের দিয়ে করিয়ে নেয়। এই ছট পূজা

একটি চিরাচরিত বিশ্বাস। একালে দেশেও এইভাবে মুসলমানেরা সত্যনারায়ণের বা ওলাই চণ্ডীর পুজা করে।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল যে সমস্ত ধর্মমতের মধ্যে মানুষের প্রতি ঘৃণা, অন্ধ-বিশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ পরিদৃষ্টমান। এই ধর্মমতের দ্বারা মানুষের সমাজে একতা আনা সম্ভব নয়। এই ধর্মমতের পারস্পরিক পার্থক্যকে যথাসম্ভব হ্রাস করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু একথা মনে রাখতে হৰে যে এই ধর্মমতের অন্ধবিশ্বাসকে জোর করে দূর করা যায় না। কারণ মানুষের যার প্রতি এক সেন্টিমেন্ট গড়ে উঠেছে তাকে আঘাত করলে তাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির দ্বারা মানুষের এই বিশ্বাস যে অযৌক্তিক তা বুঝিয়ে দিতে হবে। তার জন্যে চাই যুক্তিপূর্ণ বৌদ্ধিক জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিক ব্যাখ্যার। মানুষের মনে ভয়বৃত্তি যখন তীব্র হয় তখন যুক্তিতর্ক থেকে অন্ধ বিশ্বাসকেই মানুষ প্রশ্রয় দেয়। যদি যুক্তির দ্বারা মানুষের ভয়কে দূর করা যায় তাহলে অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হয়ে আসবে। তাই যুক্তিপূর্ণভাবে মানুষকে দার্শনিক তত্ত্বগুলি ৰোঝাতে হবে। আবার ভৌতিক বস্তুর প্রতি যে মনোভাব গড়ে উঠেছে তা দূর করতে হলে যে বস্তুর প্রতি মনোভাব গড়ে উঠেছে সেই

বস্তুকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। অথবা মানবিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তার মনোভাবকে পরিবর্তন করে সেই বস্তু থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে। যেমন- যারা চাঁদকে দেখে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করে থাকে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে যদি তাকে চাঁদে গিয়ে থাকতে হয় তখন চাঁদের উদয়-অস্তের ওপর ভিত্তি করে ধর্মানুষ্ঠান উদযাপন করা যাবে না। সুতরাং বিজ্ঞান ও মানবিক যুক্তির দ্বারা অন্ধ বিশ্বাস দূর করতে হবে ও মানুষকে একই ধর্মের পতাকা-তলে একত্রিত করতে হবে।

ধর্মমতের অবদমন

কিন্তু এই সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের অভাবে বিভিন্ন ধর্ম-মতাবলম্বীরা অন্য ধর্মমতকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। ফলে পৃথিবীতে বয়ে গেছে রক্তের নদী। প্রাচীন ভারতের আর্যরা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ধর্মমতকে অবদমন করে বৈদিক ধর্মমতকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। বৌদ্ধযুগে, প্রধানতঃ বিম্বিসারের আমলে, বৌদ্ধধর্মমতকে অন্যান্য ধর্মমতের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পরে সনাতন ধর্মমতাবলম্বীরা বৌদ্ধদের ও জৈনদের জোর করে হিন্দুধর্মমতে পরিবর্তিত করেছে। মুসলমান রাজত্বে

ইসলাম ধর্মমতকে ভারত, পারস্য ও ইজিপ্টে জোর করে চালানোর অপচেষ্টা হয়। অসংখ্য ইহুদিকে খ্রীষ্টান ধর্মমতে পরিবর্তিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলেও হিন্দু ধর্মমতকে ধ্বংস করে খ্রীষ্টান ধর্মমতকে লোভ দেখিয়ে চাপান হয়েছে। আজও এই চেষ্টা ৰন্ধ হয়নি। এর ফলে ভারতের ধর্মীয় জগতে এখনও পারস্পরিক বিদ্বেষের অন্ত নেই।

এই ভেদ-বিভেদ দূর করবার উপরি-উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন না করে যাঁরা শুধু সমালোচনা ও নিন্দাবাদের মধ্য দিয়ে সমস্ত সমাধান করতে চান তাঁরা আরও নবতর সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছেন। তাই আজ মানুষের সামনে ঐক্যের বদলে অনৈক্যই বেশী। এই অনৈক্য দূর করবার জন্যে সদ্বিপ্রদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। এই সদ্বিপ্লেরাই বিভেদের ক্ষেত্রগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে যে সমস্ত ঐক্য-সূত্রের বন্ধনে বিশ্বমানবকে বাঁধা যায়, তাকেই দিয়ে যাৰে উপর্যুপরি উৎসাহ ও প্রেরণা। তখনই গড়ে উঠৰে এক ও অবিভাজ্য সমাজ, আর সে সমাজের নাম হৰে মানবসমাজ।

২০২

মানব সমাজ এক ও অবিভাজ্য-২

আমি দীর্ঘকাল ধরে বলে আসছি যে মানব সমাজ এক, অখণ্ড ও অবিভাজ্য সত্তা (Human society is a singular entity, human society is indivisible)। মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রেষণায় এই সত্যকে ভুলে থাকে, ভুলে থাকতে চায়। মনে রাখতে হবে যে ভোলা আর ভুলে থাকা-দু'টো এক জিনিস নয়। তোমাদের অতীতের কত আপন জন, কত আদরের-কত ভালবাসার সম্পদ পৃথিবী থেকে চলে গেছে। তোমরা কি তাদের ভুলে গেছো? ভুলে যাওনি, ভুলে রয়েছো।

"ভুলে থাকা, সে তো নয় ভোলা
বিস্মৃতির মর্মে পশি' রক্তে
মোর দিয়েছে যে দোলা।"

মানুষ ভুলে থাকে অনেক কিছুই। কারণ সবকিছু মনে রাখতে গেলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সে দিক দিয়ে দেখতে

গেলে এই ভুলে থাকাটা মানুষের কাছে একটা আশীর্বাদ। শোক-দুঃখের দিনগুলো, সেই ঝড়ের অশনিসম্পাতের দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিগুলো সৰ সময়ে কী মনে রাখলে চলে! মনে থাকলে বেঁচে থাকা যায় না। কিন্তু এই যে মানুষের সমাজ এক ও অবিভাজ্য (one and indivisible)-এই কথাটা মানুষ ভোলে না, ভুলে থাকে ও ভুলে থাকে অনেক ক্ষেত্রেই স্বার্থের প্রেরণায়। স্বার্থের প্রেরণায় সব মানুষ এক।

এখন লোকে এই মানুষকে ধনী-দরিদ্র অথবা পণ্ডিত-মূর্খ ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করে। আজ যে ধনী কাল সে দরিদ্র হয়ে যেতে পারে। আজ যে দরিদ্র কাল সে ধনী হয়ে যেতে পারে সুতরাং দারিদ্র্য অথবা ধনাঢ্যতার দ্বারা স্থায়ী ভেদ মানুষের মধ্যে তৈরী করা যায় না, সম্ভবও নয়। আজকে যাকে শোষক বলে ঘৃণা করছি, হয়তো বা ঘৃণা তার প্রাপ্য, যেহেতু সে শোষক। কিন্তু, সেই শোষকও হয়তো দৈব-দুর্বিপাকে কালকেই শোষিতের পর্যায়ে নেৰে আসতে পারে। রাতারাতি কি সেই মানুষটা পাল্টে গেলো, তা তো নয়। শোষকের ভূমিকা থেকে শোষিতের ভূমিকায় এসে গেলো অথবা আজ যে শোষিতের ভূমিকায় আছে কাল সে শোষকের ভূমিকায় চলে যেতে পারে। সুতরাং তা নিয়ে মানুষ জাতের

মধ্যে স্থায়ী ভেদ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শোষিত মানুষটাও মানুষ, শোষক মানুষটাও মানুষ। এই যে ভেদরেখা, সেই ভেদরেখাটার নাম হ'ল শোষণ। সমাজ থেকে আমরা শোষণ যদি তুলে দিই তখন শোষক আর শোষিতও থাকবে না। মূল ব্যাধিটা শোষণ। শোষণ দূর করতে পারলেই শোষক-শোষিতের ভেদরেখা থাকৰে না। সুবিধাবাদী যারা মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে চলেছে, তারা আর ভেদ সৃষ্টি করবার কোনো অবকাশ পাৰে না, সুযোগ পাৰে না। তাই বুদ্ধিমান মানুষেরা, যাঁরা মানুষ সমাজের কল্যাণ চান, তাঁরা মানুষ-সমাজ থেকে এই শোষণ জিনিসটাই তুলে দেবেন। তার ফলে শোষক-শোষিতের যে সংঘাত, সেটাও শেষ হয়ে যাৰে। মানুষ মানুষ ভাই-ভাই, যা পরম সত্য সেইটাই মানুষ অহর্নিশ উপলব্ধি করবে, অনুভব করবে। মানুষে মানুষে অনেক সময়ে মতবাদগত মতভেদ দেখা দেয়। এগুলো কী? মতবাদের ভেদ জিনিসটা কী?

যে জিনিসটাকে মানুষের ভালো লেগেছে-যে আদর্শটাকে বাযে পথটাকে, সে সেই পথে চলেছে, সেই পথেই চলুক না। কোন একটা তত্ত্ব কারো ভালো লেগেছে, সে সেই পথেই চলুক না। তাতে মানুষে-মানুষে সংঘাত বাধৰে কেন? বাধতেই পারে

না। সুতরাং এক অবিভাজ্য মানুষ-সমাজকে কেবল যদি মতাদর্শের ভিত্তিতে ভাগ করা হয় সেটাও হৰে সম্পূর্ণ একটা দুষ্ট পরিকল্পনা। মতবাদের ভেদ থাকলেই যে তারা পাশাপাশি থাকতে পারে না, তা তো হতে পারে না। এক বাড়ীর চারটে ভাইয়ের চারটে মতাদর্শ থাকতে পারে বৈ কি। হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে যে এমন কোন মতাদর্শ যেন না হয় যা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, যা অখণ্ড মানুষ জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, সেই ধরণের মতাদর্শকে সহ্য করা চলবে না। কারণ তা মানুষ জাতের পক্ষে আত্মঘাতী। অন্যথায় বিভিন্ন মতাদর্শ তাদের টীকা-টিপ্পনী নিয়ে এগিয়ে চলুক, কারও কিছু বলবার থাকা উচিত নয়। কারণ এই বৌদ্ধিক সংঘাত ও সমিতির মাধ্যমেই মানুষের মনীষা এগিয়ে চলে। সুতরাং মনীষার প্রগতির দ্বার অবরুদ্ধ রাখৰ কেন? বাইরের আলো হাওয়া আসুক, তাতে মনীষা পরিপুষ্ট হৰে।

অনেকে জাতি বা race এর কথা তোলেন বা ভারত বা এরকম কয়েকটা দেশের কথা ওঠে। Race বা জাত যদি আমরা দেখি, সে তো ঠিক সেই একই ব্যাপার। কারো চামড়া কালো, কারো হলদে, কারো বা শাদা। এতে ভেতরের মানুষটার কী তফাৎ আসছে? কোন তফাৎই আসছে না। একই মায়ের

দুই ছেলে–কেউ ফরসা, কেউ কালো। তবে তারা কি জাতে–জাতে লড়াই (racial fight) শুরু করে দেবে? কালো কালোর দলে যাবে, ফরসা ফরসার দলে যাবে? এ পাগলের প্রলাপোক্তি। গায়ের চামড়ার সঙ্গে ভেতরের মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। আর জাতপাত–সে তো সম্পূর্ণ একটা লোক–ঠকানো জিনিস।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্যোঽভবৎ।
মধ্যতদস্য যদ্বৈশ্যঃ মদ্ভ্যাংশূদ্র অজায়ত।।"

যারা জাতপাতের সমর্থক, তারা বলে সেই পরমপুরুষের মুখ থেকে বেরিয়েছে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য আর পা থেকে শূদ্র। সেই পরমপুরুষের পায়ে, পরমপুরুষের চরণে সবাই আশ্রয় নিতে চায়। সুতরাং যে শূদ্র পরমপুরুষের চরণ থেকে সৃষ্ট, সে তো সবাইকার নমস্য। সুতরাং জাত–পাত যেমন ভিত্তিহীন, সেই রকম ভিত্তিহীন হচ্ছে তৎসমর্থিত শাস্ত্রগুলোও, এর পেছনে কেবল ছিলো কী– না, ব্যষ্টিগত স্বার্থ। এমনকি, কোন সামূহিক স্বার্থও নয়।

পরবর্তীকালে সেই ব্যষ্টিগত স্বার্থগুলো মিলিত হয়ে সামূহিক স্বার্থে রূপান্তরিত হয়েছিলো।

এরপরে আসছে ধর্মমত (Religion)। রেলিজনের ভিত্তিতে মানুষ দল পাকিয়েছে, মানুষে মানুষে হানাহানি করেছে। নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে অতীতে। আমি কারো কোন রেলিজনের নাম না নিয়ে বলৰ–না, অধিকাংশ রেলিজনই যুক্তির পথ মাড়ায়নি। মানুষের মধ্যে এক এক ধরণের সস্তা সেন্টিমেন্ট (sentiment) অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার বুদ্ধি-বৃত্তিকে খর্ব করে দিয়েছে, তার বিচারের পথ নষ্ট করে দিয়েছে। "মর্মে অল্লকা দখল্ নেহি হৈ"– এই বলে তার স্বচ্ছ বিচারধারাকে পঙ্কিল করে দেওয়া হয়েছে। 'তোকে মানতে হবে'-এই হ'ল নির্দেশ। যদি সে যুক্তি দেখাতে চায়, সেইজন্যে তার মনে ভীতম্মন্যতা (fear complex) ঢুকিয়ে দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে– "এটা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, তোকে মানতে হবে"। ভয়ে মানুষ মেনেছে। এই তো রেলিজনের মূল কথা। আর এরই ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে অং বং খং করে দুর্বোধ্য ভাষাতে রচিত অজস্র তথাকথিত শাস্ত্র। যা মানুষের উন্মুক্ত মানসিকতাকে ধ্বংস করে দেয়, তা শাস্ত্র নয়। পক্ষান্তরে

যা মানুষের বিকাশকে উন্নত করে, উৎসাহিত করে তাই হ'ল শাস্ত্র।

"শাসনাৎ তারয়েৎ যস্তু সঃ শাস্ত্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"

যা মানুষকে শাসন করে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ভূমার পথে, শ্রেয়ের পথে নিয়ে যায় তাই হ'ল শাস্ত্র, বাকীরা শাস্ত্র নয়। বাকীদের কাজ হচ্ছে মানুষের মনে অযথা ভীতম্মন্যতা জাগিয়ে দেওয়া। স্বর্গের লোভ, নরকের ভয়–মানুষের মনে এই সমস্ত জাগিয়ে দিয়ে মানুষের মানসিকতা তথা মানবিকতাকে নষ্ট করা। সুতরাং এই রেলিজন তো মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করবেই। তার ক্ষুদ্র স্বার্থের প্ররোচনাতেই সে তা করবে। বুদ্ধিমান মানুষ তার নাগপাশে কেন আৰদ্ধ হবে? না, কিছুতেই হবে না। যদি তা হয়, তবে বুঝবে ৰৌদ্ধিক বিচারে সে দেউলিয়া হয়ে গেছে। পৃথিবীর সৰ দেশের সব মানুষই এই ধরণের এক গোষ্ঠীভুক্ত জীব; এই রেলিজনই হয়তো মানুষের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে, কারণ এই রেলিজনের নাম করেই মানুষে মানুষে হানাহানি সবচেয়ে বেশী হয়েছিলো। আজকে দিন এসেছে সেই হানাহানি চিরদিনের জন্যে বন্ধ

করবার। তারপরে আর একটা জিনিস আছে যা স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে শুণতে কটু লাগে। তবু বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই আজ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তা হচ্ছে এই মনগড়া ন্যাশান্যালিটির দেওয়ালগুলো। যশোর শহর আর বনগাঁ শহর যা ছিলো এক রাষ্ট্রের অধীনে, হঠাৎ কিছু সংখ্যক মানুষের কী খেয়াল হ'ল, নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে যশোর শহর আর বনগাঁ শহরকে দু'টো আলাদা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে দিলে। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ, যিনি যশোরে আছেন, একদিন সুপ্রভাতে শুণলেন যে তিনি পাকিস্তানী, আর বনগাঁয়ের মানুষ সে কিছুই জানে না–জমি চাষ করতে করতে শুণলো, সে ভারতের নাগরিক। ওপরতলা থেকে এই বিধানটা হয়ে গেলো, সাধারণ মানুষ জানতেও পারলো না। সাধারণ মানুষ জানতেও পারলো না কার পাপে তাকে উদ্বাস্তু হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে। তারা শত্রুকে চিনতেও পারলো না, কারা তাদের এইভাবে ভিটেমাটি ছাড়া করলো। এই তো ন্যাশানালিটি, এর মূল্য কতটুকু যা এক রাত্তিরে পাল্টে যায়? এই জিনিসগুলোর ভিত্তিতে কি কখনো মানুষ জাতের মধ্যে কোন ভেদরেখা, কোন সীমারেখা টানা চলে? না, টানতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ? এগুলো সম্পূর্ণ কষ্ট–কল্পিত জিনিস,

আরোপিত জিনিস যার পেছনে উন্নত মানসিকতার কোন সমর্থনই নেই। মানুষের বিবেকের কোন সমর্থনই নেই। সম্পূর্ণরূপে বাইরে থেকে অধ্যারোপিত একটা জিনিস। সুতরাং এর দ্বারা আমরা মানুষ জাতের মধ্যে কোন ভেদ সৃষ্টি করতে পারি না। 'মানুষ জাতি এক ও অবিভাজ্য।'

অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন ভাষার লোক একই ন্যাশানালিটির মধ্যে রয়ে গেছে, আবার একই ভাষার লোক বিভিন্ন ন্যাশান্যালিটির মধ্যে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে জিনিসটা একেবারেই অর্থহীন, বিচারবুদ্ধিবর্জিত জিনিস। যা বিচারবুদ্ধিবর্জিত, তোমরা জেনে রাখবে, চোখ কাণ বুজে মন্তব্য করতে পারবে যে জিনিসটা স্বার্থপরতার দ্বারা প্রেষিত, এর পেছনে আর কিছুই নেই। বিচারবুদ্ধিই যখন নেই সেখানে স্বার্থপরতা ছাড়া আর কী থাকতে পারে? কিছুই নেই। নৈবেদ্যের মণ্ডাটির মতো থেকে কিছুসংখ্যক লোক তাদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করে চলেছে। আর অগণিত সাধারণ মানুষ, সেই মণ্ডার ভার বয়ে চলেছে। বিনিময়ে তারা কিছুই পাচ্ছে না। আমি একবার বলেছিলুম যে, রবীন্দ্রনাথের কথায় যে সাধারণ মানুষ, যারা নিপীড়িত-লাঞ্ছিত-অবহেলিত-অবদমিত তারা হচ্ছে পিলসুজের মতো আর

সমাজের মাথায় যারা বসে আছে তারা প্রদীপের মতো। প্রদীপের আলোতে সবকিছুই আলোকিত হচ্ছে, কিন্তু পিলসুজটা অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রদীপের পোড়া তেল সেই পিলসুজের গা বেয়ে নীচে নেৰে আসছে। ন্যাশান্যালিটি জিনিসটা তো ঠিক সেই ধরণেরই জিনিস। এর পেছনে তিলমাত্র যুক্তি নেই; যুক্তিবাদের কোন অবকাশই নেই। সুতরাং মানুষ জাতিকে খণ্ড খণ্ড করৰো কোন্ যুক্তিতে? মানুষ সমাজ এক ও অবিভাজ্য। Human society is a singular entity.

আর সবচেয়ে শেষে আজকের ভাষা। ভাষা হ'ল ভাব প্রকাশের একটা বাহন মাত্র। আর এই ভাষার অভিব্যক্তি কীভাবে হয়? না, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, দ্যোতমানা, বৈখরী, শ্রুতিগোচরা–ভাষার অভিব্যক্তির এই ছ'টা স্তর। মূলাধারে পরাশক্তি, সমস্ত অভিব্যক্তির বীজ যেখানে নিহিত রয়েছে, ৰীজকে ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়নি। ভাবের বীজ, তাকে বলা হয় পরা। স্বাধিষ্ঠানে পশ্যন্তী, অর্থাৎ সেই ৰীজ যখন অঙ্কুরিত হচ্ছে, সেই যে স্তরটা সেইটা হ'ল পশ্যন্তীর অর্থাৎ ভাবকে সংহত করা হচ্ছে, তাকে একটা চিত্র দেবার জন্যে, একটা picture দেবার জন্যে। অর্থাৎ কী বলতে চাইছি, সেটা মনে দেখতে পাচ্ছি তাই এটার নাম পশ্যন্তী। তারপরে মণিপুরে

মধ্যমা। মধ্যমা হচ্ছে কী? না, এবার ভাবকে রূপান্তরিত করৰার আকুতি দেখা দিয়েছে। বাংলায় অনেক সময় আমরা ভুলে গেলে বলি যে পেটে আসছে মুখে আসছে না। অর্থাৎ মণিপুরে এসে গেছে, কিন্তু তাকে ভাষায় transmission করতে পারছি না, স্মৃতিভ্রংশের দরুণ স্মৃতিটা একটুখানি পুরানো হয়ে গেছে, তাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই ভাবটাকে ভাষায় ঠিক রূপ দিতে পারছি না–সেইটাই হ'ল 'পেটে আসছে মুখে আসছে না'। এবারে এই মধ্যমার পরের ধাপটা হচ্ছে দ্যোতমানা, এবারে ভাবকে ভাষায় রূপ দিচ্ছি। সে কাঁপছে, দ্যোতমানতা (vibration) দেখা দিয়েছে– তাই দ্যোতমানা। তারপরে দ্যোতমানা যখন কণ্ঠে আসছে, ভোকাল কর্ডে (vocal cord) আসছে তখন সে স্থূল ভাষায় রূপ নিচ্ছে। সেটাকে বলা হয় বৈখরী শক্তি। বৈখরী শক্তি হ'ল–ভাবের ভাষায় রূপান্তরণ হয়ে যাচ্ছে। আর শেষে হচ্ছে শ্রুতিগোচরা। এখন জিবের সাহায্য নিয়ে সেই বৈখরী শক্তি বাইরে ভাষার রূপে ব্যক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই ছ'টা হ'ল ভাষার অভিব্যক্তির স্তর। সব ভাষায় পরা আর দ্বিতীয় স্তর পশ্যন্তী এক; তৃতীয় মধ্যমা এক, চতুর্থ দ্যোতমানা সেও এক। পঞ্চম বৈখরী আর ষষ্ঠ শ্রুতিগোচরা, কেবল এই দু'টো আলাদা।

সুতরাং ভাষার ভেদে মানুষে মানুষে ভেদ কী করে করতে পারি! একটি ইংরেজীভাষী ছেলে যদি ছোটবেলা থেকেই ৰাঙালী পরিবারে মানুষ হয়, বাংলাই হয়ে যাৰে তার স্বাভাবিক ভাষা ও তার ষোল আনা টানটা ৰাংলা ভাষার প্রতিই হবে। কারণ সে গোড়ার থেকে ৰাংলা শুণেছে বলে তার বৈখরী আর শ্রুতিগোচরা বাংলা হয়ে যাচ্ছে। আবার তারই ভাই হয়তো মানুষ হয়েছে জার্মান পরিবারে। তার ভাষা হয়ে গেছে জার্মান, সুতরাং ভাইয়ে ভাইয়ে তারা কি লড়াই করবে? তা করবে না।

সুতরাং ভাষা নিয়ে যারা সংগ্রাম করে, তারা সেই ধরণের অন্যায় কাজ করে। তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট ভাষায় বলৰো, কোন ভাষাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা চলবে না। দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করলেই ফল অত্যন্ত খারাপ হবে। কারণ মানুষের বৈখরী, শ্রুতিগোচরা–এই দু'টো শক্তির ওপর বাইরের চাপ কেউ সহ্য করবে না।

কোন ভাষার ওপরেই অবিচার করা চলবে না। সকল ভাষাকেই সমান মর্যাদা দিতে হবে। সব ভাষা পরমপুরুষের

ভাষা। মনে রাখতে হৰে, প্রতিটি ভাষাই পরমপুরুষের ভাষা। আমি তার মধ্যে থেকে একটি, দু'টি, তিনটি ভাষা বা দু'শো, চারশো পাঁচশো ভাষা জানি–তার মানে এই নয় যে আমি যে ভাষাগুলো জানি না সেগুলো পরমপুরুষের ভাষা নয়। সুতরাং ভাষাগতভাবে মানুষকে বিভাজিত করতে পারি না। কিন্তু এক্ষেত্রে যেমন, nationalism-এর ক্ষেত্রেও আমি সতর্কবাণী দোৰ যে, ক্ষুদ্র nationalism মানব সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর, ও মানব সভ্যতার যাঁরা সামূহিক কল্যাণ চান তাঁরা যত শীঘ্র সম্ভব পাসপোর্ট, ভিসা, পারমিট ইত্যাদি প্রথাগুলো উঠিয়ে দেবেন, অন্যথায় ফল ভালো হবে না। ঠিক তেমনি আমি ৰলৰ, তেমনি আমি সতর্ক বাণী দোৰ কোন ভাষাকে যেন দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা না হয়। ভারতবর্ষেই ইংরেজ আমলে ভাষাগুলোকে যে পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিলো দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে স্বাধীনতার পরে তা হয়নি। কতকগুলো ভাষাকে টুটি চেপে মারার চেষ্টা করা হয়েছে, যার ফল ভাল নয়। যারা এই ধরণের অবিচার করেছে তারা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়।

মানুষ জাতকে আমি দরিদ্র–ধনী অথবা পণ্ডিত–মূর্খ এভাবে বিভক্ত করতে পারি না। মানুষ জাতকে মতাদর্শ

নিয়েও বিভক্ত করতে পারি না। মানুষের ছোটখাটো ব্যাপারে মতভেদ তো থাকৰেই। কেবল দেখতে হবে সেই মতভেদগুলো মানবিক আদর্শের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কি না। যদি মানবিক আদর্শের বিরুদ্ধে যায় সেখানে কঠোরহস্তে প্রতিবাদ করতে হবে, অন্যথায় নয়। মানুষকে তার মতাদর্শ নিয়ে থাকতে দাও, তাতেই মনীষার বিকাশ ঘটবে।

আবার race-এর ব্যাপারে শাদা–কালো, আর্য–নিগ্রো এসমস্ত ভেদও চলে না। একই জিনিস, কেবল চামড়ার রঙে তফাৎ; আর রেলিজন আগেই ৰলেছি, রেলিজন জিনিসটাই ভুয়ো। রেলিজন জিনিসটাই চোরাবালির ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্পিরিচুয়ালিটি আর রেলিজন এক জিনিস নয়, সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। স্পিরিচুয়ালিটি হ'ল নিজের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয়ের সীমাহীন প্রয়াস। আর এই প্রয়াস ব্যষ্টিগত জীবনে তখন শেষ হৰে যখন মানুষ পরমপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করৰে ও সামূহিক জীবনে, সামূহিক ভাবে কোন কালেও সমগ্র মানব সমাজ এক সঙ্গে সমাধি লাভ করবে না। একসঙ্গে কখনোই মুক্তি বা মোক্ষ পাৰে না, এককভাবে এগিয়ে চলৰে, তাই spirituality-তে দরকার কী? না, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলো, সবাই সবাইকে সাহায্য করে যাও। সুতরাং

রেলিজন জিনিসটা কী? -না, আমারটা ভালো তোমারটা খারাপ–এই নিয়ে হানাহানি, বিচারবুদ্ধি খুইয়ে বসা, সুতরাং এভাবে মানুষকে ভাগ করা চলবে না। আর তারপর থাকছে কী?- না, ন্যাশান্যালিটি যেটা রাতারাতি পাল্টে যেতে পারে এতই ভুয়ো, এতই বাজে যে এক রাত্রে যশোরের মানুষ হয়ে গেলো পাকিস্তানী আর বনগাঁর মানুষ হয়ে গেলো ভারতীয়। সুতরাং জিনিসটা একেবারে বাজে। আর শেষে হ'ল ভাষা। ভাষার সঙ্গে ৰলে দিলুম ছটা ধাপ। তার মধ্যে শেষের দু'টো স্তরে মানুষে মানুষে তফাৎ হয়, বাকীগুলো এক। সব ভাষা পরমপুরুষের। সেইজন্যে বুদ্ধিমান মানুষ কখনও কোন ভাষাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করবে না। তার ফল ভাল হবে না, আর এই যে ভেদবুদ্ধি, যে কয়েকটা factor-কে উপলক্ষ্য করে মানুষ বাড়াতে চায় বা করতে চায়, এগুলো সমস্তই বুদ্ধিমান মানুষ বর্জন করে চলৰে, আর যখনই বাড়াবাড়ি দেখৰে, তখনই মানুষকে সংহত করৰার চেষ্টা করবে, কারণ এতে ব্যষ্টির লাভ নেই, সমাজের লাভ নেই বা সমাজের কোন ভগ্নাংশেরও লাভ নেই। মানুষ মানুষের সঙ্গে যত বেশী মিলে-মিশে হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলৰে, মানবজাতির তত বেশী কল্যাণ। কেউ যেন জীবনের কোন

ক্ষেত্রে ন্যাশান্যালিটিতেই হোক, ভাষাতেই হোক, রেলিজনেই হোক বা অন্য কোন কিছুতেই হোক, অন্যকে যেন দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা না করে। মানুষের মনীষার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ যেন সবসময় খোলা থাকে।

[১৭ই জুন, ১৯৭৯ কলকাতা]

কৃষি বিপ্লব

কোন দেশের অর্থনীতির বিকাশ নির্ভর করে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সামবায়িক শ্রমদানের ওপর। এই কারণেই প্রাচীন গৃহস্থালী অর্থনীতি থেকে ধীরে ধীরে শ্রমবিভাজন অবস্থার উদ্ভব হয়। শ্রমিক, কর্ষক, ছুতোর, কামার স্বর্ণকার, কুমার, বৈদ্য, কেরাণী প্রভৃতি প্রত্যেকের কার্যের মূল্যই অর্থনীতির সামুহিক বিকাশে সমান। প্রাচীন ভারতের অর্থনীতিতে সামরায়িক প্রচেষ্টা-ভিত্তিক ব্যবস্থার জন্যে এক স্থিতিস্থাপক অর্থনীতি বিদ্যমান ছিল। বৈদিক যুগে ভারতীয়

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণাশ্রমের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এই চতুর্বর্ণ গড়ে উঠেছিল ও এই চতুর্বর্ণ নিজ নিজ কর্ম সুষ্ঠু ভাবে করে যেত। একটি বিশেষ শাখা কৃষিকাজ করতো, ৰাকীরা করতো অন্য কাজ। সৰাই মিলে আজকার মতো কৃষি ক্ষেত্রে ভিড় জমাতো না। এই বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ছিল উত্তরাধিকারী সূত্রে আবদ্ধ। ফলে অর্থনীতিতে ভারসাম্যহানির সুযোগ ছিল কম। কৃষি-কাজও তখন হ'ত খুব পারদর্শিতার সঙ্গে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শস্যের চাষ, ব্যাপক কৃষিকার্য, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকারের ক্ষেত খামার, সার প্রভৃতির প্রয়োগ, শস্যের ব্যাধি দূরীকরণের ব্যবস্থা, নদী নালা কেটে জল সেচের ব্যবস্থা, কৃষি-কার্যের উপযোগী পশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে রাজা নিজে মনোযোগ দিতেন। জঙ্গল কেটে চাষযোগ্য জমির আয়তন বাড়ানো, যে সমস্ত জমিদার চাষ করতে না পারার জন্যে জমিগুলি অনাবাদি ফেলে রাখত, তাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে যারা চাষ করতে পারে তাদি'কে সুযোগ দেওয়া প্রভৃতি তখনকার রাষ্ট্রের কর্তব্য ছিল। জমির মূল্য নির্ধারিত হ'ত জমির উর্বরতা অনুর্বরতার ওপর। কৃষি উৎপাদিত দ্রব্যের

দাম রাষ্ট্র নিজে বেঁধে দিত। যার ফলে ব্যবসায়ীদের দ্বারা কর্ষকেরা শোষিত হবার সুযোগ প্রায়ই ছিল না।

কিন্তু ইংরেজরা ভারতে আসার পর অর্থনীতির এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ হ'ল দেশীয় কৃষি বা শিল্পের উন্নতির জন্যে ব্রিটিশ সরকার সর্বদা উদাসীন ছিল। তারা এরজন্যে কোন পরিকল্পনা করেনি বরং এমন এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল যার ফলে কেরাণী গোষ্ঠীর লোক তৈরী হতে থাকে। এদের ব্রিটিশ সরকার নিজেদের শাসন ব্যবস্থাকে মজবুত করবার কাজে লাগায়। লোকেরা তাদের পৈতৃক পেশা পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ শাসনের বিভিন্ন পদে চাকুরি নিতে শুরু করে দেয়। এর ফলে কৃষি ব্যবস্থার ওপর আঘাত লাগে বড় বেশী। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত দেশীয় শিল্প-কারখানা ছিল সেগুলিও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন-তাঁত শিল্প। ম্যানচেষ্টার থেকে মিলের তৈরী কাপড় সরবরাহ হওয়ার ফলে তাঁতের তৈরী কাপড়ের চাহিদা কম হয়ে যায়। এ্যালুমিনিয়ামের বাসন পত্র সরবরাহের ফলে ভারতের মৃৎশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। যে সমস্ত দু'চারটা কারখানা ওরা প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে পুরানো শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে

লোকে ধীরে ধীরে নিজেদের পেশা পরিত্যাগ করে কৃষিকার্যে ভিড় লাগাতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির ওপর চাপ আরও বাড়তে থাকে। পরিণতি স্বরূপ জমির ভাগ বাঁটোয়ারা বাড়তে থাকে ও সমগ্র কৃষিযোগ্য জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর ফলে উৎপাদনের হারও কমতে থাকে। বাহির থেকে খাদ্য আমদানি করে ভারতীয় অধিবাসীদের খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় খাদ্য আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ভারতের খাদ্য সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দেয়। বাঙলাদেশে ১৯৪৩ সালে যে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তা থেকে মুক্তি বা উদ্ধার পাবার জন্যে ওয়েবেল সরকার রেশন পদ্ধতি চালু করেন। এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করেও সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থায় সমস্যা তো সমাধান হয়নি বরং অধিকাংশ লোককে ধীরে ধীরে খাদ্যের রেশনিং-এর ফাঁদে পড়তে হয়।

ব্রিটিশ চলে যাবার পরও ১৯৪৭ সালে ১৪৫ লক্ষ লোককে রেশনের আওতায় আসতে হয়েছিল। এর ফলে কালোবাজারী, ব্যবসায়ীদের মুনাফাখোরী ও দুর্নীতি প্রভৃতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি

পায়। ভারতের জাতীয় সরকার সেদিন এই সমস্যা দূর করার জন্যে হঠাৎ এই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে উঠিয়ে দেন। এই হঠকারিতার জন্যে খাদ্যমূল্য অত্যধিক বেড়ে যায়। ফলে পুনরায় খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করতে হয়। পরে ভারতের নেতৃবৃন্দ 'খাদ্যের উৎপাদন বাড়াও' এই শ্লোগান ("Grow more food" campaign) দিয়ে খাদ্য-সমস্যা দূর করতে চেষ্টা করেন। তা কোন অংশেই সার্থক হতে পারেনি। এর কারণ হ'ল এই পদ্ধতিতে আবাদী জমির উৎপাদনকে বাড়ানোর জন্যে কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন না করে বন-জঙ্গল কেটে জমির পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা চলে। সে সমস্ত জমি চাষযোগ্য হবে কিনা, সে সব বিচার বিবেচনা না করে' জমির আয়তন বৃদ্ধিতে কোনই ফল হয় না। তাদের অধিকাংশ জায়গায় উপযুক্ত সেচব্যবস্থার সুবিধা না থাকার জন্যে কৃষিকার্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সর্বোপরি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আমলারা তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি গাফিলতি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কারণ দেশের শাসন-ব্যবস্থার নীতির ফলে কোন দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ নেই। এর ফলে অসৎ ব্যবসায়ীরা ভারতে কৃষিব্যবস্থাকে আধমরা করে রেখে, খাদ্য সমস্যাকে বাড়িয়ে নিজেদের স্বার্থ-পূর্তির অপচেষ্টা

চালিয়ে যাচ্ছে। সামগ্রিক বিচারে তাই ভারতের বর্তমান কৃষিব্যবস্থা অতীব দুর্বল।

যে কোন উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হ'ল যে শতকরা ৩০% থেকে ৪৫% ভাগ লোক কৃষি ও বাকী লোকেরা শিল্পে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকবে। কৃষিতে অধিক লোকের চাপ সুস্থ অর্থনীতির লক্ষণ নয়। কিন্তু ভারতের প্রায় ৭৫% ভাগ লোক জমির ওপর নির্ভরশীল। ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে এটি এক বিপজ্জনক লক্ষণ। যারা কৃষি-কাজে আত্মনিয়োগ করেছে তাদের বছরের মধ্যে বেশিরভাগ দিনই বেকার বসে থাকতে হয়। এতে করে মনুষ্যশক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছুই হয় না। ভারতের এই কৃষিসমস্যা দূর করা আশু প্রয়োজন। এরজন্যে অধুনা ভারতের এক বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠী কৃষিবিপ্লবের শ্লোগান দিতে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা চীনের কৃষিবিপ্লবের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে ভারতের সমস্যা সমাধান করতে চান, কিন্তু চীনের অর্থনৈতিক সমস্যা ও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাই কখনও সেখানকার Policy-তে এ-দেশের সমস্যার সমাধান হবে না। চীনের সমস্যা হ'ল কৃষি-ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করা সত্ত্বেও তার বিরাট জনসংখ্যাকে খাওয়ান

সম্ভব হয়ে উঠছে না। এই বিপুল জনসংখ্যার বাসস্থানের জায়গাও চীনে বর্তমানে নেই। তার ওপর জনসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে চীন প্রায় সমস্ত সম্পদ নিয়োজিত করে ফেলেছে। যে অল্প পরিমাণ শিল্পের সম্ভাবনা ৰাকী রয়েছে, চীন তা বর্তমানে ব্যবহার করে ভবিষ্যতকে আরও অন্ধকারময় করে দিতে চায় না বলে তার সংরক্ষণ করে চলেছে। সুতরাং চীনের অর্থনৈতিক সমস্যা এখন প্রধানতঃ তিনটি, ১। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে- খাদ্য সরবরাহ করা, ২। কৃষিকার্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোককে নিয়োজিত করা ও ৩। শিল্প-কারখানা প্রসার করে বাকি সংখ্যক লোকদের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

এই তিনটির কোনটাই তাড়াতাড়ি করে ফেলা সম্ভব নয় বলে মাওবাদে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। তিব্বত, ভারতবর্ষ ও সম্প্রতি রুশের ওপর চীনের যে হামলা তার মূলে রয়েছে এই জমির ক্ষুধা। এটাই চীনের পক্ষে এখন কৃষি বিপ্লবের চতুর পরিকল্পনা।

ভারতবর্ষের সমস্যা কিন্তু অন্য ধরণের। এখানে কৃষিব্যবস্থা তথা শিল্পবিপ্লবের উন্নতি করবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার হয়নি বলে তার এত অভাব। মূলতঃ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা দ্বিবিধ। ১। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করে, একটি বিশেষ সংখ্যক লোককে নিয়োজিত করে, এতে খাদ্য-সমস্যার সমাধান করা, ২। শিল্প-কারখানার প্রসার করে বর্তমানে জমির ওপর যে অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ রয়েছে তা কমিয়ে তোলা। সুতরাং ভারতের সমস্যা সমাধান করতে হলে জমির ক্ষুধা জাগিয়ে অপরের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিলে কিছু হবে না। অর্ন্তদেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধিই একমাত্র উপায়। সুতরাং যাঁরা ভারতের পথ চীনের কৃষিবিপ্লবের পথ বলে চিৎকার করেন তাঁদের চিন্তার গোড়াতেই গলদ রয়েছে।

ভারতবর্ষে আর একটি রাজনৈতিক শাখা কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চান, তাঁদের নীতি (Policy) হ'ল All power to masses, তাঁরা চান প্রত্যেকে কিছু না কিছু জমির মালিক হোক। Landless বা জমিহীন ভাবে কেউই থাকবে না। এই সেন্টিমেন্ট খুবই সস্তা সেন্টিমেন্ট (sentiment)। গরীব মানুষকে সহজেই এতে বশীভূত করা যেতে পারে। তাঁরা

জনসাধারণকে এইভাবে লোভ দেখিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার করে তুলেছেন। কারণ সাধারণ মানুষ এসব কিছুই বোঝে না। জমি নেই কিন্তু জমি পাৰ একথা ভেবেই সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এদের নিয়ে রাজনৈতিক নেতাগণ কাজ হাসিল করে নেন, এইভাবে বর্তমানে বিশেষ রাজনৈতিক দল জোতদারদের কাছ থেকে জোর করে জমি কেড়ে নিয়ে সাধারণ মানুষদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার পক্ষপাতী। তাই বর্গাদার ও জমিদারদের মধ্যে এক সংঘর্ষ তাঁরা সৃষ্টি করে দিয়ে মানবদরদী খেতাব পেয়েছেন। এখন দেখা যাক তাঁদের এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কতখানি ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়ক হবে। প্রথমতঃ অতিরিক্ত জমি যদি ভূমিহীন ব্যষ্টিদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় তবে প্রত্যেকের ভাগে সর্বাধিক হলেও তিন বিঘা চার বিঘা করে জমি পড়বে। এই তিন বিঘা জমি দিয়ে কখনও ইকোনমিক হোল্ডিং (economic holding) সৃষ্টি হয় না। কারণ এতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করা সম্ভব হয় না। যথেষ্ট জমি আইল সৃষ্টির জন্য নষ্ট হয়ে যায়। এই দুই কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিই এখন একমাত্র প্রয়োজন। তাছাড়া এই ধরণের জমি

বণ্টনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির আয়তন আরও ছোট হয়ে যাবে ও সমস্যা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকবে। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্টি হবে অসংখ্য পেটি বুর্জোয়া। পেটি বুর্জোয়া তাকেই বলে যারা অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্যে বাধ্য হয়ে জমি অপরকে দিয়ে চাষ করিয়ে আন্‌আর্নড ইনকাম (unearned income) পেতে চায়। এখানে তিন বিঘা করে জমি পেলে প্রথমে মানসিক সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে বটে কিন্তু চাষ করার পর যখন দেখা যাবে যে এই তিন বিঘাতে তার কোন উপকার হচ্ছে না তখন তার মন দুঃখে ভরে যাবে। এই তিন বিঘা জমি চাষ করার জন্যে তার সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য ব্যয় করতে হবে, ব্যষ্টিগত ভাবে চাষ করার ফলে উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই বিনিময়ে সে যতটুকু ফসল পাবে তাতে পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব হয়ে উঠবে না, তখন বাধ্য হয়ে সে জমিকে অপরকে দিয়ে নিজে অন্য কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করবে। ফলে পুনরায় জোতদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে ও এরাই হবে পেটি বুর্জোয়া। সুতরাং যাঁরা জোতদারদের ঘৃণা করে, জোতদারদের ধ্বংস করতে চায় বলে শ্লোগান দেন,

তাঁরাই রাজনৈতিক স্বার্থের জন্যে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে নোতুন জোতদারদের সৃষ্টি করে চলেছেন।

তৃতীয়তঃ জমি বণ্টনের আগে এরা জোতদারদের কাছ থেকে ধান কেড়ে নেওয়া, চুরি করে নেওয়া বা পাকা ধানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাজ করে জোতদারদের প্রতি এক প্রতিহিংসার ইন্ধন জুগিয়ে থাকে। এর ফলে এই সমস্ত জোতদারেরা সুরক্ষার অভাবে জমির উৎপাদনে ক্রমশই উদাসীন হয়ে যাবে। এই সবগুলো কারণ মিলিয়ে ভারতের যে প্রধান সমস্যা কৃষি–সমস্যা তার সমাধান না হয়ে বরং সেটা আরও বৃদ্ধি পাবে।

তাই ভারতের কৃষি–সমস্যাকে দূর করতে হলে চীনের পথ বা 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই নীতিতে কিছুই হবে না।

এরজন্যে সমস্ত কৃষি ব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তন করতে হবে। প্রগতিশীল তত্ত্ব অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সর্বপ্রথম economic holding করার প্রয়োজন। Economic holding-এর অর্থ হ'ল যেখানে input থেকে output বেশী হয়। এই economic unit-এ কোন বিশেষ আয়তন নির্ধারিত করা সম্ভব নয়। কারণ, input, output productivity প্রভৃতির দিকে

লক্ষ্য রাখতে হলে জমির উর্বরতা, জলবায়ু প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে বিচার করে' optimum size নির্ধারণ করতে হবে। আজকাল অনেকে বিশ্বাস করেন যে জমির আয়তন ছোট হলেও উৎপাদন বেশী হয়। তা ঠিক নয়, উৎপাদন বেশী হয় ব্যবস্থাপকের সময়মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৎপরতার ওপর। যদি ব্যবস্থাপককে পারদর্শী করে তোলা যায় তবে বড় বড় খামারগুলিতেও বেশী উৎপাদন হতে পারতো। অবশ্য, বড় খামারই যে হতে হবে তার কোন কথা নেই। মূল কথা হ'ল যে economic holding হওয়া চাই। রাশিয়ার মত বড় বড় collective farm করে' শতকরা পনের ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হবার পেছনে কোন বিবেকপূর্ণ যুক্তি নেই। তাই উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে ও বড় বড় শোষক জোতদার যাতে না গড়ে উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে, জমির উচ্চতম ও নিম্নতম আয়তন নির্ধারিত ক'রে দিতে হবে। নিম্নতম আয়তন হবে, একটি বিশেষ স্থানের economic holding-এর আয়তনের সমান। আর সর্বাধিক আয়তন নির্ভর করবে এই জমির উর্বরতা, সামাজিক উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার পারদর্শিতাকে বিচার করে। তাই economic holding-গুলি সাধারণতঃ একই সমতলে অবস্থিত জমি নিয়ে তৈরী হবে যাতে করে জলসেচের

ও কৃষিকার্যের সুবিধা হয়। এই সব কিছুকে মনে রেখে economic holding-এর আয়তন বৃদ্ধি করতে হবে। এই holding বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। একই দেশের মধ্যেও আবার তার আয়তন পরিবর্তন করতে পারে। যেমন গাঙ্গেয় উপত্যকার সমতল অঞ্চলে পাঁচ একর জমিতে যথেষ্ট উৎপাদন হতে পারে, আবার লাদাক বা ছোটনাগপুর পাহাড়ী এলাকায় ৫০ বিঘাতেও হয়তো জীবন রক্ষার মতও সর্বনিম্ন উৎপাদন হবে না। তাই এই দুই স্থানের ইকনমিক হোল্ডিং-এর আয়তন ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, শুধু জমি দিয়ে দিলেই কারোর সমস্যার সমাধান হয় না। জমির মালিকানাই বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল জমির উৎপাদন।

দ্বিতীয়তঃ জমির ব্যবস্থাপনার ভার একজনের হাতে থাকলেও আশা মত উৎপাদন হয়ে ওঠে না। কারণ ব্যষ্টিগত ভাবে আধুনিক উপায়ে চাষ করবার মত উপযুক্ত মূলধন লাগানো সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই জমির উৎপাদন ক্রমশঃ কমতে থাকে। তাছাড়া সুস্থ অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক। এই বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে সামবায়িক সংস্থার হাতে কৃষি ব্যবস্থাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে হঠাৎ করে সমস্ত জমির পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ, সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই জনমণ্ডলীর মিলিত শ্রমে ও বুদ্ধিতে, যে জনমণ্ডলী একই আর্থিক কাঠামোয়, একই প্রয়োজনের তাগিদ নিয়ে বাস করছে ও সামবায়িক ভিত্তিতে উৎপন্ন বস্তুর তৈরী বাজার মোটামুটি বিচারে হাতের কাছে পাচ্ছে। এই তিনটি তত্ত্বের একত্র সমাবেশ না হলে সংস্থাকে আর সামবায়িক সংস্থা বলা চলে না। তাই এইভাবে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে জমির ব্যবস্থাপনা সমবায়ের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। এর ফলে ব্যষ্টিগত অধিকারের দোষত্রুটি থাকবে না ও যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেওয়াও অল্পায়াসেই সম্ভব হবে।

সামৰায়িক সংস্থার হাতে জমি পরিচালনার ভার দেওয়ার জন্যে পরিকল্পনাকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে যত uneconomic holding রয়েছে তাকে ইকনমিক হোল্ডিং-এর লাভ গ্রহণের সুযোগের জন্যে সমবায়ের মধ্যে আসার নির্দেশ দেওয়া হবে। যে কয়েকটি লোকের জমি নিয়ে একটি ইকনমিক হোল্ডিং হ'ল তাদেরই নিয়ে গঠিত হৰে

পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের সমবায়। এখানে ব্যষ্টিগত মালিকানাকে স্বীকার করে নেওয়া হবে। যেমন কারোর পাঁচ বিঘা, কারোর তিন বিঘা জমি সমবায়ে রয়েছে। সমগ্র উৎপাদন থেকে নিজের নিজের জমির অংশ অনুযায়ী প্রত্যেকে ভাগ পাৰে। ব্যষ্টিগত মালিকানা কাগজপত্রে থাকলেও চাষ-কার্য সম্পন্ন হবে সামবায়িকভাবে। এর ফলে আল দিয়ে যে জমি নষ্ট হ'ত তা আর হবে না। বিহার ও ৰাঙলাদেশে কোন কোন জায়গায় আল দিয়ে যত জমি নষ্ট হয় তার থেকে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম। পূর্বোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সবাই লাভবান হবে। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে যাদের বর্তমানে ইকনমিক হোল্ডিং-এর মত জমি রয়েছে তাদের সমবায়ে যোগ দিতে না বললেও চলে। তবে যদি তার জমির সামূহিক পরিমাণ ইকনমিক হোল্ডিং হবার যোগ্য কিন্তু এই জমিগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট প্লট-এ বিভক্ত হয়ে আছে, তবে হয় সৰ জমিগুলি মিলিয়ে consolidation of holding করে নিতে হবে, না হলে যেখানে যেখানে ছোট ছোট আন-ইকনমিক প্লট আছে তার সংশ্লিষ্ট জমিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে সৰাইকে সমবায়ে যোগদান করবার জন্যে আহ্বান জানানো হবে। তৃতীয় পর্যায়ে জমির পুনর্বণ্টন করে বিবেকপূর্ণভাবে জমির মালিকানা দিতে হবে। এই বণ্টন ব্যবস্থায় কার কতখানি জমি হবে তা নির্ভর করবে দুইটি তত্ত্বের ওপর- (১) একটি পরিবার চালানোর জন্যে যতটা দরকার ও (২) নিজে যতটা চাষ করতে পারে তার ওপর। চতুর্থ পর্যায়ে আর মালিকানা নিয়ে কেউ কাড়াকাড়ি করবে না। তখন মানসিক বিস্তারে পরিবেশের আনুকূল্যে মানুষ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহকে পরিত্যাগ করে সামূহিক কল্যাণের কথা ভাৰতে শিখৰে। এই ধরণের পরিবর্তন নিশ্চয়ই একদিনে আসবে না। সময়-তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অভ্যন্তরীণ প্রেরণা (internal urge) ও বাহ্যিক চাপের (external pressure) মাধ্যমে সে মানসিক প্রস্তুতি না আসা পর্যন্ত জোর করে চাপাতে গেলে মানুষ তা গ্রহণ করতে পারবে না। তাই রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ এই সাধারণ মনস্তত্ত্বটুকু না বুঝে জোর করে সামবায়িক খামার (collective farm) তৈরী করতে গিয়ে দেশে বড় বড় দুর্ভিক্ষের ও অন্তর্বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল। তাকে প্রশমিত করতে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপায় অবলম্বন না করে বেওনেট ও তরবারির আঘাতে বহু

মানুষের প্রাণ হত্যা করতে হয়েছে। সদ্বিপ্ররা কখনও মনস্তত্ত্ব-বিরোধী কাজ করে' দেশের ও দশের সর্বনাশ ডেকে আনবে না।

সমবায় সম্পর্কে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। কারণ আজ বেশীর ভাগ দেশেই সমবায় অসফল হয়েছে। এই উদাহরণের ওপর ভিত্তি করে সমবায়কে দোষারোপ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না। কারণ সমবায়ের সাফল্যের যে অপরিহার্য তত্ত্ব তা বেশীর ভাগ দেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। সমবায়ের সাফল্য নির্ভর করে মূলতঃ তিন তত্ত্বের ওপর। নীতিবাদ, কড়া তত্ত্বাবধান (supervision) ও জনগণের হৃদয় দিয়ে সমবায়কে গ্রহণ। এ তিন তত্ত্বের মধ্যে যেখানে যতটুকু রয়েছে সেখানে সমবায় ততটুকুই সাফল্য অর্জন করেছে। যেমন ইসরায়েল চতুর্দিকে শত্রু বেষ্টিত হবার জন্যে ওখানকার জনগণের মধ্যে এক স্বয়ং-নির্ভরশীলতার চেতনা গড়ে উঠেছে। কারণ জনগণ মনপ্রাণ দিয়ে তাদের অর্থনীতিকে মজবুত করতে চায়। তাই সেখানে তারা সমবায়ের দ্বারা শুষ্ক মরুভূমিকে শস্যশ্যামল করে তুলেছে। ঠিক সেই মনোভাব ভারতে গড়ে তোলা হয়নি বলে সর্বত্র সমবায় অসাফল্যের নমুনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের সমবায় অর্থনীতির উন্নতির

জন্যে তৈরী হয় নি, তৈরী হয় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। তাই এখানে সমবায় সফল হওয়াটাই আশ্চর্যজনক হ'ত।

সমবায়ের জন্যে মানুষকে উৎসাহিত করতে হলে প্রথমে কয়েকটি সার্থক নমুনা তৈরী করা চাই, তার জন্যে পাইলট প্রোজেক্ট (pilot project), মেসিন ষ্টেশন (machine station), জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা, ভাল বীজ, শস্য বিনষ্টকারী পতঙ্গ প্রভৃতি থেকে শস্য উদ্ধারের পদ্ধতি প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যবস্থা করা উচিত। আর জনগণকে সমবায়ের উপকারের কথা শিক্ষা দেওয়া উচিত। তা না করে যারা উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে হাটে বাজারে চলচ্চিত্র দেখিয়ে জনমত গড়তে চায় তাদের মানবতার বড় শত্রু বলা ছাড়া উপায় নেই।

প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব অনুসারে কৃষি ও শিল্পে সর্বাধিক আধুনিকীকরণ দরকার। তাই সমবায়ের ভিত্তিতে যে কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠবে সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে হবে। এই আধুনিকীকরণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সুবিধা হবে। যেমন ট্রাক্টর ব্যবহার করলে গভীর পর্যন্ত মাটি খোঁড়া যায়। এর ফলে মাটির উপরিভাগ নীচে ও নীচের অংশ উল্টে ওপরে আসে। ওপরের অংশ চাষ হবার ফলে

তার উর্বরতা কমে যায়। তাই ট্রাক্টর ব্যবহারে নীচের মাটি ওপরে আসার ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে। আর যে ওপরের অংশ চাষের ফলে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল তা কিছুদিন নীচে গিয়ে বিশ্রাম নেবার সুযোগ পেলে তার উৎপাদিকা শক্তি ভবিষ্যতের জন্যে বেড়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ চাষীদের বলদ রাখবার দরকার হয় না। বলদ রাখলে বছরের মধ্যে ছয় মাস বিনা কাজে তাদের পালনের ঝামেলা ও খরচ বহন করতে হয়। আজকের যুগ বড় বড় জানোয়ারদের দিয়ে কাজ চালানোর যুগ নয়। ইয়ুরোপে ঘোড়া ও হাতীর ব্যবহার কমে আসছে। তাই যুগের সাথে তাল রেখে ট্রাক্টর (tractor) ব্যবহার করতে হবে–একটা ট্রাক্টর আট জোড়া বলদের সমান। যাদের মাত্র দু'বিঘা জমি রয়েছে তাদেরও যে দশ বিঘা জমির জন্যে বলদ রাখতে বা পালন করতে হয়, এটা একটা অযথা অর্থনৈতিক ক্ষতি। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে জমির ওপর বেশী লোকের মিছেমিছি চাপ পড়বে না। সেই উদ্বৃত্ত লোকেদের অন্য কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নতি করা যাবে। অবশ্য এর জন্যে সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ ক্ষেত্র তৈরী করে দিতে হবে। কম লোক দিয়ে কাজ করা হ'লে মজুরের জন্য যে খরচ হ'ত তা বাঁচবে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মেয়েরা

মাঠে জল খাবার জোগানো, খাবার পাঠানো প্রভৃতি ভারী ভারী কাজ করা থেকে রেহাই পেয়ে নিজেদের উন্নতির সময় পাবে। তাছাড়া, যন্ত্রীকরণের ফলে শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হবে। ফলে পল্লীবাসীদের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

প্রাউটের কৃষি ব্যবস্থায় দালাল বা মধ্যবর্তী ব্যষ্টিদের (intermediary) কোন স্থান থাকবে না। যারা নিজের মূলধনকে বিনিয়োগ করে' অপরের শ্রমে উৎপাদন করিয়ে মুনাফা লাভ করে তারাই হয় পুঁজিপতি। তারা অন্য মানুষের ওপর পরগাছার মত রস চুষে চুষে বেঁচে থাকে। কৃষি ক্ষেত্রে যারা মধ্যবর্তীর কাজ করে তারাই কৃষি-পুঁজিপতি। তারা অপরকে নিজের জমি দিয়ে চাষ করিয়ে নিয়ে ফসল নিয়ে নেয়। ভারতে এই দালাল (intermediary)-ব্যবস্থা ধারবাহিকভাবে চলে আসছে। জমিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, সেপত্তরিদার, জোতদার, অধিকারী প্রভৃতি ভারতের এই দালালের গোষ্ঠী। বর্তমান ভারতের জমিদারী বা বাটাইদার ব্যবস্থার লোপ করা হয়েছে। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের মনোভাব এখনও দূর হয়নি। বর্তমানের এই সামন্তরা জমির প্রকৃত মালিক নয়। তারা অপরের কাছ থেকে জমি 'লীজে' নিয়ে অপরকে দিয়ে

চাষ করিয়ে কিছু ধান জমির মালিককে দেয়। ফলে সে জমির প্রকৃত মালিক ও উৎপাদক কৃষক উভয়কেই শোষণ করে। এই মধ্যসত্বভোগীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। প্রাউট এই ধরণের মধ্যসত্বভোগীদের সমর্থন করে না। "লাঙ্গল যার জমি তাঁর" বা "ধান বুনে যে, ধান কাটে সে" এদু'য়ের কোন নীতিকেই অনুসরণ করা যায় না। কারণ এর ফলে পেটি বুর্জোয়ার সৃষ্টি হয়। প্রাউটের মতে, কৃষিবিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে সামবায়িক ব্যবস্থায় ব্যষ্টিগত মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে ও ব্যষ্টিগতভাবে শ্রম বিনিয়োগ করে চাষ করবার অধিকারও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমগ্র উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ এই মজদুরদের পারিশ্রমিকের জন্যে দিয়ে দিতে হবে। যার জমি সে পাৰে সমগ্র উৎপাদনের অর্ধেক, যারা তাদের শ্রম দিয়ে উৎপাদন করল তারাও পাৰে অর্ধেক ভাগ। এই অনুপাত কখনও কমৰে না, বরং বাড়তে পারে।

সমবায়ের পরিচালনার জন্যে যে ব্যবস্থাপক সমিতি (managerial staff) থাকবে তা তৈরী হবে তাদের নিয়ে যাদের এই সমবায়ে অংশ (share) রয়েছে। তারা হবে নির্বাচিত। এই ব্যবস্থাপক সমিতিকে অনারারি (honorary)

করা উচিত নয়। তাতে দুর্নীতির সুযোগ থাকে। তাই তাদেরও বৌদ্ধিক উপদেশের (intellectual advice) জন্যে ম্যান পাওয়ার (man power) অনুযায়ী বেতন দিতে হবে। তাছাড়া যারা সমবায়ের সদস্য তারা ইচ্ছা করলে দৈহিক শ্রমও নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু তার জন্যেও তাকে আলাদা পারিশ্রমিক দিতে হবে। তাই সদস্যরা দু'ধরণের অংশ পাবে– একটি তার জমির পরিমাণ অনুসারে আর দ্বিতীয়টি হ'ল তার শ্রম বিনিয়োগ বাবদ। কিন্তু এই অংশ দেবার জন্যে সমস্ত উৎপাদনকে সমান সমান দু'ভাগে ভাগ করতে হৰে অর্থাৎ ৫০ ভাগ শ্রমের জন্যে ও ৫০ ভাগ জমির জন্যে বন্টন করতে হবে। কৃষির উন্নতির জন্যে অনেক সময় টেকনিসিয়ান (technician) বা কৃষি–বিশারদের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাই উৎপাদক সমবায়গুলি এই ধরণের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করবেন। এর ফলে এই ধরণের শিক্ষিতদের বেকার বসে থাকতে হবে না বা গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও উন্নতি হবে। প্রাউট অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী। তাই বিশেষ এক স্থানের উন্নতি না করে সর্বত্র যাতে সমানভাবে প্রগতি হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্থানীয় সম্পদ ও শক্তি–সামর্থ্যকে প্রথমে নিয়োগ করার পরিকল্পনা

নিতে হবে। তাই স্থানীয় লোকদের প্রথমে কৃষি-সমবায়ে নিয়োগ করতে হবে। বর্তমান ভারতে অনেক উদ্বৃত্ত শ্রম ও ঘাটতি-শ্রম এ দু'ধরণের এলাকা থেকে লোক অন্য অঞ্চলে চলে যায়। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত শ্রম কথাটাই আপেক্ষিক। যেখানে উপযুক্ত অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়নি, সেখানে শ্রম উদ্বৃত্ত হয়ে যায়। সেইসৰ শ্রম অন্যত্র চলে যাবার মানেই হ'ল সেই অঞ্চলকে সৰ সময়ের জন্যে অনুন্নত করে রাখা। তাই প্রাউটের মতে যেখানে যেখানে উদ্বৃত্ত শ্রম অঞ্চল রয়েছে সেখানে অতি শীঘ্র স্থানীয় শ্রমিকদের চাকুরির বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। তাতে স্থানীয় অঞ্চলের লোকদের জীবন-যাত্রার মানেরও বৃদ্ধি সম্ভব হবে। যদি তা না করে স্থানীয় শ্রমকে অন্যত্র বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয় ও মার্কসবাদীদের "He who sows shall reap"-এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়, তবে যে সমস্ত চা বাগান বা কয়লা খনি অঞ্চল রয়েছে তার মালিক হয়ে বসবে বাইরের থেকে আগত শ্রমিকবৃন্দ আর স্থানীয় লোক সুযোগ পাবে না। এতে অতীব বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই প্রাউটের অভিমত হ'ল- স্থানীয় লোককে প্রথমে সুযোগ দেওয়া উচিত। যতক্ষণ না স্থানীয় লোকদের পুরোপুরি নিয়োগ করা যাচ্ছে ততক্ষণ

চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পরে মজুরীর চাহিদা না আসা পর্যন্ত নোতুন কোন উন্নতি-মূলক (Fresh Development Programme) কর্মসূচী নেওয়া হবে না। স্কেণ্ডিনেবিয়ান দেশগুলি নোতুন ডেবলপমেন্ট স্কিম্ (development scheme) নিচ্ছে না। স্থানীয় লোকদের চাকুরির বন্দোবস্ত করার সময় লোকাল সেন্টিমেন্টকেও (local sentiment) বিচার করতে হবে। যেমন ভারতের কতকগুলি প্রদেশের যে সকল উদ্বৃত্ত বৌদ্ধিক ভূমি (land of surplus intellect) আছে, যারা কেরানীগিরি করে, ৩০ টাকা পেলেও রাজী, কিন্তু কুলীর কাজ করবে না, তাদের সমস্যা তাই ভিন্ন রকমের, তাই তাদের সমস্যাকেও সেইভাবে সমাধান করতে হবে। সেই অঞ্চলের শিল্প কারখানায় যত কম পরিমাণ দৈহিক শ্রম লাগে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে বিভিন্ন সোসিও-ইকোনোমিক ইউনিট (socio-economic unit)-এ দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের উন্নতির পরিকল্পনা নিতে হবে।

কৃষির খাজনার জন্যে বর্তমানের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা সমর্থন করা যায় না, কারণ তাতে আয়কারী ও কর্ষক উভয়েরই অসুবিধা। ব্রিটিশ আমলেও যে জমিদারী ব্যবস্থায় কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল তাও ত্রুটিপূর্ণ। জমিদারদের জমির

পরিবর্তে বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা কর্ষককে দিতে হ'ত। বন্যা হলে বা কোন কারণে ফসল না হলেও এই নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতেই হ'ত। আর জমিদাররা শুধু পরগাছার মত বসে বসে খেত।

বর্তমানেও জমির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে কর নির্ধারিত হয়। তাই কোন বৎসর ফসল না ফললে সরকারকে করের পরিমাণ হ্রাস করতে হয়। আবার বেশী ফসল হলে লেবির দ্বারা কর বাড়াতে হয়। এর ফলে কর্ষকদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সব থেকে উত্তম ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন হিন্দুযুগে। তখনকার দিনে সমস্ত ফসলের ১/৪ অংশ দ্রব্যের মাধ্যমে রাজাকে কর দিতে হ'ত। এতে গোরু, ঘোড়া, ভেড়াও দিতে পারতো। এতে কর্ষকদের কর দানে কোন অসুবিধা হ'ত না, বর্তমানে নগদ টাকায় খাজনা দিতে গিয়ে ওদের খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ সবসময় কর্ষকেরা উপযুক্ত বাজার না পাওয়ার ফলে উৎপাদিত দ্রব্যকে বিক্রী করে নগদ টাকা জোগাড় করতে পারে না। তাই প্রাউটের মতে কর্ষকদের নিকট থেকে প্রকৃত উৎপাদিত ফসলের এক অংশ প্রত্যক্ষ কর আদায় করলে সরকারেরও সুবিধা কারণ বিভিন্ন স্থানে ভবিষ্যতের বিপদ-আপদের জন্য মজুত রাখার

সুবিধা হবে। প্রয়োজন মত সহজেই দুঃস্থ ব্যষ্টিদের সাহায্যে তা প্রেরণ করা সহজ হৰে। তাছাড়া শহরের চাহিদাও মেটানো যাবে।

উপযুক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতের অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তন করা সম্ভব। তাই শুধু বর্গাদাররা জোতদারদের পিটালে বা হত্যা করলেই বা কৃষিবিপ্লবের শ্লোগান দিলেই কাজ চলবে না। রচনাত্মক কাজ করে অর্থনীতিকে মজবুত করার মধ্যেই কৃতিত্ব। সন্দ্বিপ্রদের জনস্বার্থের খাতিরে সেই মহান দায়িত্ব নিতে হবে।

সামাজিক মূল্য ও মানবিক মৌল নীতি

সুদূর অতীত থেকে একে একে বিবর্তনের ধাপ পেরিয়ে মানুষ আজকের এই পরিবেশে এসে পৌঁছেছে। তার এই অবিরল যাত্রা কিন্তু একক নিঃসঙ্গ যাত্রা নয়। সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তার সমাজকেও। অতীতের সেই অবিকশিত অনুন্নত অবস্থাতেও মানুষ বাস করত বিভিন্ন গোষ্ঠীতে দলবদ্ধ

হয়ে। এর কারণ, মানুষ পারে না একা বাস করতে; পারে না তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খোরাক সংগ্রহ করতে। সমষ্টি ব্যতিরেকে ব্যষ্টির অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব, কারণ মানুষ এক সামাজিক জীব। মানুষের কথা ভাবতে গেলে স্বভাবতই তার সমাজও এসে পড়ে, তাই মানুষের অস্তিত্বের দু'টি দিক- একটা সে নিজে-তার ব্যষ্টির অস্তিত্ব আর দ্বিতীয়টি হ'ল সে সমাজের সদস্য-তার সমষ্টিগত অস্তিত্ব। এই দুই অস্তিত্ব থেকে মানুষের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। একটি হ'ল তার সামাজিক মূল্য আর অপরটি হ'ল তার মানবিক মূল্য।

মানুষের সামাজিক মূল্য নির্ধারিত হয় তার সামাজিক দায়িত্ব থেকে। সমাজের সদস্য হিসেবে তাকে বিশেষ কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। যে বড় দায়িত্ব পালন করে মানুষ স্বভাবতই তাকে মেনে নেয়-শ্রদ্ধা করে। কারণ এই দায়িত্ব পালনের মধ্যেই সকলের কল্যাণের প্রসঙ্গ জড়িয়ে থাকে। ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই পৃথিবীতে যেদিন ক্ষত্রিয় যুগ ছিল, সেদিন অন্যান্য শ্রেণী থেকে রাজা-রাজড়ারা পেত সব থেকে বেশী সম্মান। রাজদরবারে আবালবৃদ্ধবনিতা জনসাধারণ কুর্নিশ করত বাদশাকে, সম্মান প্রদর্শন ক'রত বিনা দ্বিধায়। কারণ সেই ক্ষত্রিয়েরা তাদের

বীরত্বে, সাহসে, শৌর্যের মহিমায় মানুষের মনে এক আসন করে নিয়েছিল। ঠিক তেমনি বিপ্রযুগে আমরা দেখতে পাই বুদ্ধিজীবীদের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়েছে ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ। কারণ বিপ্রদের বুদ্ধির প্রাখর্যে অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিল সৰাই। এই বিপ্রেরা আবিষ্কার করেছিল মানুষের কল্যাণের বিভিন্ন সামগ্রী। তাদের বৌদ্ধিক গবেষণায় সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছিল বলেই সবাই তাদের মেনে নিয়েছিল ঋষি ৰলে। ভক্তিশ্রদ্ধায় নত হয়ে আসত সবার মস্তক সেই মহান ঋষিদের চরণে। এই হ'ল স্বাভাবিক নিয়ম–মানুষ সর্বদা সামাজিক মূল্যকেই সম্মান করে' এসেছে সর্বদেশে সর্বকালে, কিন্তু মানবিক মূল্যকে কেউ কখনও শ্রদ্ধা করেনি। দেয়নি কেউই মানুষের মনুষ্যত্বকে সম্মান।

মানবিক মৌল সিদ্ধান্ত বা Human cardinal principle হ'ল a silver lining between the psycho-spiritual and spiritual strata of human existence। আধ্যাত্মিক স্তর ও মানসাধ্যাত্মিক স্তর–এই দু'য়ের যে মিলনক্ষেত্র তাকেই ৰলি মৌল মানবিক স্তর। মানুষের অস্তিত্ব ত্রিমুখী, ত্রিধারা সমন্বিত–দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। এই ত্রিমুখী অস্তিত্বের মধ্যে দৈহিক ক্ষেত্রের সীমা অনেকে পেরিয়ে উঠতে পারে না। স্থূল

ভোগই তাদের একমাত্র ধ্যেয় হয়ে পড়ে। তাদের বলৰ দানব বা পশু শ্রেণীভুক্ত। নিজেদের জৈব বৃত্তির তাড়নায় তারা সর্বদা প্রেষিত হয়। জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি, সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি, সূক্ষ্ম অনুশীলন তাদের নাগালের বাইরে। তারা জানে শুধু তাদের দেহকে, দৈহিক প্রয়োজসমূহকে।

আবার অনেকে রয়েছেন যাঁরা শুধু দেহ নয়, মন নিয়েও তাঁদের কারবার। তাঁরা অনুভব করেন যে মনের প্রাধান্যই পশুদের থেকে তাঁদের পৃথক করেছে। মানসিক পরিতৃপ্তির এষণায় তাঁদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত। সূক্ষ্ম অনুশীলনের প্রচেষ্টায় তাঁরাই সৃষ্টি করেন কাব্য, কবিতা, শিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য। দয়া, মমতা, প্রেম, মৈত্রী, করুণা নিয়ে তাঁদের জীবনাভিব্যক্তি। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, মনের গতিধারা অনন্তের সাথে মিলনের জন্যেই প্রবাহিত, তাই তাঁদের সমস্ত শক্তিকে তাঁরা নিয়োজিত করেছেন পরম সুন্দরের ধ্যানে। বৈবহারিক জীবনে তাঁরা আধ্যাত্মিক সাধক। এঁদেরই ৰলৰ মানব।

এই আধ্যাত্মিক সাধক পরমপুরুষের আকর্ষণে তীব্র বেগে চলতে চলতে একদিন এসে পৌঁছান এমন এক স্থানে যেখানে মানসিক সত্তার শেষ ও আধ্যাত্মিকতার শুরু। সে সময় তাঁকে আর সাধারণ মানবের পর্যায়ে ফেলতে পারি না। তাঁকে

তখন ৰলৰ দেবতা। মানবাস্তিত্বের এই যে পরিণতি যেখানে মানসিক স্তর আধ্যাত্মিক স্তর– দু'য়ের হয় সংযুক্তি, সেই অবস্থায় পৌঁছানো প্রত্যেকটি মানুষের কাম্য ও কর্তব্য। মানবতার চরম উন্নতি এখানেই। এরপর আর মানবতা থাকে না, থাকে শুধু দেবত্বের মহিমা। যেখানে পশুতার পরিসমাপ্তি, সেখানে থেকে শুরু হয় মানবতার যাত্রা। আর মানবতার চরম শিখরে উন্নয়নের পরই শুরু হয় দেবত্বের পরমা প্রশান্তি। Where animality ends humanity begins, where humanity culminates divinity starts. এই মানবতার চরম বিকাশ ও দেবত্বের প্রারম্ভ ও দু'য়ের যে সন্ধি পর্যায় তারই ওপর ভিত্তি করে মানবিক মৌল নীতি নির্ধারিত হয়।

অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানবজাতির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখৰ যে কোথাও মানবিক মূল্য সম্মানিত হয়নি। সম্মান তো দূরের কথা মানুষের মনুষ্যত্বের দিকে কেউ দাক্ষিণ্যের দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করে নি। মানুষ শ্রদ্ধা করেছে তাদের যার দ্বারা তার স্বার্থপূর্তি হতে পারে। ভূলুণ্ঠিত মানবতাকে অবহেলা করে' তারা সম্মান করেছে তাদের, যারা সমাজের উচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত। এই উচ্চ মঞ্চের অহঙ্কার থেকে নীচে নেমে এসে মাটির মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করায়

অনেক ৰাধা। মানুষের অবহেলা আরও তীব্রভাবে প্রকট হয়েছে প্রতিটি যুগের শেষ অধ্যায়ে। মহান ক্ষত্রিয়দের সন্তানেরা, যাঁরা বংশপরম্পরাক্রমে রাজসিংহাসনের অধিকার ভোগ করতেন, তাঁরা নিজেদের প্রজাপালনের কর্তব্যটুকু বিস্মৃত হয়ে, মানুষের কল্যাণের পবিত্র দায়িত্বটুকুকে ভুলে গিয়ে নিজেদের বিলাস ব্যসনের উপাচার সংগ্রহে ব্যস্ত থেকেছেন সারাক্ষণ। নিপীড়িত মানুষের জীবনের টুকিটাকির খবর তাঁরা কখনও নেননি। দারিদ্র্যের যাতনায় হয়ত ওষ্ঠাগত প্রাণ, কিন্তু রাজকর না দেওয়ার অপরাধে অধস্তন কর্মচারীর বেতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বৃদ্ধ প্রজার দুর্বল জীর্ণ শরীরগাত্র। দয়ালু ও মানবপ্রেমিক রাজা যে ছিলেন না তা নয়। কিন্তু এমন রাজা কোথায় যিনি সমস্ত মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করে প্রজ্ঞাঘন সত্তার সঙ্গে মহামিলনের আয়োজন করে দিয়েছেন? নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বজয়ের অপ্রতিরোধ্য বাসনায় তাঁরা রণ-অভিযান করেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। সাধারণ মানুষের হাসি কান্নার খোঁজ খবর রাখার সময় কই তাঁদের।

ঠিক একই চিত্র দেখি বিপ্রযুগেও। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের কাছে ঘেঁসাই অসম্ভব ব্যাপার। নিরীহ মানুষ বিপ্রের

মন তুষ্ট করতেই ব্যস্ত। নৈবেদ্য, দক্ষিণা, পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে পূজা হচ্ছে বিপ্রদের। কিন্তু ওপাড়ায় একটি দুঃস্থ পরিবার না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, তাদের দিকে তাকানোর ফুরসৎ কারোর নেই। কারণ তাদের দিকে তাকিয়ে তো লাভ কিছু নেই। বিনিময়ে পাৰ নাতো কিছুই, তাই যাক তারা যমালয়ে। মরুক তাদের সবাই। আমাদের করার কিছুই নেই। পূজা, অর্চনা, বিধিনিয়ম পালনে আমাদের কত কাজ। মন্দির, মসজিদ, চার্চের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর অর্চনায় মানুষ নিজের দিনগুলি এইভাবে নিঃশেষ করে' ফেলেছে। মনুষ্যত্বের পূজা আর হয়ে ওঠেনি। বিপ্রদের শাস্ত্র অনুযায়ী ইট কাঠ পাথরের তৈরী দেবালয়ের দাম মানুষের থেকে অনেক বেশী। শীতের সন্ধ্যায় হয়ত কাঁপতে কাঁপতে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধ ভিখারী। অবসন্ন দেহ, সারাদিনের ভিক্ষা হয়ত জোটেনি কিছুই। মন্দিরের কাঁসর ঘন্টা শঙ্খধ্বনির কলরোলে তখন দেবতার আরতি হচ্ছে বিধিমত। করজোড়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত ভক্তবৃন্দ। মন্দিরের বাইরে অর্ধনগ্ন ভিখারী দাঁড়িয়ে কাঁপছে থরথর করে। আরতির শেষে একে একে বেরিয়ে গেল সবাই। সবার শেষে পুরোহিতকে যদি সে প্রার্থনা করে এক কোণে থাকবার জন্যে, তার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না। পুরোহিত বলবেন, তোমার জন্যে আমার

দেবালয় অপবিত্র হতে দিতে পারি না। নীরবে চলে যেতে হয় বৃদ্ধকে অনিশ্চিত তার আস্তানায় নিজেকে কবর দিতে শীতের কফিনে। একটা মানুষের জীবনের কোন দাম নেই। দাম শুধু জড় ইটের-কাঠের শুচিতার। ধর্মমতের ওপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে পাপ পুণ্যের খসড়া, তৈরী হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন দণ্ডসংহিতা ও শাস্ত্র। নিজেদের কায়েমী স্বার্থের দুরভিসন্ধিতে সেইসব শাস্ত্রকে অপৌরুষেয় বলে প্রচারিত করা হয়েছে। তাই মানুষের থেকে তথাকথিত শাস্ত্রবর্ণিত দেববাণীর দাম অনেক বেশী। মানুষ সেই বাণীর, সেই ব্যবস্থার অবমাননা বা বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে পেতে হবে কঠোর শাস্তি। বিজাতীয় মানুষকে স্পর্শ করা মহাপাপ। সমাজ থেকে তাকে হতে হবে বিতাড়িত সেই পাপের জন্যে। শাস্ত্রমতে হয়ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, সে প্রায়শ্চিত্ত কখনও কখনও তার প্রাণহানিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেউ যদি এই কঠোর শাস্তি থেকে একটু শৈথিল্য প্রার্থনা করে, সমাজগুরুরা তা দিতে অপারগ। কী করতে পারেন তাঁরা, শাস্ত্র ৰলেছে যে! পুঁথিসর্বস্ব যাদের জীবন তারা মানুষের জীবনের মূল্য কি বোঝে? কত যুগ কত জীবন কত ধাপ পেরিয়ে একটা জীব মানুষের শরীর পায়। তাই বলা হয়েছে, 'দুর্লভং মানুষং জন্ম'। কিন্তু

এই ধরণের কত অমূল্য জীবনকে শাস্ত্রের বিধান মানতে গিয়ে অকালে বিনষ্ট হতে হয়েছে। কত নিরীহ মানুষের জীবন, শাস্ত্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়েছে তার হিসেৰ কে রাখে!

পাপ বা পুণ্য দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে মানসিক বিকৃতির নামবিশেষ। যে ধরণের বিকৃতিকে এক দেশে বা এককালে একজন পাত্র বলেছে পাপ, অন্য দেশ বা অন্য কালে অন্য একজন ৰলেছে পুণ্য। তাই ব্যাষ্টি-বিশেষের, কাল-বিশেষের পাপ-পুণ্যের ধারণাকে চরম বলে মনে করার পেছনে কোন যুক্তি নেই। কারণ বিশেষ বিশেষ ধর্মমতাশ্রয়ী বিশ্বাস, প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে সৃষ্ট সমাজের পুঞ্জীভূত সংস্কার, এই দু'টোর যে কোন একটাকে বা একসঙ্গে দু'টোকে কেন্দ্র করে পাপ-পুণ্য ৰোধ তৈরী হয় ও এই ৰোধ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে পাল্টায়। তাই দেখেছি প্রাচীন ভারতের লোকেরা নির্বিকার চিত্তে পতি-বিয়োগে শোকাকুলা অসহায়া নারীকে টেনে হিঁচড়ে মৃত স্বামীর চিতায় আগুনে পুড়িয়ে মারত। এটাই ছিল তাদের শাস্ত্রের পুণ্যকর্ম। কিন্তু আজ সেই কর্মকেই বলা হৰে পাপ। এই মেকি ধর্মবোধ মানুষকে শোষণ করেছে বার বার। শাস্ত্রের বিধানে অন্ধ বিশ্বাসী মানুষ সেদিন এই ভাবে নৃশংস নরমেধ যজ্ঞ করে তৃপ্তি পেত। শাস্ত্র বলেছে কুমারী জীবন ধারণ করা

পাপ, তাই ন'বছরের অনূঢ়া বালিকাকে মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধকে বিবাহ করতে বাধ্য করা হয়েছে। আবার সেই বৃদ্ধ পতির মৃত্যুর পর শাস্ত্রের শ্লোক শুণিয়ে তাকে শেখান হয়েছে, মৃত পতির কাছেই তাকে ফিরে যেতে হৰে, দ্বিতীয় বিবাহ হতেই পারে না। ভাবপ্রবণা নারী মৃত্যুর পর স্বামীর প্রেতাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার আশায় আজীবন কৃষ্ণ সাধন চালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু পুরুষদের বহু বিবাহে কোন দোষ নেই। যে সমস্ত নারীদের অসহায়ভাবে ৰহুপত্নীকের স্ত্রী হতে হয়েছে, তাদের জ্বলতে হয়েছে সারাজীবন সতীনের জ্বালায়। তার স্বাক্ষর রয়েছে ছোট ছোট গ্রামীণ ছড়ার মধ্যে। সতীনকে মারতে পারলেই শান্তি–

"গাড়ু গাড়ু গাড়ু
সতীন মেরে হাতে পরব খাড়ু।"

শুধু সতীন নয়, বর্তমান সমাজ–ব্যবস্থায় কোথাও কোথাও আজও বাড়ীর বউদের শাশুড়ী ও ননদের খোঁটায় সারাজীবন দুর্বিষহভাবে কাটাতে হয়। সরা মেপে নাকি বউদের রান্না করা হ'ত। সেই সরাটি যদি ভেঙ্গে যায়, তবে সেদিন বউদের

কত না আনন্দ। কিন্তু শাশুড়ী আরও শক্ত মানুষ, সরার পরিবর্তে হাতের মুঠোয় চাল রাঁধেন বউদের জন্যে।

ছোট সরাখানি ভেঙ্গে গেছে, বড় সরাখানি আছে,
নাচ আর কাঁদ বউ, হাতে আটকল আছে।

কী ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। মানুষের সাধারণ ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাৰার ক্ষেত্রেও এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে কার্পণ্য করা হ'ত। এইভাবে তখনকার নারীদের ওপর নিয়ম-কানুনের নির্যাতন, এমন কি নিজের ঘরের মধ্যেও অত্যাচার, সবকিছু মিলে তার জীবন ছিল অসহনীয়। সহ্য করতে না পেরে গোপনে গোপনে কাঁদতে হয়েছে সেই সমস্ত অসহায়া নারীদের। প্রতিকারহীন অত্যাচারে কত লক্ষ লক্ষ নারী বিনিদ্র রজনীর অন্ধকারে গুমরে কেঁদে মরেছে, কে তার হিসেব রাখে। শাস্ত্র-শাসনের ষ্টিম রোলারের কাছে এই ধরণের কোমল মাটির মত ভাব-প্রবণতা, আশা-আকাঙ্খা, দুঃখ-লাঞ্ছনা সব গুঁড়িয়ে গেছে। সেই ক্রন্দন, সেই আর্তনাদ কেউ কাণ পেতে শোণেনি। পাপ-পুণ্যের

অবিবেকী নিয়মকানুনে মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে বারবার করা হয়েছে ঘৃণা, পদাঘাত।

আমাদের বক্তব্য হ'ল, মানুষকে নীচু করে, মানবতাকে অবহেলা করে, শাস্ত্রকে কখনও শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেওয়া যায় না। শাস্ত্র তৈরী করে মানুষ–নিজের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার জন্যে। শাস্ত্র শাসন করবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে শাসন কখনও মানুষকে কবর দেবার জন্যে নয়। মানুষকে তার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সবার উৎস সেই পরম সত্তার সাথে মিলিয়ে দেওয়াতেই শাস্ত্রের সার্থকতা। শাস্ত্র মানুষের টুটি টিপে হত্যা করবে, তার বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে জীবনের স্বাভাবিক গতিটুকুকে রুদ্ধ করে দেবে–মানুষের সমাজে তা কখনও সমর্থন করা যায় না।

পাপপুণ্যের ধারণা বিভিন্ন মানুষের খামখেয়ালীর ওপর ভিত্তি না করে তৈরী হওয়া দরকার। মানুষকে যেতে হবে এমন এক স্তরে যেখানে গিয়ে তাকে আর এগিয়ে যাবার প্রশ্ন থাকে না। যে কর্ম তথা সমষ্টি এই স্বাভাবিক গতির বিরোধিতা করে, তা–ই পাপ। আর যে কর্ম মানুষ তথা সমাজকে এই যাত্রাপথে সহযোগিতা করে সেই কর্মকে ৰলৰ পুণ্যকর্ম। ব্যষ্টি তথা দলগত স্বার্থের প্ররোচনায় অন্য কোন

ব্যষ্টি, দল বা অবশিষ্ট সমাজকে শোষণ করা বা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যে যা কিছু কর্ম করা হয় তা সবই পাপ। এর জন্যে শাস্তিবিধান নিশ্চয়ই করতে হৰে কিন্তু পাপের শাস্তি কখনও মানুষের প্রাণ-হত্যায় নয় বা তাকে চিরতরে উন্নতি করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করায় নয়। কারণ তা করতে গিয়ে শাস্তিপ্রদানকারী নিজেই পাপী প্রতিপন্ন হয়। তাই শাস্তি সর্বদা হবে সংশোধনের জন্যে। দণ্ডসংহিতার তাই ভিত্তি হৰে মানবিক মূল্য। আমাদের সমাজ-শাস্ত্রে শাস্তি সম্পর্কে লেখা হয়েছে- "অপরাধীকে প্রথমে মিষ্টকথায় বোঝাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে কঠোর ভাবে বোঝাবে, তৃতীয় পর্যায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা বলবে; চতুর্থ পর্যায়ে, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে।" এইভাবে শাস্তিবিধান করার মূলে রয়েছে মানবিক আবেদন। মানুষ পাপ করে অনেক কারণে। কিন্তু তাকে সুযোগ দিতে হবে শোধরানোর। যদি সে নিজের দোষকে বুঝতে না পারে তবে তাকে বোঝাতে হবে। না বুঝলে তবেই সে শাস্তি পাবার যোগ্য। তাছাড়া শাস্তি কেবল অপরাধীকেই দেওয়া হবে, তার পরিবারের অন্য কোন লোককে নয়। ত্রুটি সংশোধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে। কেউ পাপ করেছে

বলে তার সারা জীবন নষ্ট হতে দেওয়ার সুযোগ যেন না দেওয়া হয়। কোন অবস্থাতেই কাউকে সমাজচ্যুত করা চলবে না।

দেবালয়ের অন্ধকারে বসে পাথরের নারায়ণকে পূজা করতে গিয়ে দরিদ্র-নারায়ণকে যারা অবহেলা করে তাদের ইহজীবন ও পরজীবনের পাওনার অঙ্ক তো শূন্যই, কারণ পরমাত্মার শ্রেষ্ঠরূপ মানববিগ্রহের অবমাননা যে তাঁরই অপমান। প্রকৃত ধার্মিক এই তথ্যটি ভালোভাবেই জানেন যে দেবতা মন্দিরে নয়, মানুষের মধ্যেই তাঁর মূর্ত প্রকাশ।

"অন্ধকারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙ্গে খাটছে বারমাস।"—(রবীন্দ্রনাথ)

বিপ্রযুগে মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভাবনার সৃষ্টি করে মানুষকে কত না অপমান করা হয়েছে। তথাকথিত নীচ

জাতের ছোঁয়া লাগালে উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের জাত যেত; শুধু তাই নয়, নীচু জাতের ছায়াকে স্পর্শ করলেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সমাজ থেকে বিচ্যুত হতে হ'ত। মানুষের প্রতি এত বড় ঘৃণা, এত তীব্র অবমাননা, আর কোন যুগে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এদেরই উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন–

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে।
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।।"

সদ্বিপ্ররা তাই কখনও কোনও মানুষকে ঘৃণা করবে না। প্রত্যেক মানুষকেই তার জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে উৎসাহ দেবে। সন্দ্বিপ্রদের এটাই হৰে প্রধান কর্তব্য। যেন কেউ কোন অবস্থাতেই ভাববার সুযোগ না পায় যে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বর্তমান যুগ ও মানবিক মূল্য–

বর্তমান যুগে জীবনের মূল্য নির্ধারিত হয় অর্থ দিয়ে।

"যস্যাস্তি বিত্তম্ সঃ নরঃ কুলিনঃ সঃ পণ্ডিতঃ
স শ্রুতবান্ গুণজ্ঞঃ স এব বক্তা সচ দর্শনীয়ঃ।
সর্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি।।"

যার কাছে বিত্ত রয়েছে তারই সমস্ত গুণ। তারই সমস্ত সম্মান। কাঞ্চন-কৌলীন্য লাভ না করে আজকের যুগে সম্মান আশা করতে পারা যায় না। বাকী সমস্ত শ্রেণীর বিত্তহীন মানুষকে জীবিকা সংগ্রহের জন্যে বিত্তবানদের স্তাবকতা করতে হয়। মানবিক মূল্য এখানে এক কাণাকড়িও নেই। মানুষ এখন শুধু অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার ছাড়া কিছু নয়। বিত্তবানেরা রজতচক্রের জোরে কিনে রেখে দিয়েছে সকলের মাথাকে। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ-পূর্তির জন্যে এরা নিজেদের সমস্ত মানবীয় মূল্যকে তো বিসর্জন দিয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অপর সকলের জীবন নিয়ে শকুনির মতো এরা পাশা খেলা শুরু করেছে। একে একে সবকিছু হারিয়ে দু'মুঠো অন্ন জোটানোর জন্যে সৰাই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে। আজকের মানুষের জীবনবেদ হয়ে দাঁড়িয়েছে-

"ঘোলা জলে নেমে পানা ঠেলে নিতি
ওঁ গঙ্গেতি প্রাতঃস্নান
বিগত-স্পৃহ পাকস্থলীতে
যেন তেন দু'টো অন্নদান।।"

আর যারা সমাজের উচ্চস্তরে বসে রয়েছে তারা লাভক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশভাগ, কলহ-সংশয়ে ব্যস্ত, মানুষের দিকে তাকানোর স্পৃহা তাদের নেই, বরং এই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তারা মানুষের হাড় চিবোয়। রক্ত শুষে পান করে। এতে অপরের প্রতি সহানুভূতি, দয়া-মমতার কোন সুযোগ নেই, সবাই নিজের তল্পি বাঁধতে ব্যস্ত। বাইরে বেরুলে ষ্টেশনে বাজারে শত শত ভিখারীর মেলা, রাস্তার ধারে সারি বেঁধে আছে কুষ্ঠরোগীর দল অর্ধনগ্ন অবস্থায় তার ভিক্ষাপাত্র জীবিকা সংগ্রহের একমাত্র উপকরণ নিয়ে। কেউ তাচ্ছিল্য ভরে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলে তার ভাগ্য। অন্ধ বৃদ্ধ সারাদিন বসে থাকে পুলের কোণে, পায়ের শব্দ পেলেই কাতর স্বরে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরে। কিন্তু তাদের সেই ক্রন্দন, কারুরই কর্ণে প্রবেশ করে না। অথচ আরেক দিকে বিলাসবহুল গৃহের কোণে

সমাজের গণ্যমান্য ব্যষ্টিদের আপ্যায়িত করার জন্যে খাদ্যের প্রাচুর্য মানুষের সভ্যতাকে উপহাস করছে।

আজকের মানুষ শ্রদ্ধা করে তাঁদেরও–যাঁরা সমাজের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। Rank বা পদকেই মানুষ মাহাত্ম্য দেয়। রেলমন্ত্রী এলে তার জন্যে ষ্টেশনমাষ্টার কত না ব্যবস্থা করেন কিন্তু সাধারণ যাত্রীদের অসুবিধাগুলোর দিকে একদিনও চোখ মেলে তাকাৰার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্যে বাংলোর পর বাংলো তৈরী হয়। কিন্তু বস্তী এলাকার বাসিন্দাদের মাথা গোঁজবার ঠাঁই পর্যন্ত নেই। একথা বলৰ না যে বড় বড় ইমারতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্বই সর্বপ্রথম। "মানুষের জন্যে অন্নের দরকার। থালারও দরকার একথা মানি। কিন্তু গরীবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করা দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোণার থালা দাবী করিবার দিন আসিৰে।”

আজকের তথাকথিত শিক্ষিত জনেরা শিক্ষার অভিমান নিয়ে অশিক্ষিত মানুষকে ঘৃণা করেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে

তাঁরা মিশতে পারেন না। তাই তাঁরা গ্রামীণ সমাজকে পরিত্যাগ করে' শহরের বাসিন্দা হতে চান। গ্রামে যাবার প্রশ্ন উঠলে তাঁরা বলেন, 'গিয়ে কী করৰ ৰলুন, কথা বলার মত একটাও লোক পাই না, সেখানে সমস্ত মূর্খের দল।' তাই শুধু শহরের উন্নতির পরিকল্পনা হয় আর গ্রাম থেকে যায় আগেকার মতই অবহেলিত। রাজনৈতিক নেতারা বোট ভিক্ষার জন্যে সময় পড়লে গ্রামে মাঝে মাঝে আসেন বড় বড় প্রতিশ্রুতির পশরা নিয়ে। তাঁরা সেই সমস্ত নিরীহ গ্রামবাসীদের কাছে শোণান বড় বড় বাঁধ তৈরীর কথা অথচ সেই গ্রামে হয়ত সেচের অভাবে চাষ হয় না। তাদের পুল তৈরীর, ইমারত তৈরীর অথবা টেলিবিশন সেট বসাবার পরিকল্পনার চমকপ্রদ বিবরণ দেন কিন্তু সেই গ্রামেই হয়তো ওষুধের অভাবে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। খাদ্যের অভাবে মানুষ ভিখারী হচ্ছে–এইরূপ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের অপূর্তি তার মনুষ্যত্বকে পদে পদে উপহাস করছে। অথচ এই গ্রামের মানুষেরাই সমাজের মেরুদণ্ড। গ্রাম কেন, শহরেই বা সবাই সমান সুযোগ পায় কোথায়? শহরের বড় বড় রাস্তার ফুটপাথগুলো বহু মানুষের বাসস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক

থাকে, তাদের সংখ্যাই বেশী, তারাই বাহন। তাদের মানুষ হবার সময় নেই। দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে পরে, কম শিখে বাকী সকলের চেয়ে বেশী তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশী তাদের অসম্মান, কথায় কথায় তারা উপোস করে মরে, ওপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে। জীবনযাত্রার জন্যে সবকিছু সুবিধা, সৰ থেকে তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। ওপরে সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। এইভাবে মানুষের অবমাননা, মানবিক মূল্যের অবহেলা আজকের এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।"

মানবিক মূল্যের অবমাননার আর একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হ'ল আজকের বিচার ব্যবস্থা। অপরাধী হোক বা না হোক, কেউ ধরা পড়লে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে ও তার বিচার হবে সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ও উকিলের বাকচাতুর্যে। যার অর্থ আছে সে নামকরা উকিলের সাহায্য নিয়ে আইনের মারপ্যাঁচে প্রকৃত অপরাধী হয়েও নির্দোষ প্রমাণিত হয়। আর যার অর্থ নেই সে নির্দোষ হয়েও বড় উকিল রাখতে পারেনি বলে জেল খাটে। চোর ছাড়া পেয়ে

গেলে অপরাধ নিশ্চয়ই কিন্তু নির্দোষকে শাস্তি দেওয়াও মহাপাপ, মানবত্বের কঠোর অবমাননা। আজ যত অপরাধ হয় তার এক বিশেষ কারণ হ'ল, সৎ মানুষের অভাব। সৎ মানুষ ব্যষ্টিগত জীবনে নীতিবাদকে মেনে চলতে চেষ্টা করে, কিন্তু দারিদ্র্যের যাতনায় একসময় সেই নীতিকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। তারপর একসময় অপরাধের জন্যে তাকে হয়তো আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, সে যে অভাবের তাড়নায় চুরি করেছে আইনের চোখে তার কোন মূল্য নেই। সেই ব্যষ্টি অতঃপর যদি চৌর্যবৃত্তির অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়-তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে দেশের আইনে কোন ব্যবস্থা নেই। তার ফলে সেই পরিবারের সন্তানেরা হয়তো বাঁচার তাগিদে জীবনের কালো পথ একদিন বেছে নিতে বাধ্য হবে। বড় হয়ে ছেলেগুলো হয়তো পকেটমার হবে, হয়তো- তারাও একদিন চুরি করবে আর তাদের মা বেচারীকে হয়তো একদিন বেছে নিতে হবে নরকের পথ, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে বরণ করে নিতে হৰে কলুষতায় ভরা জঘন্য পাপের জীবন। আর ওদের পিতা যখন জেল থেকে ছুটি পাবে তখন সমস্ত সমাজ তাকে ঘৃণা করবে, চোর বলে অপবাদ দেবে, অপমানে অভিমানে সে তখন মরীয়া হয়ে চুরিকেই বরণ করে নেবে

তার জীবনের পেশা হিসেবে। এইভাবে কত সৎ পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। কেউ এদের মর্মব্যথাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে' সহানুভূতির একটু সান্ত্বনা বাক্যও শোণাৰে না। কারণ মানুষ তো বড় নয়–আজ সমাজে বড় হচ্ছে তারা যারা কালোবাজারী করে ধরা পড়লে টাকার জোরে বেকসুর খালাস হয়ে যায়। কারণ "যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ, আজ সেই তত বলবান।"

সবিপ্রের নয়া মানবতাবাদ

সদ্বিপ্রের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য আর সবকিছু মূল্যকেই অতিক্রম করে যায়। রাষ্ট্রই হোক আর শাস্ত্রই হোক, সমাজ হোক আর ধর্মই হোক–সবকিছুর সার্থকতা আছে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে, স্বাস্থ্যের মধ্যে, জীবনের প্রাচুর্যের মধ্যে, মনুষ্যত্বকে পরিপূর্ণ মহিমায় বিকশিত করে তোলার মধ্যে। মানুষকে বিকশিত করে তোলার জন্যে সভ্যতার সমস্ত উপকরণ, রাষ্ট্রের যত বিচিত্র রূপ, মতবাদের যত বৈচিত্র্য, যত বিধিনিষেধ, শাস্ত্রের যত অনুশাসন; মানুষ যদি আত্মপ্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল, তার দেহ যদি

স্বাস্থ্যে সবল, বুদ্ধি যদি জ্ঞানে সতেজ ও হৃদয় যদি প্রেমে বিশাল হবার সুযোগ না পেল, তবে কিসের জন্যে রাষ্ট্রের ইমারত, কিসের জন্যে বিধিব্যবস্থা, কিসের জন্যে সভ্যতার এত সাজ সরঞ্জাম? রাষ্ট্র যদি জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে সহায়ক না হয়ে অন্তরায় হয়, তবে সে মানুষের আনুগত্যের ওপর কোন দাবীই করতে পারে না, কারণ মানুষ রাষ্ট্রের চেয়ে বড়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- 'মানুষের পরিবর্তে বিচার ও আইন, রুটির পরিবর্তে পাথর। সে পাথর দুর্লভ ও মূল্যবান হতে পারে কিন্তু তাতে ক্ষুধা দূর হয় না।'

সামাজিক মূল্যকে মানবিক মূল্যের থেকে বড় করে দেখা হ'ল আজ পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথা। সদ্বিপ্নরা এই প্রচলিত রীতির মূলে কুঠারাঘাত করতে চায়। তাঁদের কাছে Human Value Precedes Social Value- মানুষের মূল্যকে সামাজিক মূল্যের আগে স্থান দিতে হবে। মানুষ নিয়ে সমাজ। এই সামাজিক মূল্য মানবিক মূল্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে অর্থাৎ সামাজিক মূল্য তাদেরই প্রাপ্য হবে যারা মানবিক মূল্যকে সম্মান করবে। প্রথমেই বলা হয়েছে-মানবিক মূল্য মানে হ'ল মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশাকে সহানুভূতির চোখে দেখে তাকে প্রজ্ঞাঘন চৈতন্যের সাথে মিশিয়ে দিয়ে

দেবত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে–তার দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক–এই তিন ক্ষেত্রেই উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে হবে। প্রতিটি মানুষের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিকশিত হওয়ার জন্মগত অধিকার রয়েছে। সমাজের তাই কর্তব্য– মানুষের এই অধিকারকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া। সমাজ এই স্বীকৃতি দেয়নি ৰলেই মানুষের জীবনে এত হাহাকার; আজ যাকে আমারা ঘৃণা করছি, যে সমস্ত বখে–যাওয়া ছেলেগুলোকে আজ তাচ্ছিল্য করছি, তাদের যদি সমাজ সুযোগ দিত, তৰে তাদের মধ্যে থেকেই যে মহান মনীষীর আবির্ভাব হ'ত না তা কে বলতে পারে? যে নারীR আজ পেটের দায়ে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করেছে, সমাজ যদি তাদের অন্তরের ব্যথাকে অনুভব করে বাঁচার মত বাঁচবার ব্যবস্থা করে দিত, তবে কে জানে তাদের মধ্য থেকেই হয়তো মহান ব্যষ্টিত্বের জননীকে আমরা দেখতে পেতুম। কিন্তু আজ সমাজে মানবিক মূল্যের স্বীকৃতি নেই বলেই কত মহান ব্যষ্টিত্ব অঙ্কুরেই শুকিয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ছে ধূলার ধরণীতে। সদ্বিপ্লেরা সেই ভুলুন্ঠিত মানবতার নবোত্থানের সূত্রপাত করবে। এদের কাছে কেউ পাপী ৰলে ঘৃণ্য নয়, এরা কাউকে শয়তান বলতে পারে না। মানুষ

শয়তান হয়, পাপী হয় তখন যখন উপযুক্ত পরিচালনা, পথনির্দেশনার অভাবে সে তার কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় কাজ করে ফেলে। 'Human mind goaded by depraving propensities is Satan'. যদি তার এই কু-প্রবৃত্তিগুলোকে সু-প্রবৃত্তির দিকে প্রবাহিত করিয়ে দেওয়া যায় তখন সে আর শয়তান থাকবে না, সে তখন দেবতাতে রূপান্তরিত হবে। প্রত্যেকটি মানুষ হ'ল দেবশিশু-Men are divine children-এই তত্ত্বটিকে মনে রেখে সমাজের প্রত্যেকটি কর্মপদ্ধতির বিচার করা উচিত।

সদ্বিপ্রেরা তাই যে অপরাধ-সংহিতা বা দণ্ড-সংহিতা তৈরী করবে, তাতে মানুষকে শাস্তি দেওয়া নয়, সংশোধন করাই হবে উদ্দেশ্য। কারাগার তৈরী না করে তারা করবে সংশোধনাগার। যারা জন্মগত কারণে অপরাধী নয়, যারা বৃত্তিগত ত্রুটির জন্যে অন্যায় করে ফেলে তাদের সেই ত্রুটি দূর করে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যারা অভাবের তাড়নায় অপরাধ করে, তাদের অভাব দূর করে দিতে হবে। সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে চলার মধ্যেই সমাজের সার্থকতা। কেউ যদি যাত্রাপথে পেছিয়ে পড়ে, গভীর রাত্রির তমিস্রায় দমকা হাওয়ায় যদি কারও দীপ নিবে যায় তবে তাকে অন্ধকারের মধ্যে একলাটি ফেলে দিয়ে চলে গেলে তো চলবে

না, তার হাত ধরে তুলে নিতে হবে, নিজের প্রদীপের আলোয় জ্বালিয়ে দিতে হবে তার নিভে-যাওয়া দীপকের শিখাকে:

"বর্ত্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল একসাথে
পথে নিভে গেছে আলো পড়ে আছে তাই।
তোমরা কি দয়া করে তুলিৰে না হাত ধরে
অর্ধদণ্ড তার তরে থামিৰে না ভাই?"

[কামিনী রায়]

-নিশ্চয়ই থামতে হবে কারণ তা না করলে সমাজের মূল সুরটির কোন দাম থাকে না। ঋষি বলেছেন, "সমমন্ত্রেন জায়তে ইতি সমাজঃ।" তাই পাপী, তাপী, চোর, চরিত্রহীন, অপরাধী-যে কেউ হোক না কেন, এগুলো তার বাইরের পরিচয়। ভেতরে সে পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনায় ভরপুর। সেই সম্ভাবনার উদ্বোধন করাই সদ্বিপ্রদের ব্রত। তারা মানবিক মূল্যপ্রদানে কখনও বাছবিচার করবে না। অতি ঘৃণ্য কাজ করার জন্যে শাস্তি তার নিশ্চয়ই হৰে কিন্তু তাকে ঘৃণা করে না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মেরে ফেলা মানবতাবাদী সদ্বিপ্রদের দ্বারা কখনও হয়ে উঠবে না। রোগগ্রস্ত যবন হরিদাসকে শুশ্রূষা করার পবিত্র

কর্তব্যটুকু পালন না করে সমাজ-নেতারা (?) তাদের পুঁথি আঁকড়ে পড়ে থাকতে পেরেছেন কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তিনি তাঁকে নিজের কোলে নিয়ে শুশ্রূষা করে মানবিক মূল্যকে শ্রদ্ধা করেছেন।

কিন্তু সামাজিক দায়িত্বের যখন প্রশ্ন আসবে, তখন নিশ্চয়ই নিখুঁতভাবে বিচার করে দেখতে হবে। যাকে তাকে সামাজিক দায়িত্ব দেওয়া চলবে না। কারণ সামাজিক দায়িত্ব যারা নেবে তারাই দেখাবে মানুষকে বিকাশের পথ, তারাই না পাপীদের সংশোধনের ভার নেবে। কিন্তু তারা নিজেরাই যদি কলুষিত মানসিকতা নিয়ে কাজ করে তবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সমাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে-নীতিবাদের প্রথম স্ফূরণ থেকে বিশ্বমানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা-এই দুইয়ের মাঝে যে ব্যবধান রয়েছে সে ব্যবধানকে অতিক্রম করার কাজে যারা ব্রতী হয়েছে তাদের মিলিত গোষ্ঠীর নাম সমাজ। সুতরাং সামাজিক দায়িত্ব তাদেরই দিতে হবে যারা এই মহান কার্য সমাধা করতে সক্ষম। সমাজ যদি নীতিবাদ থেকে যাত্রা শুরু করে, তবে সমাজের ভার যারা নেবে তাদের অতি অবশ্যই হতে হবে নীতিবাদী। সমাজের পরিণতি যখন বিশ্বমানবতাবাদে প্রতিষ্ঠা, তখন তাদেরও হতে

হৰে বিশ্বজনীন। আর এই নীতিবাদ থেকে বিশ্বমানবতাবাদের ব্যবধানকে জয় করতে হলে যে পথ অবলম্বন করতে হয় তা হ'ল আধ্যাত্মিক সাধনার পথ। তাই তাদেরও হতে হৰে কঠোর সাধনায় ব্রতী। তাই তাদের জীবনের দিগ্দর্শন হবে– Morality is the base, Sadhana is the means and Life Divine is the goal. এই মহান দায়িত্ব কখনও অপরাধপ্রবণ ব্যষ্টিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এরা যতদিন না নিজেদের সংশোধন করে নিচ্ছে ততদিন মানবিক মূল্য থেকে বঞ্চিত হবে না নিশ্চয়ই কিন্তু কোন সামাজিক মূল্য এঁদের দেওয়া হবে না। বর্তমান সমাজে সামাজিক মূল্যকে সম্মান করা হয় বটে কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব নেবার জন্যে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের কারুরই উপরি-উক্ত গুণাবলী নেই। টাকার গরমে, সুপারিশের জোরে এক একটা পদ ওরা ব্যবস্থা করে নিয়েছে সত্য, কিন্তু এতে সামূহিক কল্যাণ সম্ভব হয়নি। তাই আমাদের সমাজ-শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে–কারুর লম্বা চওড়া বক্তৃতায় মানুষ যেন না ভুলে, কাজ দেখে যোগ্যতা বিচার করতে হবে! যে যে অবস্থায় রয়েছে তার সেই অবস্থাতেই সমাজ-সেবা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যার স্বভাব যমনিয়ম-বিরোধী তাদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ যেন না দেওয়া হয়। অযোগ্য ব্যষ্টির হাতে ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ, জেনে

শুণে সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া। সদ্বিপ্রেরা যোগ্য ব্যষ্টিকে সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করৰে ও এই যোগ্য ব্যষ্টিদের দ্বারা যে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠৰে সে সমাজ মানুষকে তার যথাযথ মূল্য দেবে। সেই সমাজই হৰে সুষ্ঠু সমাজ। এই নয়া মানবতাবাদের ওপর ভিত্তি করে' গড়ে ওঠা নোতুন সমাজে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ খুঁজে পাৰে বেঁচে থাকার পরম সার্থকতা। মানুষ প্রতিষ্ঠিত হৰে তার হারানো সম্মানের আসনে।

এ্যাটম ৰোম কি মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে পারে?

কিছুদিন আগে জনৈক সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এ্যাটম ৰোমের বিধ্বংসী কার্যকারিতা সম্বন্ধে ও মানুষ জাতির ওপর তার ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আপনার মত কী?" সাধারণতঃ সাংবাদিকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকে

না। কিন্তু আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলুম। এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলুম "এ্যাটম ৰোমের শক্তির চেয়ে মানুষের শক্তি অনেক বেশী। সুতরাং এ্যাটম ৰোম মানুষকে শেষ করে দেবে- এরকম ভাবা মানে মানুষের মনীষাকে, মানুষের মানসিক শক্তিকে অপমান করা। কারণ, মানুষ এ্যাটম ৰোমকে তৈরী করেছে। মানুষ এ্যাটম ৰোমের স্রষ্টা। সুতরাং মানুষকে কি এ্যাটম বোম ধ্বংস করতে পারে? এখন কথা হচ্ছে, মানুষ অনেক মারণাস্ত্র এর আগেও আবিষ্কার করেছে-যে মারণাস্ত্র মানুষকে মেরে ফেলে। এ্যাটম বোমও সে বিচারে মানুষ মারতে পারে-এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক মারতে পারে। মানুষের তৈরী এমন বড় বড় মেসিন রয়েছে, যে মেসিন চালাতে গিয়ে কত লোক মারা যায়। এ্যাটম ৰোমের থেকে মানুষের সেই ভয় তো আছেই! উত্তরটা ঠিক তাও নয়। উত্তরটা হচ্ছে, এ্যাটম বোমের স্রষ্টা মানুষ-এ্যাটম ৰোমের যে জড়শক্তি আছে-যে স্থূল শক্তি আছে, মানুষের স্থূল শক্তি তার চেয়ে অনেক কম-একথা ঠিক। যেমন হাতীর যা স্থূল শক্তি মানুষের স্থূল শক্তি তার চেয়ে অনেক কম কিন্তু হাতীর ওপরে বসে থাকা ছোট্ট একটি মাহুত-হাতীর শক্তি তার শক্তির চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশী-তবুও ছোট্ট একটি মাহুত

তাকে চালাচ্ছে তো! কারণ হাতীর শক্তি যত বেশীই হোক না কেন, মানুষের স্থূল শক্তি যত কমই হোক না কেন, মানসিক শক্তিতে হাতীর চেয়ে মানুষ অনেক বেশী এগিয়ে আছে। ঠিক তেমনি, এ্যাটম ৰোমকে যদি ধরা যায় একটা বিরাট রাক্ষস-একটা বিরাট পিশাচ, যার জড়শক্তি আছে কিন্তু মানসিক শক্তি নেই, তবুও মানুষ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শুধু তাই নয়, তার শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যে যে কোন অস্ত্র মানুষ অনায়াসেই আবিষ্কার করতে পারে-যার কাজ হবে এ্যাটম ৰোমের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়াকে অবরোধ করা, আটকে দেওয়া। এখন কথা হচ্ছে, স্রষ্টা যেখানে অণু মন (unit mind) সেখানে সৃষ্টি যত বেশী জড় শক্তির অধিকারী হোক না কেন, তার মানসিক শক্তি মানুষের অণুমনের শক্তির চেয়ে সৰ সময়ই কম থাকৰে।

এখন মানুষ যে সকল জিনিস তৈরী করে থাকে, তাতে জড় শক্তিই থাকে, মানসিক শক্তি থাকে না। এ্যাটম ৰোমের মন বলে কোন জিনিস নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে মানুষ হয়তো এমন জিনিসও তৈরী করবে-তার আভাস তো পূর্বেই দিয়েছি-যার মনও থাকৰে; কিন্তু সেক্ষেত্রে তার মন স্রষ্টার মনের চেয়ে দুর্বল হবে। তার জড়শক্তি বেশী হতে পারে-অবশ্যই হতে

পারে। সুতরাং এ্যাটম ৰোম থেকে "কী হৰে গো" বলে কেঁদে আকুল হবার মত কোন সংগত কারণ নেই।

মানুষের ভয় পাওয়ার জিনিস একটাই আছে। সেটা হচ্ছে এই যে মানুষের শরীরে যারা পিশাচ, বিরাট মানসিক শক্তির অধিকারী হয়েও পিশাচ, যারা কেবল মানুষের ক্ষতি করেই যাচ্ছে-তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তাদের থেকে বাঁচবার জন্যে সমবেতভাবে চেষ্টা করতে হবে। এটাই ভয়- কিন্তু এই ভয় থেকে বাঁচবার উপায় কী?

"যতো ৰাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

এই যে মানসিক শক্তি এটা সেই অসৎ মানুষ কার কাছ থেকে পেয়েছে? না, পরমপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছে। আর যে সৎ মানুষ অসৎ মানুষ থেকে ভয় পাচ্ছে, তার মানসিক শক্তিও পরমপুরুষের কাছ থেকে এসেছে। সুতরাং সে এককভাবে লড়ছে-এরকম না ভেবে যদি ভাবে যে "আমি পরমপুরুষের সন্তান, পরমপুরুষের নির্দিষ্ট কাজ করার জন্যেই পৃথিবীতে এসেছি, আমি কখনও একলা নেই, সব সময়ই আমি

একটা ছোট্ট শিশু, সব সময়ই আমি পরমপুরুষের কোলে বসে' আছি"–তাহলে সে কাকে ভয় পাবে, কেন ভয় পাবে? ভয় পাওয়ার কোন কারণই নেই। "ন বিভেতি কুতশ্চন"–সে বিশ্বের কোন শক্তিকে ভয় পাবে না। সেক্ষেত্রে এ্যাটম বোম তো অতি তুচ্ছ, তার চেয়েও অনেক শক্তিশালী অস্ত্র মানুষ ভবিষ্যতে আবিষ্কার করবে কিন্তু সৎ মানুষের সে সকল অস্ত্র থেকে ভয় পাওয়ার বিন্দুমাত্র কারণ নেই।

(সন্ধ্যাবেলা, ২রা নভেম্বর, ১৯৭৮, কলকাতা)

গতি ও স্থিতি

শিলিগুড়ি আর. ইউ. ক্লাবের অধিবেশনে যেসব বক্তব্য ছিল তার ভেতর একথাটাও ছিল যে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। মানুষ চাক বা না চাক, মন চাক বা না চাক, তাকে এগিয়ে যেতেই হবে, চলতেই হবে। শরীর স্থির থাকবে না, মনও স্থির থাকবে না। মানুষ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যাবে, কারণ

'চলাটা' কেবল যে স্কুল শরীরের পক্ষেই জীবনের লক্ষণ তা' নয়। মনের পক্ষেও তা' জীবনের লক্ষণ–অগ্রগতির লক্ষণ।

চলতে গেলে মানুষের জীবনে কী হয়! মানুষ জন্মাচ্ছে, মরছে– আবার জন্মাচ্ছে, আবার মরছে। এক্ষেত্রে মরাটাই বা কী রকম? এই মরাটা চলবার সময়কার পা ফেলার মত। আর জীবনটা কী রকম? -না, জীবনটা হচ্ছে পা তোলার মত। জন্মাচ্ছে–মরছে–আবার জন্মাচ্ছে। ব্যষ্টিগত জীবনে জীবিত মানুষ যখন চলছে তখন যেন ওই পা ফেলাটাই গতিহীনতার অবস্থা। এখন অনেকে ভাবতে পারে যে এই গতিহীনতা'র অবস্থাটা বাদ দিয়ে কি চলা যেত না অর্থাৎ অখণ্ড ভাবে চলা যেত না। এই অখণ্ড চলা বা অখণ্ড থেমে থাকা–এদুয়ের কোনটাই সম্ভব নয়। এই পূর্ণ গতি বা পূর্ণ বিরতি (complete speed বা complete pause) উভয়েই আপেক্ষিক (relative)। কারণ এই অস্তিত্বটাও আপেক্ষিক। আপেক্ষিক তত্ত্বের ভীড় এই জগতে–কিছুই নিরপেক্ষ নয়। আমাদের দর্শনে কোথায় যেন আমি বলেছি, এই যে পা ফেলার অবস্থাটা, যাকে আমরা লৌকিক ভাষায় 'মৃত্যু' বলে অভিহিত করতে পারি, কিন্তু তাও ঠিক 'মৃত্যু' নয়। অথবা মানুষের যে. শারীরিক মৃত্যু ঘটে সেটাও ঠিক অর্থে 'মৃত্যু' নয়। এই যে 'থেমে

থাকা'টা- এটা হ'ল 'চলা'র পরবর্তী পদবিক্ষেপের প্রস্তুতি। অর্থাৎ চলতে গিয়ে যদি পা-টা না ফেলি তাহলে পরের পা-টা সামনে ফেলা তো যাবে না! সুতরাং পরের 'পা'কে সামনে ফেলবার জন্যে-বাঁ পা-টাকে সামনে ফেলবার জন্যে 'ডান পা' একটা প্রস্তুতি নেয়। তার ফলেই বাঁ পা-টা এগোতে পারে। এটারও প্রয়োজন রয়েছে। তাই চলার 'ধর্ম' বা গতি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে 'মৃত্যু'র অস্তিত্বটাকে স্বীকার করতে হবে, সেটাকে সমর্থনও জানাতে হবে। তা না হলে পরবর্তী পদবিক্ষেপ সম্ভব হবে না। তাছাড়া সঙ্কোচ-বিকাশী ভাব (systaltic order) নিয়ে যে 'চলা'-চলা মাত্রতেই সঙ্কোচ-বিকাশিত্ব থাকছে, pulsation থাকছে। আর তার এই যে থামার ষ্টেট্টা, যেমন চলার ক্ষেত্রে ৰললুম যে ডান পা-টা ফেললুম তার পরে ডান পা-টাকে থামাতে হয়, থামিয়ে ডান পা' যে শক্তি সঞ্চয় করে, তার দ্বারা পরবর্তীকালে বাঁ পা-টা সামনে ফেলতে পারা যায়। ঠিক তেমনি মানস-ভূমিতেও ওই রকম গতি ও বিশ্রাম (speed and pause) রয়েছে। এই যে থেমে থাকার অবস্থা বা বিশ্রামের অবস্থা-সেই সময় মানুষ পরবর্তী স্তরের জন্যে শক্তি আহরণ করে।

মানুষ যখন কোন কিছু শোণে, তখনই তার ওই 'শোণা'টা আত্মস্বীকরণ হয়–আত্মস্বীকৃত হয় যখন তার মনটা সেই বিশ্রামের অবস্থায় থাকে। আর গতিস্তরে তার স্ফুরণ ঘটে। তুমি কারুর কথা শুণে' তার প্রত্যুত্তর যখন দেৰে–সেই 'শোণা'টা তুমি কাণ দিয়ে পেলে ঠিকই, কিন্তু আত্মস্থীকরণ তখনই হ'ল যখন তোমার মনে স্থিতিশীলতা বা pause এসেছে। ঠিক তার পরেই যখন তোমার মনে যে গতিশীলতা (speed stage) আসে সেই স্তরে তুমি কী কর?- না, তোমার স্বরনালীকে (vocal cord) কাজে লাগিয়ে মুখের সাহায্যে শব্দের মাধ্যমে তার উত্তর দাও।

ধর কেউ হয়তো চেঁচিয়ে বললে, 'কেন এই কাজ করেছিলি'-আর তুমি সেটা কাণে শুণলে। শোণার পর তোমার মন ঠিক তার পরের স্থিতিশীলতায় এল। তখন তোমার আত্মস্বীকরণ হ'ল যে, কেউ একজন বলছে, 'কেন এই কাজ করেছিলি? কেন পালাচ্ছিস রে ভীতু?' -তোমার আত্মস্বীকরণ হ'ল যে কেউ তোমাকে ভীতু বলছে। হ্যাঁ, তুমি এটা সহ্য করে নেৰে। হয়তো বা তুমি সত্যিই ভীতু–এটা স্বীকার করবে, কি করবে না ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তোমার মনের বিরতি স্তরে হচ্ছে। তারপরে যে গতির স্তরটা এল–'পালাবো না, কিছুতেই

না। বা দাঁড়িয়ে থাকৰো, বেশ করছি পালাচ্ছি.....।' এই-ই হয়। এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো গতির পরে বিশ্রাম। এই নিয়েই মানুষকে চলতে হবে। ঠিক তেমনি অধ্যাত্মভূমিতে-সাধনা-ভূমিতে সাধনা করতে করতে একটা বিশ্রাম অথবা স্থিতিশীলতা এসে গেল। মনে হ'ল, 'আরে! কিছুদিন আগেও তো বেশ সুন্দর ধ্যান হচ্ছিল-এখন তো ধ্যান ভালো হচ্ছে না' অথবা 'সেদিন জপ করতে করতে শরীরটা কেমন কেঁপে উঠল-কেমন ভাল লাগছিল-আজ হচ্ছে না কেন'? ওই যে ধ্যানের আনন্দ বা জপের আনন্দ-ওটা তখন আত্মস্বীকরণের স্তরে এসেছে, তা' তোমার ভেতরেই থেকে যাচ্ছে, তার স্ফুরণ মনের মধ্যেও হচ্ছে না। তাই তুমি বুঝতে পারছো না। আবার কিছুদিন পরে তার চেয়েও বেশী আনন্দ জপেতে হচ্ছে, তার চেয়েও বেশী আনন্দ ধ্যানেতে হচ্ছে। অর্থাৎ অধ্যাত্মভূমিতেও ওই রকমের বিশ্রাম ও গতি (pause and speed) হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এইভাবেই চলতে থাকে। মানুষের ব্যষ্টিগত জীবনে শরীর, মন, আত্মা ও সামূহিক জীবনে সমাজের শরীর, মন, আত্মা-সৰাই এই হিসেৰ নিয়ে চলে, এই হিসেৰ রেখে চলে। এই সংকোচ-বিকাশিত্ব- 'সংকোচ' মানে কুঁকড়ে যাওয়া-অর্থাৎ সেই সময় কিছু গ্রহণ করে নিল আর

'বিকাশ' মানে প্রকাশ করে দিল সেইটাকেই। কখনও কোথাও কোন ছাত্র পড়ছে বা কোন সময় কোন শ্রোতা রয়েছে তারাও ওই রকম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, কাণের সাহায্যে শুণল বটে কিন্তু 'শোণাটাই' যথেষ্ট নয়। আত্মস্থীকরণ করতে হয়। 'চুপ কর, চুপ কর–শুণি, শুণি'। এই 'শুণি'টা শোণা নয়। 'শুণি'টা হল আত্মস্বীকরণ। শুণছে তো কাণে ঠিকই আগে 'চুপ কর', বলে অন্যকে যে থামিয়ে দিল সেটা হ'ল আত্মস্বীকরণ।

মনে কর, একটা ভাল খাবার রসমালাই বা সন্দেশ; ধর, তোমাকে একটা খুব ভাল সন্দেশ দিলুম। হ্যাঁ, এই সন্দেশের আবিষ্কার করেছিলো কে? হুগলী জেলার জনাই গ্রামের ময়রারা। আর নিমকী–তিনকোণা নিমকী? মিষ্টির দোকানে আজকাল যা পাওয়া যায়! তিনকোণা নিমকীই তো বেশী চলে! উত্তর ভারতে বলা হয় 'বাঙলা নিমকী'। **সেটাও আবিষ্কার করেন জনাই গ্রামের স্বনামধন্য পুঁটিরাম ময়রা।** যাই হোক, তোমাকে একটা সন্দেশ দেওয়া হ'ল, আর বলা হ'ল খুব জোরে দৌড়াও। যদি সন্দেশের স্বাদ পেতে চাও তবে দৌড়লে চলবে না। যদি ভাল করে দৌড়োতে চাও তবে

সন্দেশের আস্বাদ পাৰে না। তুমি বলবে, "দাঁড়াও, একটু সুস্থির হয়ে ধীরে ধীরে চেখে চেখে খাৰ"। তবেই স্বাদ পাবে, নয়

কি? কারণ, দৌড়োবার সময় মনের যে সংকোচ-অবস্থা সেটা আসবে না। দৌড়োতে গেলে তোমার মনের বিকাশ-এর গতিটা এতখানি হ'ল যে থামবার সুযোগ তুমি পাচ্ছ না। তাই সন্দেশ খেয়ে সন্দেশের স্বাদ ভালভাবে অনুভব করবে, সে সুযোগ তুমি পাচ্ছ না। তুমি ভাবছ, আগে দৌড়োনোটা হয়ে যাক, তারপর ধীরে সুস্থে বসে সন্দেশটা খাওয়া যাবে।

সামূহিক জীবনে মানুষের যখন একটা স্থিতির পর্যায় আসে সেই সময়ে তাকে তৈরী হতে হয় পরের গতিশীল পর্যায়ের জন্যে। এই ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল বড় বড় স্থিতি (pause) এসেছে সমাজ জীবনে। সেই সময় মনে হয়েছে সমাজটা বুঝি মরে গেল, শেষ হয়ে গেল; এই সমাজ আর মাথা তুলতে পারবে না। ইংরেজ আমলের শেষের দিকে মনে হ'ত, এদেশের যেন আর ভবিষ্যৎ নেই। ইংরেজ কি আর এদেশ ছেড়ে যাবে? -যাবে না; তবে কেন আর এই স্বাধীনতার সংগ্রাম? এইসব ভাবনা আসত। এইসব ভাবনাগুলোর অলক্ষ্যে আসত সমাজে বিরতির পর্যায়, শক্তি সঞ্চয়ের পর্যায়। বাঙলার সমাজ জীবনেও এই ধরণের বড় বড় বিরতি (pause) এসেছে- বড় বড় গতি (speed) এসেছে। ৰৌদ্ধযুগে ছিল বিরাট গতি। তারপরে হিন্দু যুগের প্রথম অবস্থায় কম গতি, শেষের দিকটায়

খুব গতি। পাঠান যুগের গোড়ার দিকে বেশ গতি। শেষের দিকে মুঘল যুগে গতি একদম ছিল না। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে আবার দারুণ গতি–শেষের দিকে গতি কমতে শুরু হ'ল। এখন একেবারেই নেই। আবার কিছুদিন পরে গতি আসৰে। এই রকমই চলৰে, চলতে থাকৰে। তাই বিরতি মানেই গতির জন্যে শক্তি সঞ্চয়। কোন জনগোষ্ঠীর বা সামগ্রিক ভাবে মানবগোষ্ঠীর গতিশীলতার দিকে যদি ভালভাবে নজর রাখি তাহলে তার গতিটা যেমন আমরা বড় গলায় ৰলৰ তেমনি তার বিরতিটাকেও যেন আমরা উপেক্ষা না করি। কারণ, পরবর্তী গতি দেখেই আমরা বুঝতে পারৰ তার পূর্ববর্তী বিরতিটা কেমন ছিল। এমন অনেক মানুষ আছে যারা হতাশাবাদী (pessimist) তারা বলবে, "এখন চারিদিকে কী চলছে! কোনো জীবনের লক্ষণ নেই–সৰাই যেন ঘুমোচ্ছে"। তারা এইসব বলে কারণ তারা মানব ইতিহাসকে খুঁটিয়ে দেখেনি বা দেখবার চেষ্টা করে নি। যদি দেখত তবে আশান্বিতই হ'ত। কারণ বিশ্রামের লক্ষণগুলোর দিকে ভালভাবে তাকালেই তারা বুঝত যে পরবর্তী গতির প্রস্তুতি চলছে।

সুতরাং কোন অবস্থাতেই মানুষকে হতাশাবাদী হলে চলবে না। তাই আমি সব সময়েই আশাবাদী। কারণ আমি জানি যে আশাবাদই জীবনের লক্ষণ (optimism is life).

(সকালবেলা, ১০ই মার্চ, ১৯৭৯, কলকাতা)

অষ্টম খণ্ড

সূচীপত্র

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

সাধারণতঃ 'সমাজ' বলতে নারী ও পুরুষের সমাহারকে বোঝায়। কিন্তু শব্দটির মূলগত তাৎপর্য তা নয়। প্রকৃত অর্থে 'সমাজ' বলতে বোঝায়, যেখানে সকলে একই কর্মৰন্ধনে, সম্মিলিতভাবে এগিয়ে চলেছে–'সমানম্ এজতে'। আমরা কখনও কখনও বাসে, ট্রামে, ট্রেনে বহু লোককে তো একত্রে দেখে থাকি। কিন্তা তা সমাজ পদবাচ্য নয়। একটা সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যখন বিভিন্ন ব্যষ্টি একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় ও তাকে পাৰার জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে তখনই তা "সমাজ” পদবাচ্য। ইংরেজী 'সোসাইটি' 'সমাজ' শব্দটির খাঁটি প্রতিশব্দ নয়। সামাজিক অগ্রগতি এক ধরণের সামাজিক কর্মেরই ফলশ্রুতি যেখানে পারস্পরিক ঐক্যৰন্ধন আরও বেশী সুদৃঢ় হয়ে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে চলে।

অতি প্রাচীনকালেও সামাজিক জীবন ছিল কিন্তু কোন দৃঢ়নিৰদ্ধ সমাজ ছিল না। সামাজিক জীবনের এই যে দৃঢ়নিৰদ্ধতা তা বলতে গেলে কিছু পরিমাণে ক্ষত্রিয় যুগ ও বৈশ্যোত্তর যুগের অবদান। আবার বৈশ্য যুগই শূদ্র-বিপ্লবকে ডেকে আনে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না শূদ্র-বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ তৈরী হচ্ছে ততক্ষণ কোন সামাজিক চেতনাই তৈরী হয় না-এমন বলা চলে। এখন প্রশ্ন হ'ল-কেমন করে এই সামাজিক চেতনা আনা যেতে পারে?

সামাজিক চেতনা বলতে বোঝায় একটা বিশেষ আদর্শের প্রভাব, যার দ্বারা জনগণের মধ্যে নবজাগরণ ঘটে থাকে। এটা অনেকগুলি উপাদানের ওপর নির্ভর করে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিরাট ব্যষ্টির নেতৃত্ব। সে কারণেই শূদ্র-বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সুদৃঢ় ব্যষ্টিত্ব। এর অভাবে মজবুত সমাজ কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না-সামাজিক বিপ্লব তো দূরের কথা সমাজকে ঠিক পথে পরিচালিত করবার জন্যে তাই দু'টি উপাদান মূলতঃ দরকার-একটি মহান আদর্শ, অপরটি বিরাট ব্যষ্টিত্ব। যাঁরা সমাজ সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেন অথচ ভবিষ্যৎ-ধ্বংসের কথা আশঙ্কা করে ভীত হয়ে ওঠেন তাঁরা এই কথাটা জানেন না যে প্রকৃত অর্থে

যা সমাজ তা জগতের বুকে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই এই মুহূর্তে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে 'সমাজ' প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং" মন্ত্রে সমাজ-চেতনার মূল ভাবটা নিহিত। যেখানে সেরূপ কোন মন্ত্র নেই সেখানে কোন আদর্শ নেই, আর যেখানে কোন আদর্শ নেই সেখানে জীবন একটা লক্ষ্যহীন যাত্রা মাত্র।

মানব জীবনের অভিব্যক্তি নানান দিকে ঘটে থাকে। জীবনের চলার পথও তাই ৰহুমুখী। এইসব বহুমুখী কার্যধারার মধ্যে মানুষের সংস্কৃতিই সমাজের প্রতিচ্ছবিকে বহন করে। এক কথায় মানব জীবনের বহুমুখী অভিব্যক্তির সমাহারকে ৰলৰ 'সংস্কৃতি'। সমাজে গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে মানব-অভিব্যক্তির ধারাগত তারতম্য ঘটতে পারে। যেমন কেউ হয়তো হাত দিয়ে খায়, কেউ বা চামচ দিয়ে, আবার কেউ বা কাঠি (chopstick) দিয়ে, কিন্তু খায় তো সবাই। মানব সংস্কৃতিও তাই এক ও অবিভাজ্য। সুতরাং ওই অভিপ্রকাশসমূহকে হিন্দু সংস্কৃতি, মুসলমান সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি অথবা ইয়ুরোপীয় সংস্কৃতি ৰলা অবাস্তব। যাঁরা এই সব খণ্ড ভাবসমূহকে পোষণ করে থাকেন তাঁরা মানব সভ্যতার শুভাকাঙ্ক্ষী নন।

বৌদ্ধিক উন্নতির মাধ্যমে জীবনের অভিপ্রকাশকে ৰাড়ানো যেতে পারে। তথাকথিত অনুন্নত গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের মধ্যে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতের কোন স্থানই নেই। স্বভাবতই তাদের ক্ষেত্রে জীবনের অভিব্যক্তি তুলনামূলক বিচারে কম। যেখানে অভিব্যক্তির ধারাগুলির সংখ্যা বেশী, বলা যেতে পারে, জাগতিক দিক থেকে সেখানেই সাংস্কৃতিক উন্নতি অপেক্ষাকৃত বেশী। যার মধ্যে জীবনের এই অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য যত বেশী, বলা যেতে পারে, সেই তত বেশী সংস্কৃতিসম্পন্ন। যেখানে জীবনের অভিব্যক্তি জড়াভিমুখী তাকে বড় জোর বলতে পারি 'কৃষ্টি' যা সংস্কৃতিরই অংশবিশেষ। অর্থাৎ অভিব্যক্তির অমার্জিত অভিপ্রকাশই হচ্ছে 'কৃষ্টি'। আবার জীবনের অভিজ্ঞতার স্থূল ও সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির সমষ্টিগত রূপই হচ্ছে সংস্কৃতি। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কৃষ্টিগত পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু মানুষের সংস্কৃতি সব সময়ই এক।

সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ও সভ্যতা সমার্থক নয়। জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে যেখানে সংযম রয়েছে, যৌক্তিকতার অভিপ্রকাশ ঘটেছে তাই হচ্ছে সভ্যতা। একটা বাস্তব উদাহরণ নেওয়া যাক। খাদ্য গ্রহণ করা সাংস্কৃতিক অভিপ্রকাশেরই

একটি। যাঁরা যুক্তি দিয়ে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করাকে ক্ষতিকারক বলে মনে করেন তাঁরা এর থেকে বিরত থাকেন। এই যে মার্জিত ৰোধ এটি সভ্যতারই পর্যায়ভুক্ত। যদিও মানবের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ৰহুবিধ কিন্তু তার এই বহুমুখী অভিব্যক্তির ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ বা সংযম নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিচারে তাদের আমরা উন্নত বললেও বলতে পারি কিন্তু সভ্য ৰলৰ না। কাজেই সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষকেই সভ্য ৰলা যাবে না, যদি তাদের অভিব্যক্তির মধ্যে যৌক্তিকতা, বিচারশীলতা ও সংযমের অভাব থাকে। অনুরূপভাবে যাঁরা তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিচারে অনুন্নত তারা সামাজিক বিচারে অনুন্নত নাও হতে পারে। অনেকেই আছেন যাঁরা আদিবাসীদের অনুন্নত বলে মনে করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিবেচনা এ কথাই ৰলৰে যে জীবনের ন্যূনতম অভিব্যক্তিসমূহের জন্যে তারা সংস্কৃতিগতভাবে অনুন্নত হতে পারে কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে তারা অনেকের তুলনায় বেশী এগিয়ে আছে। সামাজিক দিকে তারা অধিকতর অগ্রসর। আফ্রিকানদের সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ৰাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে। সংগ্রামই জীবনের মূল মন্ত্র। যাঁরা নিরস্ত্রীকরণের

কথা বলে' চিৎকার করেন তাঁরা আসলে মানব সমাজের শত্রু। এমনকি তাঁরা অপরাধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেও অনিচ্ছুক। এটা অবশ্য সত্য, সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিরস্ত্রকে ও দুর্বলকে আক্রমণ করবে না। কিন্তু এই জগতে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের সভ্য বলে' মনে করেন কিন্তু নির্মমভাবে অসহায় ও নির্দোষকে ধ্বংস করেন। হিরোসিমা ও নাগাসাকির মর্মান্তিক ধ্বংসকাণ্ড তথাকথিত সভ্য রাষ্ট্রের আদিম বর্বরতার স্বাক্ষরই বহন করছে। যদিও তারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে অগ্রণী কিন্তু সভ্যতার দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ অনুন্নত। তাদের ভারতীয় আদিবাসীদের চরণে এসে সভ্যতা শেখা উচিত। যারা আজ এ্যাটম বোম ও হাইড্রোজেন ৰোমের অধিকারী তাদের এই শিক্ষাই দেওয়া উচিত যে এই বিশ্ব মানুষের জন্যেই-দানবের জন্যে নয়। তাদের বিরুদ্ধে মানুষের মাথা তুলে ধরার জন্যে আরও বেশী শক্তিশালী অস্ত্র আবিষ্কার করতে হবে।

বর্তমানে সমাজ ও সভ্যতার বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। বৌদ্ধিক উন্নতির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রগতি ঘটাতে হবে। এজন্যে সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিচারপ্রবণতা ও সংযমকে

অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। আজকের দিনের মানুষের জীবনে এই গুণগুলির সম্পূর্ণ অভাব রয়ে গেছে। সর্জনমূলক আদর্শের দ্বারা ও সভ্যতার প্রসারের মাধ্যমে একটা সুষ্ঠু মানব সমাজ তৈরী করা এই বিশ্বের নেতাদের অবশ্য কর্তব্য। যদি তা করা হয় তবে সাংস্কৃতিক প্রগতি অনিবার্যভাবেই সম্ভব হবে।

পাপস্য কারণত্রয়ম্

অপরাধ-সংহিতা প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ্য যে তা সাধারণতঃ রাজনীতিবিদদের দ্বারাই প্রণীত হয়। রাজনীতিবিদ্রা তাঁদের নিজ নিজ মান অনুযায়ী ওগুলো তৈরী করেন। কখনও ওগুলোর মধ্যে মানবতার একটু স্পর্শ থাকে, আবার কখনও থাকে না। সুতরাং আইন-সংহিতা সব সময় যে মানব কল্যাণমূলক হৰে তা নয়। যুক্তিবাদী মানুষেরা আইন-সংহিতার বিরুদ্ধাচরণ করলেও করতে পারেন কিন্তু তাঁরা মৌল মানবিক নীতির বিরুদ্ধে যান না। আমি কোন দেশের নাগরিককে ওই দেশের আইন-সংহিতাকে অন্ধভাবে পালন

করতে বলতে পারি না। কিন্তু আমি তোমাদের অবশ্যই ৰলৰ, মৌল মানবিক নীতির বিরোধিতা কোরো না। এছাড়া আর একটা কথা আছে। মৌল মানবিক মূল্য মানসাত্মিক ও আধ্যাত্মিক জগতের সংযোজক বিন্দু-উভয়ের মধ্যবর্তী স্তর। একদিকে রয়েছে আধ্যাত্মিক স্তর আর অপর দিকে রয়েছে মানসাধ্যাত্মিক স্তর।

মানুষ সামাজিক জীব। সেজন্যে তাদের অবশ্যই কয়েকটি সমাজ-সংহিতা মেনে চলতে হবে। আবার সেই সঙ্গে তাদের আধ্যাত্মিক নিয়ম-কানুনও অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কেননা ভ্রান্তিবশতঃ বা অন্য কোন কারণে যদি কেউ এই সমস্ত বিধি নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে কোথাও বলি পাপ (sin), কোথাও বা অপরাধ (crime)। যদি আধ্যাত্মিক বিধি-নিষেধ কেউ লঙ্ঘন করে তখন তাকে বলা হৰে পাপ আর যদি কেউ আইন-সংহিতাকে লঙ্ঘন করে তাকে বলে অপরাধ। এই যে অপরাধ, এটা সব সময় সম্পূর্ণভাবে মৌল মানবিক নীতির ব্যাপারেই নয়, অনেক সময় ভাবজড়তার দ্বারা প্রেষিত হয়েও মানুষ করে থাকে। উপধর্মাশ্রিত ভাবজড়তার ভিত্তিতে যে পাপের ধারণা গড়ে ওঠে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষেরা তার থেকে অবশ্যই দূরে থাকবেন।

তাঁরা তাঁদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখবেন যে মৌল মানবিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ওই সমস্ত সংহতি যথার্থ কিনা। উপধর্ম, উপধর্মাশ্রিত ভাবজড়তা ও মৌল মানবিক নীতির ওপর ভিত্তি করেই মানুষের মধ্যে পাপের ধারণা গড়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বুদ্ধিজীবী তথা প্রাগ্রসর মানুষ হিসেবে সকলকে আজ উপধর্মাশ্রিত ভাবজড়তা থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে আর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে মৌল মানবিক নীতিকেই। আজ থেকে বহুদিন আগে পাপের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে মহর্ষি ব্যাস বলে গেছেন-

"অষ্টাদশপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্"।।

যা সমাজের প্রগতিকে রুদ্ধ করে দেয় তা-ই পাপ। যা সমাজের প্রগতিকে ত্বরান্বিত করে তা-ই পুণ্য। এটিই সত্য। কিন্তু অপরাধ জিনিসটা কী? বিভিন্ন দেশ বা জাতি তাদের স্থান, কাল ও পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব বিভিন্ন ধরণের সংহিতা প্রণয়ন করে; যা তার বিরুদ্ধাচরণ করে তা-ই অপরাধ পর্যায়ভুক্ত। কোনটা পাপ আর কোনটা পাপ নয় তা

নির্দ্ধারণ করতে হবে মৌল মানবিক নীতির নিরিখেই। ব্যাসদেবও এই মত সমর্থন করতেন।

ইংরেজীতে যাকে 'sin' বলা হয় তার পর্যায়বাচক প্রতিশব্দ হচ্ছে দুটি–পাপ ও প্রত্যবায়। যা করা উচিত তা যদি করা না হয় তা হ'ল প্রত্যবায়। আর যা করা উচিত নয় কিন্তু করা হ'ল তা পাপ। পাপ ও প্রত্যবায়ের সামবায়িক নামকে 'পাতক' বলে। আমি এখানে 'পাপ' শব্দটাই ব্যবহার করছি কারণ পাপ শব্দটাই বেশী জনপ্রিয়।

আমরা যখন মৌল মানবিক নীতির কথা বলছি তখন কোন উপধর্মাশ্রিত সংহিতার কথা বলছি না কারণ এগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাবজড়তার ওপর। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ কেন আজও সেগুলোকে মেনে চলবে? আমি তো ৰলৰ তোমরা ওগুলো মেনো না, বরং ওদের বিরুদ্ধাচরণ করো।

অপরাধ ও মৌল মানবনীতির মধ্যেকার ব্যবধান যতদূর সম্ভব কম হয় ততই ভাল। মৌল মানব নীতিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয়। যেহেতু এগুলো বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই দীর্ঘকালের ব্যবধানে তাদের মধ্যে কিছুটা

পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু ঘন ঘন পরিবর্তন না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ এগুলি পরমাগতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু অপরাধের ক্ষেত্রে তেমনটি হবে না। স্থান-কাল ও সামুহিক মনস্তত্ত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাতেও কিছুটা পরিবর্তন আসবে। কাজেই দু'টো ধারণা এক হতে পারে না। এদের মধ্যেকার পার্থক্য কিছুটা থাকবেই। কিন্তু ব্যবধানটা কমিয়ে আনবার প্রয়াসও থাকা উচিত। এই সদবিপ্রের কর্তব্য হ'ল, এই দু'য়ের মধ্যেকার ব্যবধানকে কমিয়ে আনা।

এবার পাপের মুখ্য তিনটি কারণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। যদি পাপ ও অপরাধকে একসঙ্গে ধরা হয় তাহলে বলতে হবে এদের পেছনকার কারণ মুখ্যতঃ তিনটি। একটি হচ্ছে ভৌতিক ও মানসিক আভোগের (physical and psychic pabula) অপ্রতুলতা, দ্বিতীয়টা হচ্ছে অতিসঞ্চিত ভৌত ও মানসিক আভোগের অব্যবহার (Non-utilisation of over accumulated physical and psychic pabula), আর তৃতীয়টি হচ্ছে মানসিক ও ভৌতিক ক্ষেত্রে গতিহীনতা।

প্রথমটির কথাই ধরা যাক। ভৌতিক ক্ষেত্রে যদি মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রিক অভাব ঘটে তাহলে মানুষ জীবনে মহত্তর কোন কিছুর অনুশীলন করতে পারে না। তোমরা লক্ষ্য

করবে যে মানুষ অসুবিধায় পড়লেই তার বিচার-বুদ্ধি কিছুটা ঘোলাটে হয়ে যায়। একটু রেগে গেলে বুদ্ধিমান মানুষও অশালীন শব্দ উচ্চারণ করে ফেলেন। কাজেই ভৌতিক সম্পদের অপ্রতুলতা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে ও তার ফলশ্রুতিতে মানুষ সুস্থ বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। যার ফলে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই পশু ভাবের দিকে এগিয়ে চলে। আর এইজন্যেই তথাকথিত সাম্যবাদী মানুষ পশুত্বের দিকে এগিয়ে যায়। এর পেছনে মনস্তাত্ত্বিক কারণটা হচ্ছে এই। অনুরূপভাবে যদি মানুষের বৌদ্ধিক আভোগের অভাব ঘটে, মানুষের বৌদ্ধিক মান যদি উন্নত না হয় মানুষ তখন ভুল করে বিধিকে নিষেধ হিসেবে ও নিষেধকে বিধি হিসেৰে গ্রহণ করে। এই ধরণের ঘটনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় যে তাতে একটা ছোট্ট নির্দোষ শিশুকেও মরতে হচ্ছে। যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উস্কানি দেয়, তারাই সমাজে নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পায় কেননা মানুষের ৰৌদ্ধিক মান যে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। তাই তারা এইসব নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একের পর এক ভুল করে' বসে, পশুতে পরিণত হয়। যে দেশগুলো অনুন্নত বা যেখানকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চেতনা অধিকতর নীতিজ্ঞানবর্জিত,

সেখানকার নেতারূপী রাজনৈতিক শূকরেরা বোট পাবার জন্যে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে। আমি এদের জন্যে 'রাজনৈতিক শয়তান', 'রাজনৈতিক শূকর' শব্দ প্রয়োগ করতে চাই। এইসব রাজনৈতিক শয়তানেরা তখনই নেতা বলে' স্বীকৃতি পায় যখন সাধারণ মানুষের ৰৌদ্ধিক মান খুবই নীচু স্তরের থাকে। যার ফলস্বরূপ ভৌতিক ও ৰৌদ্ধিক আভোগের অভাবে মানুষ পশুতে পরিণত হয়। তাদের মধ্যে পাপ ও অপরাধ-প্রবণতা বেড়ে যায়। দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়ে মানুষকে হত্যা করা অপরাধ ও পাপ দুই-ই। রাজনৈতিক লড়াইয়ে নিরীহ মানুষও নিহত হয়-এটাও অপরাধও, আবার পাপও। এর কারণটা এই যে ভৌতিক ও ৰৌদ্ধিক আভোগের অভাবে মানুষ পশুতে পর্যবসিত হয়ে অপরাধ-পাপ কাজে রত হয়। পাপের তিনটি কারণের মধ্যে এটি হ'ল প্রথম ও প্রধান। আর একথাটা বিশ্বের কয়েকটি সম্পদশালী দেশকে বাদ দিয়ে অন্য প্রায় সব দেশের ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। এমনকি সেইসব সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিতেও পাপের এই কারণটা বর্তমান। কিন্তু তা রয়েছে কিছুটা প্রচ্ছন্ন ভাবে।

একটু আগেই বলছিলুম পাপের দ্বিতীয় কারণটি হ'ল অতিসঞ্চিত ভৌতিক ও মানসিক আভোগের অব্যবহার।

যেখানেই ভৌতিক সম্পদের অতিরিক্ত সঞ্চয় হয় সেখানেই দেখা দেয় কতকগুলো সমস্যা। মানুষের প্রয়োজন অগুণতি নয়, প্রয়োজন পেটের ভাত, পরনের কাপড় ও এমনি আরো কয়েকটি জরুরী জিনিস। এমনকি মানুষ বহু জিনিস চায়ও না। অত্যধিক অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছাটা একটা মানসিক ব্যাধি। ধনসঞ্চয়কারীরা মানুষের প্রয়োজন পূর্তির জন্যেও সঞ্চয় করে না অথচ বলা যেতে পারে মানুষের প্রয়োজন স্বল্প কয়েকটিই। উদাহরণস্বরূপ ধরো, কোন মানুষের একটা আঁৰবাগান রয়েছে। তাতে আঁৰ ফলে পাঁচশ'টা আর পরিবারের লোকসংখ্যা হচ্ছে মাত্র পাঁচ জন। তাহলে সে অতগুলো আঁৰ নিয়ে কী করবে? সঞ্চয় যেখানে অত্যধিক সেখানে যথার্থ উপযোগের সুযোগ কমই থাকে। তাই সদ্বিপ্ররা যদি সতর্ক না থাকে তাহলে যেখানেই অত্যধিক ধনসঞ্চয় ঘটবে সেখানেই সঞ্চিত সম্পদের অপব্যবহারও থেকে যাবে। অধিকন্তু যেখানেই অতিসঞ্চয় সেখানে মানুষ স্থূল বৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে সম্পদের অপব্যবহার করে বসে। তাই তোমরা লক্ষ্য করবে, যে কথা আমি তোমাদের পরিষ্কার করে বলেছি যে, ধনী ব্যবসায়ীরা, প্রাচীনকালের অধিকাংশ রাজা-মহারাজারা, নবাৰরা ও সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা যাদের করার মত কিছুই

থাকত না তারা সাধারণতঃ হ'ত দুষ্ট ও নীচাশয়। এছাড়া আরও দেখবে, যে সমস্ত পদস্থ কর্মচারী কোন উচ্চ মানসিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা করেন না তাঁরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নীচ প্রবৃত্তির হয়ে থাকেন। মানুষকে যখন বিচার করৰ তখন সত্য কথাটা খোলাখুলিই ৰলৰ। তাই এটা স্বাভাবিক যে যেখানে ভৌতিক ও মানসিক আভোগের অতিসঞ্চয় ঘটেছে মানুষ সেখানে পাপের পথে এগিয়েছে। মানসিক আভোগের ক্ষেত্রেও যেখানে অতিসঞ্চয় হয়েছে সেখানেও একই জিনিস ঘটেছে। যদি কেউ অত্যধিক মেধার অধিকারী হয় কিন্তু সেই মেধা বা বুদ্ধি যদি ঠিক পথে পরিচালিত না হয় আর সেখানে সদ্বিপ্রের শাসন না থাকে তাহলে মানুষ সেখানে মার্জিত শয়তানে (polished Satan) পরিণত হয় ও বহু মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কারো মা-ৰাপ মারা যাবার পর যদি আর কোন অভিভাবক না থাকে সেক্ষেত্রে সেই ছেলে জীবনে বেপরোয়া হয়ে যায় ও শেষ পর্যন্ত পাপের পথে নেবে যায়। এটাই হ'ল পাপের দ্বিতীয় কারণ।

আমি ইতোপূর্বে ধনী-নির্ধনের কথা বলেছি। ধনীদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে গরীবেরা পাপীতে পরিণত হয় (তাদের নিজেদের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাতে গিয়ে দাসত্বের জীবন বরণ

করে ও পাপের পথ গ্রহণ করে) আর ধনীরা হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে তাদের বৌদ্ধিক ও ভৌতিক সম্পদের অপব্যবহার করে থাকে। নেপথ্যে থাকে বড় বড় পুঁজিপতিরা আর সামনে থাকে তাদেরই তল্পিবাহক হিসেবে অর্ধনগ্ন ছেলেমেয়ের দল। সমাজের পতনের এটাই হ'ল কারণ। এছাড়া আরও একটা জিনিস রয়েছে। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানকার জনগণের জীবনযাত্রার গড় মান ভালই আর সেখানে এমন কেউ গরীব নেই যারা ধনীর দুষ্পবৃত্তি চরিতার্থতার জন্যে তাদের দাসত্বও স্বীকার করবে। যেখানে অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে সেখানকার লোকেদের চিন্তা জাগে এই বিরাট সম্পদ নিয়ে তারা কী করবে। অধিকন্তু অনেক সময় যথোচিত নির্দেশনা না পেয়ে মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে সামাজিক পরগাছায় পরিণত হয়। তখন তারা একটা ঋণাত্মক মানসিক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়। তারা বুঝতে পারে না তাদের কী করণীয় আর কী-ই বা অকরণীয়।

এবার পাপের তৃতীয় কারণটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই বিশ্বের সবকিছুর অস্তিত্বের লক্ষণ হ'ল চলমানতা। আগের প্রবচনে ৰলেছি যে ভৌতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে আসলে কোন

প্রগতিই হয় না। প্রগতি হয় কেবল আধ্যাত্মিক স্তরেই। ভৌতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে কোন প্রগতি হয় না ঠিকই কিন্তু সেখানেও চলমানতা রয়েছে। যদি চলমানতা না থাকত তাহলে ভৌতিক ও মানসিক জগতে জীবের চরম অধোগতি হ'ত। তাই সেখানে চলমানতা রয়েছে কিন্তু প্রগতি নেই। "প্রকৃষ্ট গতি ইত্যর্থে প্রগতি"। যা মানুষকে ক্রমোন্নতির পথে চালিত করে তা-ই প্রগতি আর যা চলমানতা বজায় রাখে কিন্তু উন্নতি সংসাধিত করে না তা প্রগতি পদবাচ্য নয়। ধরো একটা ষাঁড় রাস্তার ওপর দিয়ে চলছে, আর একটা ষাঁড় ঘানি-গাছে জোড়া রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রথম ষাঁড়টা কয়েক মাইল চলে যেতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

"আসন মারে ক্যায়া হুয়া যো গয়ী ন মনকী আশ
জব কলু কা ৰলদ সো ঘরহী কোশ পঁচাস।"

ভৌতিক ও মানসিক জগতের ক্ষেত্রে গতিশীলতা থাকতে পারে কিন্তু প্রগতি হবে না। **আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে মানুষ সাধনার দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছিল।** দশ হাজার বছর পরে তোমরা এলে। আজকের পৃথিবীতে ভৌতিক

ক্ষেত্রে খুবই চলমানতা রয়েছে, বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও রয়েছে খুবই চলমানতা। তোমাদের মেধা হয়তো বা বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের চেয়েও বেশী। কিন্তু তবুও বলব, সে তুলনায় প্রগতি কিন্তু বেশী হয়নি। তাই নয় কী?

যখন কোন চলমানতা ভৌতিক ও মানসিক স্তরে থাকে না তখনই তা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধরো একটা গোরুর গাড়ী অচল হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। অবস্থাটা গাড়ীর আরোহী তথা পথচারী দু'য়ের পক্ষেই অসুবিধাজনক। সেই অবস্থায় গাড়ীটিকে টেনে সরাবার দরকার হয়ে পড়ে। যদি সেই গাড়ীটা রাস্তার একপাশে না যেতে চায় তাহলে তোমাকে সেটাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলতে হবে- এটাই নিয়ম। তোমাকে একথা বললে চলবে না, ঠিক আছে গাড়ীটা যেমন আছে তেমনি থাক। পরিবারের সদস্যরা রক্ষণশীল মানসিকতা নিয়ে চলবে-এমনটা হতে দেওয়া যায় না। যারা এই ধরণের রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে চলে তারা বাস্তবিকই জড়বাদী ও মানসিক দিক থেকে স্থবির। তাদের মধ্যে গতি সঞ্চার করতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদের চলার গতিতে দ্রুতিও আনতে হবে।

কিন্তু এইটাই কি পাপের কারণত্রয়ের প্রথমটির একমাত্র সমাধান হ'ল? যাদের ভৌতিক আভোগের অভাব রয়েছে তাদের জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্তির নিশ্চিততা দিতে হবে। নইলে তারা পাপের পথ ধরবেই। জনসাধারণকে পাপের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ন্যূনতম চাহিদার পূরণ করতেই হবে। আর যদি তা না করো তাহলে তোমার বিপদ অনিবার্য। তোমার প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে তোমার ঘরেও তো আগুন লাগৰে। সকলের ন্যূনতম চাহিদা পূর্তির ব্যবস্থা করার জন্যে এক শক্তিশালী শাসনযন্ত্র ও ৰৌদ্ধিক উপায় দু'টোকেই প্রয়োগ করতে হবে। আর তা যারা করবে তাদেরই বলা হৰে সদ্বিপ্র। **সদ্বিপ্নের অভাবে সমাজ টিকতে পারবে না।**

দ্বিতীয় কারণটির সমাধানের প্রসঙ্গে একথাই বলা যায় যে মানুষকে বৌদ্ধিক আবেদন তথা ৰৌদ্ধিক প্রচারের সাহায্য নিতেই হবে। আর এই তত্ত্বের বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী দৈহিক শক্তিকেও কাজে লাগাতে হবে। যারা যথাযথ ভৌতিক ও বৌদ্ধিক দু'টো উপায়ই অবলম্বন করছে তাদের বলা হৰে সদ্বিপ্ন। এই সদ্বিপ্নদের বাদ দিয়ে সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। একদিকে অতিসঞ্চয়ের ফলে জিনিসপত্র পচে যায় আর অন্যদিকে অভাবের তাড়নায় মানুষ পাপী হয়ে

যায়। আমরা এই অবস্থাটাকে দীর্ঘদিন ধরে চলতে দিতে পারি না।

পাপের তৃতীয় কারণটি হ'ল সর্বাত্মক গতিহীনতা। এটিই মানব সমাজের সবচেয়ে বড় বোঝা ও সবচেয়ে জটিল রোগও। এটা একটা মানসিক রোগ। অনেকে বলেন, "আমাদের পূর্বপুরুষেরা এটা করতেন"। কিন্তু তুমি তোমার পূর্বপুরুষ নও। তোমাকে তোমার নিজের মত করে ব্যবহার করতে হবে। একজন শ্রীসিংহাসনের ছেলে ছিল শ্রীরামধর। যদি শ্রীরামধর সিং বলেন, তিনি তাঁর বাপের মতই আচরণ করবেন কিন্তু তাই বলে কি তিনি তাঁর পিতা শ্রী সিংহাসনের মতই হয়ে যাবেন? তা হবার নয়। এই ধরণের জড়তা আত্মঘাতী। কারণ জীবনের লক্ষণ হ'ল চলমানতা। আবার যেখানে এই চলমানতার অভাব রয়েছে তাকে বলি মৃত্যু। এই চলমানতাকে বাদ দিতে গিয়ে মানুষ নিজের তথা অন্যের ক্ষতি করে বসে।

"ভয়াণাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনামং পাবনং পাবনানাম্!"

জীবের পক্ষে চলমানতা যেমন অত্যন্ত মূল্যবান তেমনি পরমপুরুষের পক্ষেও তা অতি মূল্যবান। তাই চিকিৎসকেরা রোগীর নাড়ী দেখে তার গতিবিধি ভালভাবে পরীক্ষা করেন। নাড়ীর গতি স্তব্ধ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে মৃত ৰলে' ঘোষণা করা হয়, কারণ চলমানতাই হ'ল জীবন। পাপের এই কারণটির সমাধান করতে গেলে কেবল ৰৌদ্ধিক আবেদন-নিবেদনে কাজ হবে না। যারা ভাৰজড়তাকে মনে স্থান দিয়েছে, এমনকি যারা গতানুগতিকতাকেও মেনে চলে তারা মানুষও নয়, আবার পশুও নয়। তারা যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না। তাই তাদের আঘাত করতেই হবে। আর যারা সেই আঘাত হানার কাজটা করবে তাঁরাই হলেন সদ্বিপ্র। আবার এই আঘাত হানতে গেলে দরকার হাতুড়ির। তাই বলছিলুম যে আঘাত হানতে গেলে সেটা সাধারণ হাতুড়ির দ্বারা হবে না, প্রকাণ্ড বড় হাতুড়ির দ্বারা আঘাত করতে হবে।

ধরো যদি সদ্বিপ্ররা প্রকাণ্ড হাতুড়ির আঘাত না হানেন তাহলে কী হবে? কারণ পাপীদের অবাঞ্ছিত উপস্থিতির জন্যে অপরের অগ্রগতির দ্রুতি ব্যাহত হয়। জড়তাগ্রস্ত মানুষেরা আত্মহননের পথ বেছে নেয় ও সেইসঙ্গে অপরের মৃত্যুর কারণও হয়। সদ্বিপ্ররা ওদের ছেড়েও দেবেন না, ক্ষমাও

করবেন না। বরং কঠোর হাতে তারা তাঁদের ঠিক পথে আনবেন। তথাকথিত বুদ্ধিমান মানুষেরা তাদের রক্তচক্ষু দেখিয়ে সদ্বিপ্রদের থামাতে পাৰবে না, সশস্ত্র সৈনিকেরা অস্ত্রের দ্বারাও তাদের প্রগতির গতি রুদ্ধ করতে পাববে না, যেহেতু মানবতা এগিয়ে চলতে চায়। আর স্থবির মানুষগুলি যারা ঠিক মানুষও নয়, আবার পশুও নয়, তারা সদ্বিপ্রদের চলার পথে অবরোধ সৃষ্টি করে, তাদের গতিকে ব্যাহত করে। সাধারণতঃ মানুষ এইসব ৰাধার প্রাচীরকে সহ্য করবে না।

মানুষ জেনে বুঝে এই ধরণের আত্মহত্যার পথকে গ্রহণ করে না। যারা আত্মহত্যার পথকে বেছে নেয় বুঝে নিতে হৰে যে তাদের মন এক বিরাট ঋণাত্মক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই মানুষ হাতুড়ির ঘা মেরে এই সমস্ত অস্বাভাবিক ৰন্ধনকে সরিয়ে দেবে। সদ্বিপ ছাড়া আর কারো পক্ষে তা' করা সম্ভব নয়।

সদ্বিপ্রের কর্তব্য হ'ল সময়োচিত হাতুড়ির আঘাত হেনে সেই পঙ্গু বা স্থবির মানুষগুলোকে জাগিয়ে দেওয়া; অন্যথায় তারা সমাজের বোঝাই থেকে যাবে ও ভৌত-মানসিক ক্ষেত্রে একটা গতিহীনতা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসৰে।

এই আঘাত হানার মধ্য দিয়েই মানব-প্রগতির পথটি সরলরৈখিক, সুনির্মিত ও সুপ্রশস্ত হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, পাপের এই যে তিনটি মুখ্য কারণের কথা বলা হ'ল তারা কৰে অপসারিত হবে? উত্তরে একথাই বলৰ, যতদিন না সদ্বিপ্ররা কঠোর হাতে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ততদিন তারা দূর হবার নয়। তাই এই মুহূর্তে বিশ্বের সদ্বিপ্রদের কাছে আমার আহ্বান-তাঁরা যেন আর বিন্দুমাত্র দেরী না করেন। তাদের উচিত সামনের দিকে এগিয়ে চলা, মানবতাকে বাঁচানো, ও মানবতার চলার পথকে নিষ্কণ্টক করা।

শোষণ করা চলবে না

আমি ইতোপূর্বেই বলেছি যে মানুষের মধ্যে যতটা সামর্থ্য রয়েছে মানুষ তার খুব অল্প অংশই কাজে লাগায়। বলতে গেলে, তার সামর্থ্যের শতকরা এক ভাগও প্রয়োগ করে না।

আর সমাজ যাদের মহাপুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, দেখা যায় তারাও বড় জোর শতকরা দশভাগ সামর্থ্যের উপযোগ নেয় আর বাকী শতকরা নব্বই ভাগ অব্যবহৃত থেকেই যায়। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, মানুষ তার সামর্থ্যের নব্বই ভাগই কাজে লাগায় না। স্থূল ব্যষ্টি যারা তারা তো তাদের অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের অর্ধেকটা কেবল শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। বাকি সামর্থ্যের খুব অল্প ভাগই সে প্রকৃত কাজে লাগায়।

স্থূল শরীর মানে দৈহিক সামর্থ্যযুক্ত এই কাঠামোটা। আর মানসিক ও আধ্যাত্মিক সামর্থ্য তো অব্যবহৃত থেকেই যায়। এই যে সামর্থ্যের পুরোপুরি প্রয়োগ হচ্ছে না-এর পেছনে কারণগুলো কী কী? একটা হচ্ছে-মানুষের ঠিক পথটা জানা নেই। কী করা উচিত, কী ভাবে করা উচিত-এসব বিষয়ে ঠিক জ্ঞানের অভাবই হ'ল মুখ্য কারণ। গৌণ কারণটা হচ্ছে-মানুষের স্বভাবগত আলস্য। মানসিক সামর্থ্যের প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানসিক আলস্য ও আধ্যাত্মিক সামর্থ্যের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক আলস্য লক্ষ্য করা যায়।

লক্ষ্য করা গেছে, বহু লোক খুব অল্প বয়সেই, এমন কি ৰার-চউদ্দ বছর বয়সেই ভাবতে শুরু করে দেয়, কীভাবে তাদের মানসিক সামর্থ্যের ষোল আনা উপযোগ হওয়া উচিত। তারা কম বয়সেই ভাবতে থাকে যে আধ্যাত্মিক সাধনা করা উচিত। কিন্তু আলস্যবশতঃ তারা তা করে না। এই অলসতাবশতঃ মানুষের সে সামর্থ্য (potentiality) সেটা অব্যবহৃত থেকে যায়। পরে তাতে মচে ধরে যায়।

এই পৃথিবীর যারা বড় বড় মহাত্মা ব্যষ্টি, বৌদ্ধিক তথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁরাও তাঁদের সামর্থ্যের শতকরা মাত্র দশভাগ কাজে লাগান। এটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার। আবার এর চেয়েও অধিকতর দুঃখপ্রদ হচ্ছে এই যে, এমন কিছু লোক রয়েছে যারা মানুষের সমগ্র সামর্থ্যের পূর্ণ উপযোগ চায় না। এটা শুধু লজ্জার কথা নয়, অত্যন্ত নিন্দার কথা যে মানুষটা নিজে তো কিছু করবেই না, উপরন্তু অপরকে কোনো কিছু করতে দেবেও না। ওরা চায় না যে অপর কেউ উন্নতি করে। আমি যেহেতু এগিয়ে চলছি না, তাই অন্যেও যেন এগিয়ে না যায়-এই যে মানসপ্রবণতা এটা অবশ্যই নিন্দনীয়, বিপজ্জনকও। তারা কেমন করে এটা করে তা তোমরা অবশ্যই দেখেছ, জেনেছ। ধরো, একটা লোক দেখতে খুবই

কালো। ওর সঙ্গীসাথীরা, এমন কি ওর স্কুলের শিক্ষক পর্যন্ত ওকে কেলো ভূত বলে নিন্দে করে। এতে ওর মন অবদমিত হয়ে পড়ে, সামর্থ্যও রুদ্ধ হয়ে যায়। সে ভাবতে শুরু করে- আমি ছোট, আমি নীচ, আমি তো কুশ্রী ইত্যাদি।

কারো হয়তো তথাকথিত নীচ বংশে জন্ম হ'ল তো লোকেরা তারে জাত-পাত তুলে ৰলৰে-আরে! ওর আবার কী লেখাপড়া হবে! এর ফলে যার বিরুদ্ধে এই ধরণের নিন্দা বা কটুক্তি করা হয় তার মন কুন্ঠিত হয়ে পড়ে, তার অগ্রগতিও রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি যে লোকটা গরীব, যার একেবারেই টাকা-পয়সা নেই, সেই লোকটাকে অন্যে তার আর্থিক দুর্গতির সুযোগ নিয়ে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করে। হয়তো কোনো একটা গরীব মেধাবী ছেলে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে লেখাপড়া করে এগিয়ে যাচ্ছে। ঈর্ষাপরায়ণ নিন্দুক ব্যষ্টিরা কটুক্তি করে বলে-চাকর-বাকরের কাজ-টাজ ধরো, লেখা-পড়া শিখে কী আর হবে! এর ফলে অনেক ভাল ভাল বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান মানুষের সামর্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। এটা শুধু দুঃখ বা লজ্জার কথাই নয়, এটা হ'ল মানুষকে দমন (oppression), অবদমন (suppresson), প্রদমন (repression) আর শোষণ (exploitation) করা। এর ফলে বহু মানুষের

প্রতিভা স্ফুরণের পথটাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। একেই দর্শনে বলা হয়ে থাকে বৌদ্ধিক শোষণ (intellectual exploitation)। তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করবে।

বলা হয়ে থাকে যে স্বাভাবিক সামর্থ্যের পুরো উপযোগ তো হয়-ই না, কেউ যদি কেবল শতকরা দশ ভাগ সামর্থ্যের উপযোগ করলেন তো তাঁকে সমাজে মহান ব্যষ্টি বলে গণ্য করা হয়। এখন কেউ যদি সামর্থ্যের শতকরা * এক শ' ভাগই প্রয়োগ করলেন তাহলে না জানি কী হয়ে যাবে। এর পেছনে কারণটা হ'ল ঠিক পথ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। দ্বিতীয় কারণ: অলসতা। তৃতীয় হ'ল : ঠিক পথের খোঁজ পেলেও আর অলস না হ'লেও যদি কারুর ওপর স্বাভাবিক চাপ অথবা বৌদ্ধিক চাপ অথবা কোন সামাজিক চাপ থাকে, তাহলেও বড় বড় প্রতিভার স্ফুরণ হয় না, তার বিকাশ ব্যাহত হয়ে পড়ে। তাই তিন নম্বর কারণটা হ'ল খুবই ক্ষতিকারক।

তোমরা এই ধরণের সামাজিক-ৰৌদ্ধিক শোষণ (socio-intellectual exploitation) হতে দিও না। দেখৰে, সমাজে এমনও মানুষ পাৰে যারা নিম্ন শ্রেণীর ছোট ছোট পাপ কাজ

করে থাকে। এখন এই রকম লোকদের তুমি যদি ৰাৱ ৰার পাপী বলে সম্বোধন কর, তা'হলে তার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হৰে. যে আমি পাপী, আমি হীন, আমি নীচ ব্যষ্টি, আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তোমরা এমনটা করবে না। ওর মধ্যে কী কী সদ্গুণ রয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করবার চেষ্টা করবে ও সেই সদ্গুণগুলোর প্রশংসা করবে। তার ফলে সে তখন ভালো পথে চলা শুরু করে দেবে; ভাবতে শুরু করে দেবে, তা হলে এই পৃথিবীতে আমারও প্রশংসা করার লোক আছে। সে তখন উৎসাহিত হয়ে আরো বেশী করে এই দিকটারই অনুশীলন করবে। তার মধ্যে যে যে সদ্গুণ রয়েছে সেই সেই দিকে বেশী করে নজর দেওয়ার মধ্যে যে পাপ ছিল, দোষ ছিল সেগুলো ক্রমশঃ কমে আসতে থাকৰে। আর কিছুদিন পরে ওই মানুষটাই পাপ কাজ করা একেবারে বন্ধ করে দেবে। তার মন কেবল ভালো কাজেই ব্যস্ত থাকৰে। তাই বলি, মানুষের সদ্গুণের প্রশংসা করেই উৎসাহ যোগাও। তথাকথিত পাপী-তাপীদের চারিত্রিক সংশোধনের অন্যতম উপায় হ'ল প্রশংসা করা। পাপীকে 'পাপী' বলে অবজ্ঞা করলে তার প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তাতে সে অধিকতর পাপী হয়ে যাবে। তথাকথিত পাপীকে বার বার পাপী বললে ও তাকে

সামাজিক শাস্তি দিলে তার পাপ-প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। ধরো, কোন মানুষ পাপের পথে এগোচ্ছিল। মনের পুরো শক্তি নিয়েই পাপপথে এগিয়ে চলছিল। অবশ্য তার মধ্যে দু'-চারটা সদ্‌গুণও ছিল। এখন তুমি যদি সেই গুণগুলোর প্রশংসা করে দিলে তো সে তখন পাপের পথে না গিয়ে তার বিরুদ্ধে চলা শুরু করে দেবে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বে বড় রকমের একটা দিক-পরিবর্তন ঘটে গেল। এটাই হ'ল ঠিক পথ। তা না করে বার বার তাকে কেবল পাপী ৰলে অবজ্ঞা করলে সে তখন তার অন্তর্নিহিত সদ্গুণের চর্চা তো করবেই না, বরং সে পাপের পথকে এত জোরে আকঁড়ে ধরবে যে একদিন সে সমাজের একটা মস্ত বড় বোঝায় পরিণত হৰে। মানুষ মানুষের এই মনস্তত্ত্বটা না জানায় তাকে একটা বিরাট সামাজিক বোঝায় পরিণত করে।

অবজ্ঞাত, অবহেলিত মানব আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মনে মনে ভাবতে শুরু করে-আমি যখন একবার পাপের পথে নেৰেছি, আমি যখন পতিত হয়েছি তখন একেবারে নরক পর্যন্ত দেখে তবে ছাড়ৰ। এইজন্যে দেখো, তোমাদের অজান্তে যেন এই ধরণের মনস্তত্ত্ববিরোধী কাজ না হয়ে যায়। আর তোমরা এটাও দেখৰে যে সমাজে যেন অন্যান্য লোকেরাও এই ধরণের

অপকর্ম করার সুযোগ না পায়। কেন না পাপীকে তিরস্কার করলে সে ভালো মানুষ হয় না। তাই পরোক্ষভাবে চাপ দিয়ে ও বাহ্যিক আকর্ষণের দ্বারা, পরমপুরুষের প্রতি আকর্ষণের দ্বারা খারাপ মানুষও ভাল মানুষে পরিণত হয়। দুষ্টকে ধর্মপথে নিয়ে এসো। দেখবে সে তখন পরমপুরুষের আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেছে আর সঙ্গে সঙ্গে ওই মানুষটির মধ্যে যে যে সদ্গুণ নিহিত রয়েছে সেগুলো প্রোৎসাহিত করো। এটাই ঠিক মনস্তাত্ত্বিক উপায়, সত্যিকারের সংশোধনের রাস্তা।

তা হলে এখানে দু'টো কথা এসে পড়ছে। এক, বৃহতের আকর্ষণ; দুই, সামাজিক চাপ। বৃহতের আকর্ষণের ফলে সে ধর্মপথে চলতে শুরু করে দেবে। আর সামাজিক চাপের ফলে তার অভ্যন্তরীণ সদ্গুণগুলো বাহ্যিক স্ফুরণের সুযোগ পাবে। সামাজিক চাপ মানে কাউকে সমাজচ্যুত করা নয়, কাউকে সমাজ থেকে বার করে দেওয়া নয়, তাকে জল, আগুন ইত্যাদির সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া নয়–এগুলো ঠিক সামাজিক চাপ নয়। এপথে কোন লাভ হয় না, কোন কাজই হয় না। বরং তাতে প্রতিপক্ষের জিদ আরো বেড়ে যায়। তাহলে সামাজিক চাপ বলতে ঠিক কী বোঝায়–না, সেই লোকটার ভালো দিকটাকে, তার সদ্গুণগুলোকে প্রোৎসাহিত করে,

তার অস্তিত্বের দিক-পরিবর্তনে সহায়তা করা। মানুষের কাজ একটাই। যা ক্ষতিকর, যা খারাপ-সেগুলো সরিয়ে দাও। যে বা যারা সমাজের স্বার্থবিরোধী কাজ করবে তোমরা তার বিরোধিতা করবে। চলার পথে তোমাদের এই শ্লোগান হোক- মানুষকে আর শোষণ করা চলবে না, শোষণ করা চলবে না।

Human exploitation-no more, no more.

(আ. ব. মৃ. ৭/৬৬)

(৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭৯, পটনা)

মানব সভ্যতার ক্রমঃবিকাশ

মানুষ পৃথিবীতে এসেছে প্রায় দশ লাখ বছর আগে। এই দশ লাখ বছরে মানুষের পাঞ্চভৌতিক তথা মানসিক জগতে কতখানি উন্নতি বা কতখানি বিবর্তন হয়েছে সেটা আজ ভেবে দেখা দরকার।

মানুষের অস্তিত্ব তিনটে স্তরে বিন্যস্ত–তার স্থূল শরীর, তার মানস শরীর ও তার আত্মা। আত্মিক উন্নতি ৰলতে যা বোঝায় সেটা হচ্ছে বস্তুতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে, সন্তুলন রক্ষা করে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয় পরমপুরুষের দিকে। এভাবে সে যতই এগিয়ে যায়, পরমপুরুষের দিব্যদ্যুতিতে তার অস্তিত্ব ততই উদ্ভাসিত হতে থাকে, ততই সে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকে। আর যখন সে পরমপুরুষের অতি সান্নিধ্যে এসে যায়, যাকে 'সার্ষ্ঠি' বলা হয়, তখন সেও পরমপুষের মত হয়ে যায়। আর সে যখন তাঁতে মিশে যায় তখন 'দুই' থাকে না, 'এক' হয়ে যায়। মানুষের পাঞ্চভৌতিক জগতে তার যা অস্তিত্বের নির্ণায়ক ও মানসিক জগতে তার যা অস্তিত্বের উপকর্ত্রী, এই দু'টোর ওপরই তার আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করে। যদিও ইতোপূর্বে 'আর-ইউ'-এর কোনো একটা সভায় আমি বলেছিলুম যে মানুষের উন্নতি মানেই আধ্যাত্মিক ভূমিতে উন্নতি, বাকী দু'টো ভূমিতে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক ও মানসিক ভূমিতে একদিকে যতটুকু উন্নতি হয় অন্যদিকে আবার তেমনি নানান ৰাধাও নোতুন করে এসে পড়ে। তাই গড়ে শেষ পর্যন্ত তার ফলশ্রুতি যা হয় তা দেখে এটাই বলতে হয় যে মানুষের উন্নতি পাঞ্চভৌতিক

জগতে হয় না, মানসিক জগতেও হয় না! তবু মানুষ প্রয়াস করে যাবে, অশেষভাবেই চেষ্টা করে যাবে, কারণ থেমে থাকা মানুষের স্বভাব নয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো জিনিসেরই থেমে থাকা স্বভাব নয়। সবাই চলছে, সবাই চলৎ। 'গম্' ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয় করে 'জগৎ' শব্দটা নিষ্পন্ন হয়েছে যার মানে–চলাই যার স্বভাব।

চলা যেখানে থেমে গেছে সেখানে অস্তিত্ব নস্যাৎ হয়ে গেছে। বেঁচে আছে মানেই চলছে। পাঞ্চভৌতিক জগতে মানুষের উন্নতি কতটুকু হয়েছে বা মানসিক জগতেই বা কতটা উন্নতি হয়েছে সেটাই এখন ভেবে দেখবো। বাধাবিপত্তি কতটা এসেছে সেটা ভেবে দেখবো না, কারণ এই সম্বন্ধে আগেই বলেছি যে শেষ পর্যন্ত উন্নতি একমাত্র আধ্যাত্মিক ভূমিতেই হয়, বাকী দু'টো ভূমিতে হয় না।

আজ থেকে দশ লাখ বছর আগেকার সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের শারীরিক সংরচনা, আর আজকের মানুষের শারীরিক সংরচনায় অনেক তফাৎ। তখনকার মানুষের 'ক্রেনিয়ামটা' ছিল ছোট্ট, মাথার খুলিটা ছিল ৰড়, হাতগুলো ছিল বেশী লম্বা, লিমফ্যাটিক গ্ল্যান্ডগুলো ছিল বেশী সক্রিয়। মানুষ লম্ফ–ঝম্প করতে খুব ভালোই পারতো। একটা গাছের ডাল থেকে আর

একটা গাছের ডালে সহজেই সে লাফিয়ে পড়তে পারতো। এখন যেমন মানুষের সমবর্গীয় অন্যান্য জীব অর্থাৎ বাঁদর জাতীয় জীবেরা যা করে থাকে সে কালের মানুষও তা-ই পারতো। সুতরাং তফাৎ ছিল খুবই কম।

মানুষ হ'ল লাঙ্গুলবিহীন বানরগোষ্ঠীর সদস্য। কিন্তু সেই গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য, যেমন শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং, গরিলা- তাদের উন্নতি পাঞ্চভৌতিক জগতে খুব কমই হয়েছে, মানুষের হয়েছে বেশী। মানুষের চেহারায় পরিবর্তনও অনেক বেশী হয়ে গেছে। এমনটা কেন হ'ল? তার খুব গভীরে প্রবেশ না করেও এটা বুঝি যে সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের (clash and cohesion) ফলেই মানুষের এই পরিবর্তনটা এত বেশী করে হয়েছে। মানুষের স্নায়ুকোষের মধ্যে বিস্তারের ও উন্নতির সম্ভাবনা যতটা ছিল অন্যান্য অ-লাঙ্গুল মানবগোষ্ঠীতে ততটা ছিল না। তাই তারা পেছিয়ে পড়েছে, মানুষ এগিয়ে গেছে। তার সঙ্গে, যা একটু আগে বললুম, প্রাকৃতিক পরিবেশে সংঘর্ষ ও সমন্বয় মানুষকে আরও অনেক বেশী সেদিন সাহায্য করেছিল। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে যেমন গরিলারা পাহাড়ের ওপর, গাছের ওপর থাকে, আদিম মানুষও সেদিন তেমনিভাবে সেখানে থাকতো। মানুষ পাহাড়েই বেশীকাল বাস করেছে।

তারপর মানুষ এগিয়ে চলেছিল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, নদীর তীর ধরে, উজান থেকে ভাটির দিকে। এই হ'ল মানব সভ্যতার একটা দিদর্শন।

হাতে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণও কতকগুলো রয়েছে। যেমন পাহাড়কে পুরোনো সংস্কৃতে বলা হত 'গোত্র'। 'গোত্র' মানে পাহাড়। তখন এক একটা মানবগোষ্ঠী এক একটা পাহাড়ের ওপর থাকতো। তাদের যে সর্দার ছিলো সেই সর্দারের নামেই সেই পাহাড়টা অভিহিত হতো। তাই পরিচয় নেবার সময় বলতো–"তুমি কোন্ গোত্রের লোক।" উত্তর দিত–"আমি অমুক গোত্রের লোক অর্থাৎ আমি অমুক পাহাড়ের লোক?" তার থেকেই 'গোত্র' শব্দটা এসে গেছে, বংশ পরিচয়েও 'গোত্র' শব্দটা এসে গেছে।

অতি প্রাচীনকালে পশুজগতের মতো মানুষ সমাজেও ছিলো সম্পূর্ণভাবে 'মাতৃগত কুলব্যবস্থা' ও 'মাতৃগত দায়াধিকার ব্যবস্থা' (ম্যাট্রিলিনিয়াল অর্ডার এণ্ড ম্যাট্রিয়ার্ক্যাল্ অর্ডার)। পরিচয় দিতে গেলে মানুষ সেকালে মায়ের নাম বলতো, মাতামহীর নাম বলতো, কারণ পিতৃপরিচয় তখন নির্ধারিত হতো না, কারণ বিবাহ প্রথার তখন প্রবর্তন হয় নি। সমাজ এইভাবেই এগিয়ে এসেছে।

সেই সময় জীবন ছিল সংঘর্ষমুখর। একটা গোত্র অর্থাৎ একটা পর্বতের সঙ্গে অন্য পর্বতের অহরহ সংঘর্ষ হ'ত। তাই এক পর্বতে বসবাসকারীরা সবাই ভাই-বোনরূপে গণ্য হ'ত। তাই ৰিৰাহাদি করতে হ'ত অন্য গোত্রে, অন্য পাহাড়ে। সংঘর্ষের ফলে যারা জয়ী হ'ত তারা অপর পক্ষের নারীদের বিবাহ করতো অর্থাৎ ভিন্ন গোত্রের নারীকে বিবাহ করতো। সেই গোত্রের নারীকে ধরে বেঁধে আনা হ'ত। তাই এখনও তার শেষ প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, ভারতের অনেক জায়গাতেই বিবাহের পর বর একটা চাদর দিয়ে বধূকে বেঁধে আনছে (যাকে গাঁটছড়া বাঁধা বলে)। বেঁধে আনা হচ্ছে, যেন পরাজিত পার্টির মেয়েকে বেঁধে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেদিন তাকে বন্দী করে আনা হ'ত, হাতে হাতকড়াও পরানো হ'ত। এখনও পূর্বভারতের বা বাঙলার মেয়েদের মধ্যে হাতে নোয়া পরৰার বা লোহা পরৰার প্রথা আছে। লোহাটা হ'ল কী? -না, হাতকড়া। যেন সেটা দিয়ে বধূকে বেঁধে আনা হয়েছে, অপরাধীকে ধরে আনা হয়েছে, বিজিত পার্টিকে ধরে বন্দী করে আনা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, মারধোর হ'ত, লড়াই হ'ত। মেয়েদের মাথা পর্যন্ত ফেটে যেতো, রক্ত পড়তো, বন্দিনী নারীকে এমনিভাবে নিয়ে আসতো। এখন তো আর তা হয়

না, মাথাও ফাটে না। কিন্তু যেন মাথা ফেটেছে তার প্রমাণ হিসেবে সিঁদুর লাগিয়ে দেওয়া হয়, যেন লাল রক্ত। এইভাবে আদিম জীবন থেকে সভ্যতার ক্রমঃবিকাশ হচ্ছে। নারী ছিল 'গোষ্ঠীমাতা', 'গোষ্ঠীমাতৃকা'। এক একটা পাহাড়ের একজন হেড্ থাকতেন, গোড়ার দিকে প্রধানা ছিলেন এক একজন নারী– 'গোষ্ঠীমাতৃকা'। এখনও মেঘালয়ে মাতৃগত কুলব্যবস্থা। পরবর্তীকালে সেই প্রথা পরিবর্তিত হয়ে 'গোষ্ঠীপিতা'র প্রথা প্রবর্তিত হ'ল; সেই সঙ্গে 'গোত্র' ও 'প্রবর' প্রথাও এসে গেল। আর পুরুষ হ'ল 'গোত্রাধিপতি'।

সভ্যতা এগিয়ে চলেছে সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে, সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে। মানুষ নানান উপায় খুঁজে বার করছে কিভাবে লড়াইয়ে জয়ী হওয়া যায়। তার স্নায়ুকোষ উন্নত হচ্ছে, নানান ব্যাপারে তারা মাথা ঘামাচ্ছে, কী করে আগেকার কথাগুলো আজকেও মনে রাখা যায়। ভাবছে, ছবি এঁকে অক্ষর তৈরী করছে, ছবির ভেতর দিয়ে, ছবি দেখে মনে পড়ে যাবে যে দশদিন আগে আমরা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম, ছবির ভেতর দিয়েই তা বোঝা যাবে, যাকে বলে 'pictography'। এইভাবে পিক্টোরিয়্যাল (pictorial) লিপির উদ্ভাবন হ'ল। চীন দেশে এখনও পিক্টোরিয়্যাল লিপি চলে, ছবির ভেতর দিয়ে অক্ষর।

মানুষ প্রয়োজনের তাগিদেই, লড়াইয়ের তাগিদেই এইসব আবিষ্কার করে চলেছে। এমনি করে পশু জাতকেও সে একদিন জয় করে ফেললো। তখন শুরু হয়ে গেল তাদের নিজেদের মধ্যেই সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে যারা হেরে গেল, যারা বুদ্ধিহীন, তারা ধ্বংস হয়ে গেল। যারা অল্পবুদ্ধি তারা সমাজে নিপীড়িত, অধোগতিপ্রাপ্ত, ছোটো জাত বলে গণ্য হতে লাগলো। যারা একটু বুদ্ধিমান তারা উঁচু জাত হয়ে গেল। যারা আর একটু বেশী বুদ্ধিমান তারা আরও বেশী উঁচু জাত হ'ল অর্থাৎ শুরু হয়ে গেল বুদ্ধির লড়াই।

মানুষ এগিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলা তার স্থূল জগতেও ঘটে চললো। সে শীত থেকে বাঁচবার জন্যে জামাকাপড় পরতে শুরু করলো, বস্ত্রের ব্যবহার শুরু করলো, তাড়াতাড়ি যাৰার জন্যে কী করা যায়! না, সে চাকা আবিষ্কার করলে। এই চাকা আবিষ্কার হয়েছে সভ্যতা শুরু হবার অনেক পরে! চাকা যেদিন আবিষ্কার হ'ল সেদিন সভ্যতার একটা নোতুন যুগের সূচনা হ'ল, কারণ চাকা না থাকলে দ্রুতগামী গাড়ী তৈরী করা যায় না। এই ভারতীয় সভ্যতারই একটা নবারোপিত (transplanted) সভ্যতা হচ্ছে 'মায়া সভ্যতা' (Mayan civilisation)। দক্ষিণ ভারতের পল্লবদের যুগে ভারত

থেকে এই সভ্যতা মধ্য আমেরিকায় গেছলো। তাই সেখানকার এই মায়া সভ্যতা ভারতেরই একটা নবারোপিত সভ্যতা– দু'টোই পাশাপাশি চলছিল। কিন্তু এখানকার মানুষ চাকা আবিষ্কার করলে, ওখানকার মানুষ চাকা আবিষ্কার করতে পারলো না। রেড্-ইন্ডিয়ান সিবিলাইজেশান পেছিয়ে পড়লো। ভারতে চাকার আবিষ্কার হ'ল, গোরুর গাড়ীর আবিষ্কার হ'ল। যেদিন গোরুর গাড়ীর আবিষ্কার হ'ল সেদিনটাও একটা নোতুন বিজয়ের দিন। মানুষ একটা নোতুন কিছু করেছে। সেদিন থেকে মানুষের অগ্রগতি আরও দ্রুতগতিতে হতে থাকলো। এগুলো সবই ভৌতিক জগতে। আর ওই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্যে মানুষের শরীরে আরও পরিবর্তন এলো। তার ক্রেনিয়ামটা বড় হয়ে গেল কিন্তু খুলির আকারটা ছোটো হয়ে গেল। হাতগুলোর দৈর্ঘ্য কমে গেল, শরীরের লোম বেড়ে গেল, তার পরে চোয়াল আরও একটু উঁচু হয়ে গেল। এই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাবে এই পরিবর্তনটা হ'ল, কোথাও চোয়ালটা উঁচু হ'য়ে গেল, কোথাও চোয়ালটা একটু নীচু হয়ে গেল। কোথাও গায়ের রঙটা মেটে রঙের হ'ল, কোথাও শাদা রঙ হ'ল, কোথাও লালচে রঙ হ'য়ে গেল। চিন্তাজগতে পরিবর্তনটা যেভাবে ঘটেছিলো তদনুযায়ী

তার শারীরিক পরিবর্তনও এসে গেল। মানুষ এগোচ্ছে এইভাবে। কিন্তু এই যে তার চিন্তায় আর শরীরে পরিবর্তন আসছে–এই চিন্তাটা উদ্ভুত হচ্ছে কোথায়? স্নায়ুকোষে। মানুষের মনের দু'টো কাজ–একটা কাজ হ'ল চিন্তা করা, আর একটা কাজ হ'ল মনে রাখা। চিন্তা করার দিকে যেমন এগোচ্ছে মনে রাখার দিকেও তাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে, সেলস্ অর্থাৎ স্নায়ুকোষের মধ্যেও পরিবর্তন আসছে। স্নায়ুকোষে পরিবর্তন আসছে, স্নায়ুতন্তুতে (নার্ব ফাইবারে) পরিবর্তন আসছে। আবার স্নায়ুকোষ স্নায়ুতন্ত্রতে পরিবর্তন আসছে তো চিন্তার জগতেও এসে যাচ্ছে আলোড়ন, চিন্তার জগতেও এসে যাচ্ছে বিপ্লব। মানুষ ভাৰতে শুরু করলে–আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাবো? এ ধরণের চিন্তা আর কোনো জীবের নেই, মানুষের মধ্যেই এলো কারণ তার মননের বিকাশ ঘটেছে। সে ভাবছে–

"মাগো আমার এই ভাবনা
আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম,
কোথায় যাব নাই ঠিকানা"–

এই চিন্তা আর কোনো জীব করে না। মননের অভিব্যক্তি ধীরে ধীরে তার সাহিত্যে, শিল্পে সর্বত্র অনুরণিত হতে থাকল।

মানুষ এগিয়ে চললো। মানুষ আবিষ্কার করলো স্কুল জগতে বিজ্ঞানের, তেমনি মানস জগতেও সে আবিষ্কার করলো দর্শনের, আধ্যাত্মিকতার। দর্শনের আবিষ্কার করতে গিয়ে সে কেন, কোথায়–এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াতে লাগলো। **এই খোঁজার ফলেই আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে সদাশিবের জন্ম হ'ল, তিনি মানুষের সমস্ত প্রয়াসকে, সমস্ত প্রচেষ্টাকে সংগ্রথিত করলেন, একটা বিশেষ রূপ দিলেন, একটা বিশেষ ধারায় নিবদ্ধ করে দিলেন: তার ফলে শিক্ষা, চিকিৎসা, আয়ুর্বেদ, নৃত্য ও গীত–সব কিছুই একটা নতুন রূপ পেল,** একটা জীবন খুঁজে পেল।

আরও পরে কৃষ্ণ এলেন। তিনি মানুষ জাতকে আরও বেশী সংগঠিত করলেন, সমাজকে আরও ভালোভাবে গড়ে তুললেন, মানব সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়ে গেলেন। কী, কেন খুঁজতে খুঁজতে মানুষ দর্শনের পথে আরও এগিয়ে গেলো। মহর্ষি কপিল প্রথম দর্শন তৈরী করলেন। কী ভাবে কোন জিনিসটা এসেছিলো, কী ভাবে কোন জিনিসটা হয়েছিলো তিনি দর্শনে সেগুলির ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেখানেও

তো মানুষ থেমে থাকলো না! মানুষ এগিয়ে চললো, আজও মানুষ এগিয়ে চলেছে আধ্যাত্মিকতার পথে। সেকালে, সেই সুপ্রাচীন কালে অনগ্রসর বিজ্ঞানের ও অনগ্রসর দর্শনের যুগে একটা মানুষকে আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে চলতে গেলে যতটা ৰাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হ'ত পরবর্তীকালে দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার বাধা বিপত্তিগুলো আরও অনেক কমে গেল। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রকে আগে চলবার সময় যত কষ্ট করে পাথেয় সংগ্রহ করতে হয়েছিলো আজকের মানুষকে তত কষ্ট করতে হয় না। কারণ, দর্শন ও বিজ্ঞান আজ তাকে সাহায্য করছে। আগেকার দিনে জন্ম-জন্মান্তর তপস্যা করে যে মানুষের ব্রহ্মসম্প্রাপ্তি ঘটতো আজকের মানুষের এক জীবনেই, পনেরো-বিশ বছরেই তা হয়ে যাচ্ছে। তাই মানুষ এগিয়ে চলেছে। দর্শনের সাহায্যে, বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াও আধ্যাত্মিক ভূমিতে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাও মানুষকে উন্নীত করেছে। মানুষ বুঝতে শিখেছে যে সে পরমপুরুষের সন্তান, সে পরমপুরুষের অংশ, সে পরমপুরুষের টুকরো। যদি ঠিক ভাবে পরমপুরুষের ভাবনা নেওয়া যায় তাহলে তার ব্রহ্মসম্প্রাপ্তি ঘটবে, ভগবৎ ভাবনাতেই তার সর্বব্যাধির পরিসমাপ্তি ঘটবে। সুতরাং মানুষ এগিয়ে চলছে, এগিয়ে চলবে।

যদিও পারমার্থিক বিচারে স্কুল বা মানসিক জগতে আসলে কোনো উন্নতি হয় না, হয়তো বা আপেক্ষিক বিচারে স্থূল ও মানসিক জগতে সত্যিকারের উন্নতি হয় না, তবু এই যে এগিয়ে চলবার প্রয়াস এর তো একটা মূল্য আছে! এই মূল্যটাই তাকে মানুষ হিসেবে আজ বরেণ্য করে তুলেছে, মানুষ হিসেবে তাকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে।

মানুষ আরও এগিয়ে যাবে। যারা মানুষের এই প্রগতির পথের সহায়ক, তাঁরাই হলেন সদ্বিপ্ল। আর যারা নানান ভাবে ৰাধা সৃষ্টি করে মানুষের উন্নতিকে ব্যাহত করে চলেছে তারাই দানব। তারাই দস্যু, তারাই রাক্ষস। মানুষকে এগিয়ে চলার পথে যেমন এই সদ্বিপ্রের হস্তকে আরও মজবুত করতে হবে, আরও দৃঢ় করতে হবে, তেমনি তাকে সব সময় এই রাক্ষস, দৈত্যদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে ও সীমাহীনভাবে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা থাকা চলবে না, দ্বিধার কোনো অবকাশই নেই।

মানুষের এই যে এগিয়ে চলা, এর কোনো শেষ নেই। সে এগিয়ে চলবে। অনেকে ভাবেন যে একদিন সারা বিশ্বের তাপগত মৃত্যু (thermal death) ঘনিয়ে আসৰে। গোটা বিশ্বটা সেদিন বরফে জমে যাবে, জীবের বসবাসের পক্ষে অনুপযুক্ত

হয়ে পড়বে। কথাটা আংশিকভাবে সত্য। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিকভাবে 'থার্মাল ডেথ' হবে না। একটা বিশেষ গ্রহে বা একটা বিশেষ উপগ্রহে তা হতে পারে, সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তা কখনই হবে না। সুতরাং আংশিকভাবে কোনো গ্রহে বা উপগ্রহে তাপগত মৃত্যু হবার আগেই মানুষ তার উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের সাহায্যে অন্য গ্রহে অন্য উপগ্রহে চলে যাবে। এই পৃথিবীটা যখন মনুষ্য বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে তার আগেই এখানকার উন্নতধী মানুষ, সেকালের সুদূর ভবিষ্যতের উন্নতধী মানুষ কোনো বিশেষ যানবাহনের সাহায্যে অন্য গ্রহে বা অন্য উপগ্রহে চলে যাবে। সুতরাং কৰে 'থার্মাল ডেথ' হৰে সেই ভয়ে আজ আতঙ্কিত হবারও কোনো সঙ্গত কারণ নেই। ইতোপূর্বে জনৈক সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-'এ্যাটম বোমা কি মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেবে? আপনার কী মত'? আমি বলেছিলুম, 'আমার দৃঢ় অভিমত হচ্ছে-এ্যাটম্ ৰোমের সাধ্য নেই যে মানুষকে সে ধ্বংস করে'। কারণ মানুষের এই স্নায়ুকোষ থেকেই এ্যাটম্ বোমের উদ্ভূতি। মানুষের বুদ্ধিই এ্যাটম্ বোমকে জন্ম দিয়েছে। সুতরাং এ্যাটম্ ৰোমের কী সাধ্যি মানুষকে নষ্ট করে। যে মানুষ এ্যাটম্ ৰোমের স্রষ্টা, সেই মানুষই এ্যাটম বোমের

প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবে। সুতরাং মানুষের অহেতুক চিন্তিত বা আতঙ্কিত হৰার কোন কারণ নেই।

(অভিমত–৪র্থ খণ্ড)

[৩রা মার্চ, ১৯৭৯, শিলিগুড়ি]

ইতিহাস কেমন হওয়া উচিত

কাল ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলেছিলুম। বলেছিলুম, কৰে কোন্ রাজা এসেছিলো, কৰে কোন্ রাজা কোন্ দেশ আক্রমণ করেছিলো, কৰে কোন্ রাজা তার প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেছিলো, কৰে কোন্ রাজা মারা গেলো–আজকালকার ইতিহাসে সাধারণতঃ এই সব কথাই 'লেখা থাকে। সাধারণ মানুষের এসব জেনে লাভটা কী? এইজন্যে এই ধরণের ইতিহাস পড়তে তাদের মোটেই ভালো লাগে না। ইতিহাস হৰে সমগ্র মানব জীবনের ইতিহাস।

সূচীপত্র

ইতিহাস শব্দের স্বীকৃত সংজ্ঞা হ'ল- 'ইতি হসতি ইত্যর্থে ইতিহাসঃ" অর্থাৎ সামূহিক জীবনের একটা উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি যা পাঠ করে ভবিষ্যতের মানুষ বিশেষ প্রেরণা পাবে। 'ইতি হসতি'-অর্থ হ'ল গৌরবোজ্জ্বল মানব মহিমার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। মানুষের জীবনকে একক ফুলের সঙ্গে তুলনা করতে পারি না, বরং ফুল বাগিচার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একটা ফুল বাগানে কত ভিন্ন ভিন্ন ফুল! গন্ধে, বর্ণে কত বৈচিত্র্য! আর ভিন্ন ভিন্ন ফুলকে নিয়েই একটা বাগান। ইতিহাসও তেমনি। সেখানে দেশগত, কালগত, পাত্রগত কত বৈচিত্র্য। আর এই বৈচিত্র্যই হ'ল ইতিহাসের সৌন্দর্য। এই বৈশিষ্ট্যকে আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না, জোর করে বাইরে থেকে কারুর ওপর আমরা কিছু চাপিয়েও দিতে পারি না। নিজের নিজের শক্তিতে প্রত্যেকে এগিয়ে চলবে ও সামূহিক জীবনকে চরিতার্থ করবে-এটাই হ'ল ইতিহাসের মূল মন্ত্র।

ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমাদের এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে মানুষের জীবনে বহুতর দিক রয়েছে' ও ইতিহাসে যেন সব দিকেরই যথোপযুক্ত নির্দেশনা থাকে। কোনো বিশেষ যুগে মানুষের শিক্ষা-ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক মান, ভাব-ভাবনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, নারী জাতির অবস্থা, সামাজিক তথা-

অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা, সমাজে দুর্বল অনুন্নত সম্প্রদায়ের অবস্থা–ইতিহাসে এগুলোই আলোচিত হওয়া দরকার। ইতিহাস লিখতে গিয়ে যদি এগুলোর কোন একটা বাদ পড়ে যায় তাহলে সেটা যথার্থ ইতিহাস হবে না।

ইতিহাসের আর একটা বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা হ'ল–

"ধর্মার্থকামমোক্ষার্থং নীতিবাক্য–সমন্বিতম্
পুরাবৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসঃ প্রচক্ষতে।"

যে শাস্ত্র মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা বাড়ায়, তার বৌদ্ধিক প্রাথর্য আনে, যা সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি জনকল্যাণকর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ঘটায় ও যা মানুষকে এক সুদৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে তাই ইতিহাস পদবাচ্য।

এখন দেখা যাক ইতিহাস কীভাবে লেখা হয় বা লেখানো হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এক বিশেষ সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থে ইতিহাস লেখানো হয়। যুগ বিশেষের গৌরবকে প্রতিষ্ঠার জন্যে ইতিহাসের পঠন–পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, ক্ষত্রিয় যুগের ক্ষত্রিয়ের বীরত্বের কাহিনী, তাদের কলা– কৌশল

নিয়েই সে যুগের ইতিহাস রচিত হয়। ইতিহাসের পাতাগুলো কেবল ক্ষত্রিয়দের শৌর্য-বীর্যের গুণগানেই ভরা। তেমনি বিপ্র যুগের ইতিহাসে কেবল বিপদের মহিমারই বর্ণনা আছে। আবার বৈশ্য যুগেও শুধু বৈশ্যর মহিমা বর্ণনায়, বৈশ্যের গালগল্পে ইতিহাসের পাতা ভরাট থাকে। এই ধরণের একপেশে ইতিহাস পড়তে পাঠকের মোটেই আগ্রহ থাকে না, ধৈর্য থাকে না। অধিকন্তু এই ধরণের ইতিবৃত্ত পাঠ করলে মনের মধ্যে এক ধরণের ভাবজড়তা (dogma) বাসা বাঁধে ও ফলস্বরূপ মনের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশও রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

ইতিহাসের পঠন-পাঠন অবশ্যই হওয়া চাই। কিন্তু সেই ইতিহাস হবে সত্যিকারের ইতিহাস, কোন বিশেষ শ্রেণীর, কেন বিশেষ রাজা বা মন্ত্রীর ইতিহাস নয়। আর এই যে শ্রেণী বিশেষের ইতিহাস, এই ইতিহাস বিশেষ বিশেষ দেশের শাসক গোষ্ঠীর নির্দেশেই লিখিত। এই ধরণের একদেশদর্শী ইতিহাস পড়াটা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। বরং এই ধরণের ইতিহাস না পড়াই ভালো।

এই যুগের মানুষ বুদ্ধিদৃপ্ত। তোমাদের বুদ্ধি অন্য কারুর চেয়ে কম নয়। তাই তোমরা সম্মিলিত প্রয়াসের দ্বারা মানব জাতির নোতুন ইতিহাস রচনা করো। বিভিন্ন যুগে বিবর্তনের

ভেতর দিয়ে মানব সমাজ কীভাবে এগিয়ে চলেছিলো, চলার পথে মানুষ জাতিকে কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো আর কী ভাবেই ৰা তারা ওই সমস্ত ৰাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আপন লক্ষ্যের দিকে অবিচলিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিলো বা আজও তারা কীভাবে নানান সমস্যার সমাধান করতে করতে এগিয়ে চলেছে–এইসব বিষয় যেন পরিষ্কার ভাষায় তোমাদের আগামী দিনের রচিত ইতিহাসে স্থান পায়।

(সকালবেলা, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৮০, পটনা)

নোতুন করে ইতিহাস লেখা হোক

উদ্ভিদ জগৎ, জীব জগৎ ও মানব জগৎ–তিনটেতেই কতকগুলো সাধারণ গুণ রয়েছে, সাধারণ ধর্ম রয়েছে। এই

সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম অনুযায়ী তাদের আপন আপন অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাহলেও উদ্ভিদ জগৎ আর জীব জগৎ সম্পূর্ণ এক নয়। জীব জগতের জন্যে কতকগুলো বিশেষ কর্তব্য নির্দিষ্ট রয়েছে, কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যেও তারা বৈশিষ্ট্যবান। এই কারণে উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। জীব জগতের যদি ওই বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য না থাকতো তা হলে তা'দিকে আমরা জীব না ৰলে উদ্ভিদ বলতাম। উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর মধ্যে যে সমস্ত সাধারণ গুণ বা ধর্ম বর্তমান, মানুষের মধ্যেও সেই গুণ বা ধর্ম বর্তমান। মানুষের মধ্যে এর অতিরিক্ত গুণও রয়েছে। যদি এই গুণগুলো না থাকতো তাহলে মানুষকে গাছ-পালা, পশু-পক্ষী থেকে বিশেষিত করা যেতো না। মানুষের মধ্যে এই যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাকে উন্মেষিত তথা পুষ্ট করা প্রত্যেক মানুষেরই অবশ্য করণীয়। এই সমস্ত গুণের পরিপুষ্টির ওপরেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করছে। আবার এই বৈশিষ্ট্যের অভাব ঘটলে মানুষকে মানুষ না ৰলে ৰলৰো মনুষ্যদেহধারী অন্য কিছু।

কোনো মানুষই অধোগতি চায় ন। জীবনে উন্নত হওয়া, ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে চলা মানুষের পক্ষে

স্বাভাবিক। সমাজে যাদের শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দেওয়া হয় তাদের কর্তব্য হ'ল সমাজের আর পাঁচ জন লোককে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলা। কেউ এগিয়ে গেলো আবার কেউ অনেকটা পেছিয়ে পড়লো–এমনটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এমনটা হলে যে মানুষটা এগিয়ে পড়লো তার পক্ষে এটা মোটেই গৌরবজনক নয়।

আমরা ইতিহাস পড়াশুনা করি। অতীতে ইতিহাস রচনা হয়েছে, ভবিষ্যতেও রচনা হবে। তবে ইতিহাস রচনায় এক আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার। আজ পর্যন্ত যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তা হ'ল রাজা মহারাজাদের ইতিহাস। কিন্তু আজ ইতিহাসের খোল নচে বদলানো দরকার। নোতুন করে ইতিহাস রচনা করতে হবে। আর তা হৰে মানবতার স্বার্থে, মানব জাতির হিতার্থে, সার্বজনীন কল্যাণের জন্যে। তা' না হয়ে কেবল কে কখন রাজা হ'ল, কে কবে কোন্ দেশটা আক্রমণ করলো বা কে কবে মন্ত্রী হ'ল–এসব জেনে জনসাধারণের বিন্দুমাত্র লাভ হয় না। এতে সাধারণ মানুষের ভালোও লাগে না। ইতিহাস পাঠ করে যদি মানুষকে উপকার পেতে হয় তাহলে ইতিহাসে জনসাধারণের সুখ–দুঃখ, আশা–আকাঙ্ক্ষার কথা লিখতে হবে। পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে মানব গোষ্ঠী কোন্

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কতদূর পর্যন্ত প্রগতি বা উন্নতি ঘটিয়েছিলো–এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসেরই ইতিহাসে স্থান পাওয়া উচিত। প্রগতির পথে মানুষকে কী ধরণের বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, কীভাবে তারা তাদের উন্নতি ঘটিয়েছিলো, কোন্ কোন্ দিক থেকে বাধা এসেছিলো–এইসব দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচিত হওয়া দরকার। একমাত্র এই ধরণের ইতিহাসকে আমি মানুষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস বলবো। মানুষের স্বভাবধর্ম, তার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকে সামনে রেখে মানব জাতির ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত। কেবল এভাবেই আমরা জানতে পারবো যে মানুষ কতখানি তার অন্তর্নিহিত সদ্গুণের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছিলো, আর আজকের মানুষই বা কতদূর এগিয়েছে। লাখ লাখ লোকেদের মধ্যে দুই এক জন মানুষ যে বড় কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা হাজার হাজার মানুষকে প্রেরণা যোগায় ঠিকই কিন্তু মানুষ তাকে আপনার বলে গ্রহণ করবে না। মানুষের যে ধর্ম অর্থাৎ বিশিষ্ট মানবধর্ম, সেই ধর্মের পরিপুষ্টির জন্যে আজ থেকে আমাদের সবাইকে বিশেষ ভাবে যত্নশীল হতে হবে। হতে পারে, এই ধরণের ইতিহাস রচনায় লোক অসন্তুষ্ট হবে কিন্তু তা থেকে

জনসাধারণ শুধু যে প্রেরণা পাৰেন তা নয় সাথে সাথে তাদের এগিয়ে চলার শক্তি বেড়ে যাবে।

কেউ কেউ হয়তো ৰলৰে যে সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে কি কিছু সন্ন্যাসী থাকবে, কিছু গৃহী থাকবে? এখন প্রশ্ন- এদের উভয়ের ধর্ম কি সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক? এই উভয় সম্প্রদায়ের জন্যে কি ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস হৰে? আমি তো অবশ্যই না বলবো। কারণ মানবধর্ম তো একটাই। বিস্তার, রস, সেবা ও মোক্ষ-এই হ'ল চতুষ্পাদ ভাগবত ধর্ম। এই ভাগবত ধর্মের পালন গৃহী

ও সন্ন্যাসী উভয়ের পক্ষে সমান ভাবে প্রযোজ্য। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে গৃহীর রয়েছে দু'টো পরিবার আর সন্ন্যাসীর একটাই। গৃহীর দু'টো পরিবার-একটা হ'ল তার আপনার ছোট্ট পরিবার যেখানে রয়েছে মা, ৰাৰা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টা হ'ল বৃহৎ মানব পরিবার বা সারা বিশ্বটা। গৃহীকে এই উভয় পরিবারের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। তাকে যেমন তার ছোট্ট পরিবারটাকে দেখাশোনা করতে হয় তেমনি বৃহৎ মানব পরিবারকেও দেখা শোনা করার দায়িত্ব নিতে হয়। অবশ্য শেষোক্ত কাজটা গৃহীরা সন্ন্যাসীর দ্বারা করিয়ে নেবেন।

সন্ন্যাসীর নিজস্ব কোনো পরিবার নেই। গোটা বিশ্ব সংসারই হ'ল সন্ন্যাসীর একমাত্র পরিবার। সেই বৃহৎ পরিবারের দেখা শোণার ব্যাপারে সন্ন্যাসীরাও গৃহস্থের সাহায্য নেৰেন। কাজেই মানবধর্ম গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়ের জন্যে একই। আমরা যখন মানব সমাজে যথার্থ মানবিক অগ্রগতির ইতিহাস লিখৰো তাতে গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই ভূমিকা অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকৰে। সেই ধরণের ইতিহাস সৃষ্টির দ্বারাই মানুষ একদিন, কেবল এই পৃথিবীতে নয়, সমগ্র বিশ্বে সর্বত্র পরমাত্মার সামনে এটা প্রমাণিত করবে যে তিনি মানুষ সৃষ্টি করে ঠিক কাজই করেছিলেন।

জড়তার মুক্তি

গত পরশু সন্ধ্যায় রেনেসাঁ ক্লাবের সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল "বুদ্ধির মুক্তি”। কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে– মুক্তি তো মানুষের জন্যে প্রয়োজন। বুদ্ধির মুক্তি আবার কী

রকম কথা! বুদ্ধি জিনিসটা হ'ল অমূর্ত বা ভাববাচক। যা অমূর্ত, যা ভাববাচক তার আবার মুক্তি কী! এই প্রসঙ্গে আমার অভিমত হ'ল–হ্যাঁ, বুদ্ধিরও মুক্তির প্রয়োজন আছে বৈকি। এই জগতে যা কিছু রয়েছে–জড়, ভাব, চেতন, সকলেরই মুক্তি চাই। মুক্তি না ঘটলে বস্তু বা ব্যষ্টির স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটে না অর্থাৎ যার মধ্যে যে গুণ রয়েছে, যে সামর্থ্য রয়েছে সেই গুণ বা সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ, পূর্ণ অভিপ্রকাশ যদি দেখতে চাই তাহলে সেই ব্যষ্টি বা বস্তুর মুক্তি অপরিহার্য।

মানুষ জড়তার ৰন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায়। এখন এই মুক্তি জিনিসটা কেমন ধারা! মানুষের এই যে জড় শরীরটা সেটা থেকে তো মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। শরীর থেকে মুক্তি মানেই মৃত্যু। কিন্তু জড়তার যে বন্ধন তা' থেকে মুক্তি লাভের জন্যে প্রয়াস অবশ্যই করতে হবে। জড় জগতে যে অর্থনৈতিক ৰন্ধন, রাজনৈতিক দাসত্ব, নানান ধরণের সামাজিক পরাধীনতা–এসব থেকে মুক্তিলাভের যে প্রয়াস সেটাই হ'ল জড় জগতের মুক্তি। এই ধরণের জাগতিক ৰন্ধনমুক্তির জন্যে মানুষকে চেষ্টাশীল হতে হবে। কোন দেশ যদি অপর দেশের কাছে পরাধীন থাকে তো সেই পরাধীনতার দাসত্ব–শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হৰার জন্যে সংগ্রাম অবশ্যই করতে হৰে। তাই এই জাগতিক

ৰন্ধন-মুক্তি মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমরা দেখেছি, যেখানে জাগতিক পরাধীনতা-সেটা অর্থনৈতিক হোক, রাজনৈতিক হোক, সামাজিক হোক-সেখানে মানুষের অন্তর্নিহিত গুণগুলো বা তার প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সুদূরপরাহত হয়। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুক্তি চাই, জড়ের ৰন্ধন থেকে মুক্তি তো চাই-ই।

জড়ের চেয়ে সূক্ষ্ম হ'ল মন। মানসিক দাসত্ব থেকে মনকে মুক্ত করতে হবে। আমরা দেখতে পাই, মানুষের সমাজে কত রকম মানসিক চাপ, কত রকম শোষণ চলেছে। এই শোষণ, এই অত্যাচার, এই মানসিক ৰন্ধন থেকে মুক্তির জন্যে মানুষকে অবশ্যই প্রয়াসশীল হতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুক্তিলাভের এষণা মানুষ মাত্রেরই এক স্বাভাবিক ধর্ম। মানব মনের যা সার অংশ তার নাম বুদ্ধি। বোধিকে ঠিক মনের সারাংশ বলতে পারি না। বাস্তবে বোধি মনের চেয়েও সূক্ষ্ম ও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বোধিকে বলতে পারি একাদশ সত্তা অথবা ষষ্ঠেন্দ্রিয়। বৌদ্ধিক জগতে এই যে শুদ্ধাশুদ্ধ, নিত্যানিত্য, শুচ্যশুচি বিচার-এর একটা মাপকাঠি রয়েছে। এই যে মাপকাঠি, এটাকে অবশ্যই নিষ্কলুষ থাকা দরকার। জড় জগতে বুদ্ধির ওপর নানান ধরণের শোষণ ও অত্যাচারের

বন্ধনহেতু এক রুদ্ধ বেদনায় মানুষের অন্তরাত্মা কাঁদতে থাকে। ঠিক তেমনি মানসিক জগতে চিন্তা করার যে শক্তি মানুষের থাকা উচিত সেই শক্তিকেও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আবার ঠিক তেমনি ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রে মানুষ যেখানে পারমার্থিক তথা প্রজ্ঞার বিকাশের জন্যে চিন্তা-ভাবনা করতে চেষ্টা করে সেখানে ভাবজড়তা (dogma) এসে ৰাধা সৃষ্টি করে।

এখন এই ভাবজড়তা জিনিসটা কী?-না, সেটা হ'ল পূর্ব-নির্ধারিত ভাববিশেষ যার বাইরে মানুষকে যেতে নিষেধ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে মানুষের বৃদ্ধি পুরোপুরি কাজ করতে পারে না। কেউ কেউ বলে, ঠিক আছে, পুরো উপযোগ না পেলেও শতকরা দশ-বিশ ভাগ তো পেতে পার। কিন্তু আমার অভিমত হ'ল যে ভাবজড়তার ফলে মানব-মনীষার দশ-বিশ ভাগ অংশও ঠিকমত কাজে আসে না। যে অল্প একটু মানুষের কাজে আসে সেটা ঠিক খাঁটি জিনিস নয়।

মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে তার মনন শক্তি, তার বুদ্ধি। এই বুদ্ধিকে আমি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারৰ না-এর চেয়ে বেদনাদায়ক পরিস্থিতি আর কী হতে পারে। তাই মনের মুক্তি চাই ও তারও আগে বুদ্ধির মুক্তি চাই। ভাবজড়তার ব্যাপারটা হ'ল এই রকম: বুদ্ধি একটা বিশেষ রাস্তা দিয়ে

চলতে চাইছে এমন সময় ভাবজড়তা চারদিকে এসে যেন বলছে–না, না, তুমি ওধারে যেতে পারবে না। ভাবজড়তা ৰলে না, ওধারে এক পা–ও বাড়িয়ো না। যদি যাও তো তোমাকে অনন্তকাল নরকাগ্নিতে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে, অনন্তকাল তোমার নরক বাস হবে। বুদ্ধি যখন জাগতিক সম্পদের পুরোপুরি

উপযোগ নিতে চায়, তখন ভাবজড়তা এগিয়ে এসে যেন বলে–না, এটা করা চলবে না। মানুষের পক্ষে এটা ক্ষতিকর, অপবিত্র। এতে মনুষ্যত্ব খর্ব হবে।

মানুষের বুদ্ধি যখন পূর্ণ উদ্যমে মানসভূমিতে সাহসিকতাপূর্ণ কোন কাজ করতে তৎপর হয় তখন এই ভাবজড়তা যেন এসে বলে–না, এমনটা করা চলবে না, এতে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে এই ভাবজড়তা মানুষের মনের ওপর, বুদ্ধির ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুদ্ধিকে বন্ধনমুক্ত করতে না পারছি ততক্ষণ বুদ্ধিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছি না! তাই মানবতার সেবার জন্যে এই বুদ্ধিকে সর্বপ্রকার ৰন্ধন থেকে, ভাবজড়তা থেকে, নানাবিধ অশুভ প্রভাৰ থেকে মুক্ত করতে হবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন

মানুষ জাতির ভবিষ্যৎ স্বর্ণোজ্জ্বল হতে পারে না। যদি আজকের মানুষের সামনে স্বর্ণিম সুপ্রভাত আনতে হয় তাহলে অসীম সাহসে ভর করে এই ভাবজড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বুদ্ধির সর্বাত্মক ৰন্ধন-মুক্তি ঘটাতে হবে। আর সেইজন্যেই আজ পৃথিবীর সকল প্রান্তেই আমাদের সমস্ত কণ্ঠে কেবল একটি উদ্‌ঘোষই যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়- "ভাবজড়তা আমরা মানি না, মানব না"।

(অভিমত, ৪/১১১; সন্ধ্যাবেলা, পটনা, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৮০)

সম-সমাজ তত্ত্ব

চলা জগতের ধর্ম। চলে চলেছে বলেই এই পৃথিবীর নাম জগৎ। 'গম' ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয় করে 'জগৎ' শব্দ নিষ্পন্ন যার মানে হ'ল-চলা যার স্বভাব। ব্যষ্টিগত জীবনে যেমন চলতে হয় সমষ্টিগত তথা সামূহিক জীবনেও তেমনি চলতে হয়। কিন্তু এই যে চলা, এই চলার জন্যে তিনটে জিনিসের প্রয়োজন আছে। একটা হচ্ছে-চলার জন্যে একটা সম্প্রেষণ,

পেছন থেকে একটা ধাক্কা; যখন চলাটা বন্ধ হয় তখন ধাক্কা দিয়ে বলতে হয় চল্, চলতে হৰে। দ্বিতীয়তঃ নিজে যে চলবে তার চলবার সামর্থ্য থাকা চাই অর্থাৎ চলার উপযুক্ত রসদ তার থাকা চাই। নইলে সে চলৰে কী করে? আর তৃতীয় হচ্ছে: চলছে একটা লক্ষ্যের দিকে। এই তিনটে জিনিস চাই।

প্রাচীনকালে মানুষ যূথৰদ্ধ ভাবে তথা একক ভাবে যে চলে এসেছে সে চলার আজও বিরাম নেই। সে চলার পথে কোনো যতিচিহ্ন নেই বা থাকৰে না। এটা অপরিচ্ছেদ–কোনো কমা, সেমি–কোলন, কোলন, পূর্ণচ্ছেদ এতে নেই। মানুষ সাধারণতঃ চলে কিসের প্রেষণায়, কিসের শক্তিতে, আর কিসের দিকে লক্ষ্য রেখে? দেখা গেছে মানুষ চলে দু'টো ভাবে। এই দু'টো ভাবের আমি নাম দিয়েছি সম্প্রতি লিখিত "সভ্যতার আদি বিন্দু–রাঢ়" পুস্তকে। একটা হচ্ছে আত্মসুখ তত্ত্ব, আর একটা হচ্ছে সম–সমাজ তত্ত্ব।

আত্মসুখ তত্ত্ব হচ্ছে–যা কিছুই করছি সুখ পাবার প্রেষণায়, সুখ পাবার পদবিক্ষেপে আর পরে সুখে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে। এই আত্মসুখ তত্ত্ব জিনিসটা ভাবজড়তার (dogma) ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক যতগুলো তত্ত্বের দ্বারা মানুষ সাধারণতঃ পরিচালিত হয়

সবগুলো ভাবজড়তার দ্বারা চলে চলেছে। আর এই ভাবজড়তা বা ডগমা জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে আত্মসুখ তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আত্মসুখের লোভেই মানুষ ভাবজড়তার বশ্যতা স্বীকার করে। অনেক মানুষ, যারা লেখা পড়া শিখেছে তারা কী জানে না যে ভাবজড়তার বশ্যতা স্বীকার করছি, বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি, কাজটা ভাল করছি না! সৰ বোঝে, সব

জানে, সব জ্ঞানপাপী, বুঝেসুঝেও ওরা ডগমাকে মানে। কেন? -না, তারা দেখে, এই যে ভাবজড়তা এটা আত্মসুখ তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এটা ভালই হোক আর মন্দই হোক– অন্যের ভালই হোক আর মন্দই হোক আমি তো কিছুটা সুখ পেলুম। এই মনোভাবের দ্বারা প্রেষিত হয়ে তারা ভাবজড়তার দাস হয়ে পড়ে।

এই সভ্য জগতে লেখাপড়া জানা মানুষও ডগমাকে 'ডগমা' বলে জেনেও মেনে থাকে। কেবল তার মনের কোণে একটা আশা থাকে যে ডগমাকে মানলে লৌকিক জগতে একটা জাগতিক সুখ পাবো। আর তাই এই সভ্যজগতেও যেখানে জ্ঞানের বিস্তার কিছু কম হয়নি সেখানে দেখছি মানুষ অন্ধের মত ভাবজড়তার বশীভূত হয়ে চলেছে। এই ভাবজড়তার

মায়াজাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে, এই ভাবজড়তার লৌহ কপাট ভেঙ্গে খানখান্ করে দিতে হবে।

তারপর আসছে সম-সমাজ তত্ত্ব। সবাইকার লক্ষ্য পরমপুরুষ। আর পরমপুরুষের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি ব্যষ্টিগতভাবে ও সামূহিকভাবে। কিন্তু সামূহিক জীবনে যে সমস্ত অসাম্য-বৈষম্য রয়েছে-সেই বৈষম্যগুলোকে যদি আমি বজায় রেখে চলতে চাই তবে চলতে পারবো না। বৈষম্যকে একদিকে দূর করৰার চেষ্টা করবো, আর সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলৰো। বৈষম্যকে দূর করতে পারলে সবাইকার অগ্রগতি দ্রুততর হবে-এই ভাবনায় প্রেষিত হয়ে যদি পরমপুরুষের দিকে চলি তাতে আত্মসুখ নাও থাকতে পারে কিন্তু প্রশান্তি আছে, পরমপুরুষের প্রসাদ প্রাপ্তির নির্মেঘ আনন্দ আছে। তাই সমাজের মানুষজাতের সকলকে সঙ্গে নিয়ে এই রকমের একটা তারতম্য বিহীন সমাজ গড়ে পরমতত্ত্বের দিকে এগিয়ে চলবার প্রয়াস-এইটারই নাম সম-সমাজ তত্ত্ব।

তাই আমার বক্তব্য এই যে, যে সকল বুজরুকি এই সম-সমাজতত্ত্বের পরিপন্থী তাকে বর্জন করবো; যে জিনিস এই সম-সমাজতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে মানুষকে সাহায্য করবে তাকে

সাদরে বরণ করে নেবো। আর যে তত্ত্ব এর প্রতিকূল তাকে সরিয়ে দেবো। তাকে পথের কাঁটা জ্ঞানে সরিয়ে দেবো। আর সরাবার ব্যাপারে কোনো ভাবজড়তাকে বা কোনো মমতাকে অপৌরুষেয়ৰোধে আসকারা দেবো না। এইটাই হবে আজকের মানুষের যথার্থ কাজ। এই কাজ করবার জন্যে সব মানুষকে হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। অতীতে কে কেমন ছিল তা ভাৰলে চলবে না। সে শাদা কী কালো তা ভাৰলে চলবে না। কেবল এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের পরম তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতেই হৰে ও সম-সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে নোতুন একটা মানব সমাজ গড়েই আমাদের তা করতে হবে। সম-সমাজ তত্ত্বের আইডিয়াটা যখন পেয়েছি, যখন এই আইডিয়াকে বাস্তবায়িত করৰার শারীরিক শক্তি সামর্থ্য, বুদ্ধি ও আত্মিক প্রজ্ঞা পেয়েছি, কেন এই সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বার্থসার্থক আইডিয়ার বলিষ্ঠ রূপকার হিসেবে নিজের ভূমিকাকে সার্থক করে তুলবো না! কেন পৃথিবীতে এই আসাকে, থাকাকে, নিঃশ্বাসের প্রতিটি বিন্দুকে, অস্তিত্বের প্রতিটি স্পন্দনকে জড়-শক্তিতে, মানসিকতায়, ৰোধিতে ধন্য করে- তুলবো না!

(আনন্দনগর, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮১)

সূচীপত্র

শোষণ ও অসংস্কৃতি

গোড়াতে একটা কথা বলে রাখি, এই পৃথিবীতে অনেক থিয়োরী এসেছে। অনেক থিয়োরী কিছুদিন থেকেছে... তারপর আস্তে আস্তে সরে গেছে। আবার অনেক থিয়োরী ধূমকেতুর মত অল্পক্ষণের জন্যে তার জৌলুস দেখিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। থিয়োরীর অস্তিত্বটা বড় কথা নয়; থিয়োরীর কাছে বড় কথা হ'ল সে মানুষের কতটা কল্যাণ করতে পেরেছে। সে 'সর্বজনহিতায়', 'সর্বজনসুখায়', 'জগৎকল্যাণার্থম্' কাজ করে গেছে কি না, অন্যথায় তার আসাটাই অপ্রয়োজনীয় ছিল। তাদের সম্বন্ধে কিছু বলাটাই অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এই যে কল্যাণের বীজ–এই বীজটা তখনই থাকতে পারে কোন থিয়োরীতে যদি তার আপাতঃ ভূমিটা হয় সম–সমাজতান্ত্রিক। আর সে সুদীর্ঘকাল–অনন্তকালও থাকতে পারে যদি সে অনন্তকালের পরিপ্রেক্ষিতে সবাইকার কল্যাণের ভাবনা সবসময় পোষণ করে থেকে থাকে। এইটাই হ'ল বড় কথা।

সূচীপত্র

আমি এর আগে কয়েকবারই বলেছি, এখনও বলছি যে, মানুষ যেমন অন্তর্জগতের দিকে চলে তেমনি বহির্জগতেও তার সামঞ্জস্য বজায় রেখে ইকুয়িলিব্রিয়াম (অস্তিত্বগত সন্তুলন) তথা ইকুয়িপয়েজ (ভাবগত সন্তুলন) বজায় রেখে তাকে চলতে হয়। যদি কেউ বলে দেন "ব্রহ্ম সত্যম্ জগন্মিথ্যা", তাহলে মিথ্যার জগতে ৰসে তার কাজ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সে নিজেকে ঠকাচ্ছে। এটা কপটতা বা শঠতার (hypocrisy) লক্ষণ। সৎ মানুষ জীবনের কোনো ভূমিতেই কপট (hypocrite) হবে না, কোনো অবস্থাতেই হৰে না; কোনো অবস্থায় সে কোনো রকম অনুচিত তত্ত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া (pact) করবে না। এইটাই নিয়ম...এইটাই 'উচিত। ঔচিত্য এই কথাই ৰলে। সুতরাং তোমরা যারা খাঁটি মানুষ হতে চাও, অন্তর্জগতে যেমন সাধনা করবে–ঈশ্বর সম্প্রাপ্তির প্রয়াস অনলসভাবে চালিয়ে যাবে–তেমনি বহির্জগতেও তোমরা দেখৰে যে জগতের মানুষের মনে দানা বাঁধতে পারে এমন কোনো অযৌক্তিক, অপ্রিয় অথবা ক্ষতিকর থিয়োরী পৃথিবীতে প্রচারিত হচ্ছে কি না, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমি সেই জন্যেই বলেছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের মুখর (vocal) হতে হবে। অন্যথায় এই কাজ হবে না।

মানুষের বাইরের জগতে তার রেলিজন, তার কালচার, তার সামাজিক জীবন, তার রাজনৈতিক জীবন, তার অর্থনৈতিক জীবন–এগুলো রয়েছে। কে এগুলোকে অস্বীকার করবে? যে অস্বীকার করে সে শঠতা করছে...সে সত্যের অপলাপ করছে। সেরকম মানুষ কোনো কালে নিজের কল্যাণ, জগতের কল্যাণ করতে পারে না। সে মানুষ সব সময় দ্বৈত রোগে (dualistic ailment) ভুগবে। অর্থাৎ তার বাইরেরটা একরকম, ভেতরটা আরেক রকম। দু'রকম হবার ফলে দু'য়ের যে সংঘর্ষ (duality within a single personality) এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাধির সূচনা করবে, ও শেষ পর্যন্ত সেই ব্যাধি তাকে শেষ করে দেবে। এই যে সম–সমাজতন্ত্র বা এই যে নিও–হিউম্যানিষ্টিক আইডিয়া এটা মানুষকে এই দ্বৈত রোগ থেকে মুক্তি দেবে ও এই দ্বৈত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ায় সে নিজের কল্যাণ করতে পারবে–যতটুকু তার সামর্থ্য তদানুযায়ী সে অন্যের কল্যাণও করতে পারবে, কেননা প্রত্যেক মানুষের কাছেই সামর্থ্য কিছুটা থাকে।

এখন হয় কি, সামাজিক ভাবপ্রবণতা, গোষ্ঠী–ভাবপ্রবণতা–তারও রকমফের আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাই। যেমন, অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে যে গোষ্ঠী করে রেখেছে সেই যে ছোট

গোষ্ঠী–তাকে আমরা বলি ব্যষ্টিগত পরিবার। আবার তার চেয়েও বড় গোষ্ঠী আছে–কাষ্ট, কম্যুনিটি, ট্রাইব, ন্যাশন্যালিটি আর এই গোষ্ঠীগুলোর পেছনে নিহিত আছে একই মানসিক দুর্বলতা তথা একই মানসিক ব্যাধি। এই ব্যাধির ফলেই মানুষ নিজেকে এক একটা গণ্ডীর মধ্যে আটকে দেয় ও এই আটকানোর ফলে সে এক ধরণের কপ্লেক্স–এ ভুগতে থাকে। কখনো কখনো সেই সমকপ্লেক্সে যারা ভুগছে সেই রকমের লোকেরা তারিফ করে, বাহবা দেয়, বলে– "বাঃ বাঃ! কী সুন্দর বলেছেন–কী সুন্দর কাজ করছেন লোকটি"। কিন্তু আসলে এই তারিফটা আসে সমান কমপ্লেক্স–এ যারা ভুগছে, সমান সাইকিক কপ্লেক্স–এ যারা ভুগছে তাদের পক্ষ থেকে। চোরের দলে একটা চোর বলে–"ওঃ অমুক চোরের হাত–সাফাই মারভেলাস, আমায় বেশ বোকা বানিয়ে দিলে মাইরী"। প্রশংসা করছে কারণ ওই একটা গণ্ডী। কিন্তু যে অ–চোর সে সেটা সমর্থন করবে না। এই একটা জিনিস। তা স্পষ্ট কথা বলতে গেলে এই হয় যে যার গণ্ডীটা একটুখানি বড় সে একটুখানি ছোট গণ্ডীকে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করে–নিন্দা করে। যে মানুষটা ফ্যামিলিটুকু নিয়েই বসে আছে, আর কোনো কাজ করে না, সে মানুষটা অফিস করে আর গুটি গুটি করে বাড়ী

এসে কেবল খবরের কাগজটার পাতা ওল্টায়। যে মানুষটা একটা কাষ্ট নিয়ে একটা গোষ্ঠী করেছে–'সর্বভারতীয় অমুক সম্মেলন', তার যারা উদ্যোক্তা–তারা কী করবে? ওই ফ্যামিলিটার নিন্দা করবে–বলবে– "ও তো কেবল ফ্যামিলিটা নিয়েই আছে।" আবার যারা একটা কম্যুনিটি নিয়ে, ধরো "অখিল ভারত অমুক"...বা আর একটু বড় কম্যুনিটি 'সম্প্রদায়', তারা বলে– 'দূর, জাতপাত নিয়ে রয়েছে–জাতপাত নিয়ে থাকলেই চলবে?' আবার যাদের মনটা আরও বড় তারা বলৰে 'দূর, এ 'সমস্ত কাষ্ট, কম্যুনিটিও তো ন্যাশন্যালিজম–এর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ৰাংলায় যাকে ৰলে জাতীয়তা, তার বিরুদ্ধে। ওই কাষ্ট কম্যুনিটি নিয়ে মাথা ঘামালে আমাদের ন্যাশান্যালিটির বুনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়বে–ওরা রাষ্ট্রের শত্রু। সুতরাং ওরা আমাদের সমাজের ক্ষতি করছে, ওরা সম্প্রদায়বাদ প্রচার করছে, এই করছে, তাই করছে।" তারা ভুলে যাচ্ছে যে তারাও ওই একই রোগে ভুগছে তবে গণ্ডীটা আর একটু বড়। অথবা তারা এই কথাটা মনেও রেখেছে যে তারাও একই রোগের রোগী, কেবল স্বার্থে অন্ধ হয়েই এই ধরণের উক্তি করে চলেছে। এই রকমভাবে যত বড়ই গণ্ডী হোক না কেন–যদি গণ্ডীভুক্ত হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সে সোসিও–সেন্টিমেন্ট–এর

আওতার মধ্যে এসে যায়। আর যেখানে গণ্ডীর ৰন্ধন নেই সেটাই সোসিও-সেন্টিমেন্টের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি সেগুলোকে বলছি 'জেনারেল হিউমানিজম'। সেটাও এমন কিছু বড় বা এমন কিছু আদিখ্যেতা করৰার জিনিস নয়।

এখন সোসিও-সেন্টিমেন্ট-এ হয় কি! না, এক ধরণের গ্রুপ শোষণ করে আর এককে, আবার সেও শোষণ করে আর এককে। এই হিন্দু সমাজে তোমরা লক্ষ্য করবে জাতিভেদ, উচ্চ-নীচ ভেদ খুব আছে। সেজন্যে তোমরা অনেককে হাল্কা ভাবে বলতে শুণবে যে "ব্রাহ্মণরাই এর জন্যে দায়ী"। আর এই যে এই কথা বলে যে 'ব্রাহ্মণরা দায়ী' সে কিন্তু তার চেয়ে তথাকথিত ছোট জাতকে ছুঁচ্ছে না, স্পর্শদোষ এড়িয়ে চলেছে। অন্যেরা আবার আরও দু'তিনটে জাতকে দোষী করছে, কিন্তু তারা আবার তাদের চেয়ে তথাকথিত ছোট জাতকে ছুঁচ্ছে না। তেঁতুলে বাদী বলছে, "দুলে বাগদী আমার চেয়ে ছোট, ওকে ছোঁব না"। আবার সেই তেঁতুলে বাগ্দীই বলছে, "ব্রাহ্মণদের জন্যেই আমরা ধ্বংস হয়ে গেলুম"। আসলে এটা হ'ল কি? না, একটু আগে যা বলেছি সেই একই মনের রোগ। একটা গণ্ডীতে যে ৰদ্ধ হয়ে আছে সে অন্য গণ্ডীগুলোর নিন্দে করে। তোমরা জেনে রাখবে-তোমরা এভাবে কক্ষনো

বোলো না যে অমুকদের জন্যে হিন্দু সমাজ ধ্বংস হ'ল। এরকম বলাটা ভুল। তুমি নিজেও এর জন্যে দায়ী।

এখন এই স্পষ্ট ভাষায় এই কথা ৰলৰার যার সাহস আছে, যে বলে, দাও "গণ্ডী ভেঙ্গে চুরমার করে" তার পথটাকে বলা হয় বিপ্লবের পথ। আর যে ৰলে "আস্তে আস্তে হবেই, অত তাড়াহুড়োর কী আছে"–সেটা হ'ল ক্রান্তির (evolution) পথ। সে কখনো কোনো বড় কাজ করতে পারে না। আবার কিছু আছে যারা সোজা বলে, "না, ৰাৰা, ঠাকুরদাদা, পূর্বপুরুষ এ মেনেছে–আমি তার বিরুদ্ধে কি করে যাব?" তারা হ'ল কী? না, প্রতিক্রিয়াশীল (reactionary)। কিন্তু তার মনের রোগটা কী রকম? না, নোতুন কিছুকে গ্রহণ করতে সে ভয় পায়, অর্থাৎ "he suffers from fear- complex"। মুখে যত বড়ই কথা বলুক না কেন সে ভীতম্মন্যতায় (fear- complex) ভোগে। তারা তো বরং পদে আছে। মুখে বলেন, "আমার বাবা ঠাকুরদাদা যা করে গেছে, তা করছি।" তা, অবশ্য তার বাবা ঠাকুরদাদা পায়ে খড়ম পরতো, সেলাই করা জামা পরতো না, চাদর জড়াতো, চীনী খেতো না–গুড় খেতো, আর কলের জলও খেতো না। একজন মহিলাকে জানি, তিনি কলের জল খেতেন না, বলতেন–"ওই যে জলকলে (water-works)

সাতশ' জাতে কাজ করে, ওই জল আমি খাই কি করে!" তিনি নির্ভেজাল গঙ্গা জল পান করতেন। যেন গঙ্গাজলটা কেবল কুলীন ব্রাহ্মণেরাই ছোঁয়। এগুলোর পেছনে কাজ করে ফিয়ার-কমপ্লেক্স অর্থাৎ পুরোনোকে ছেড়ে নোতুনকে বরণ করতে এই যে অনীহা এর পেছনে কাজ করে যাচ্ছে কেবল একটা ভীতম্মন্যতা। তা এই যে সোসিও-সেন্টিমেন্ট, এর দ্বারা সামাজিক স্তরে একে অন্যের ক্ষতি করে, শোষণ করে, অর্থনৈতিক স্তরে করে, সাংস্কৃতিক স্তরে করে ও রেলিজন-এর স্তরেও করে।

সামাজিক স্তরে প্রথমতঃ একটা জিনিস হয়, কি, না, যাকে শোষণ করতে চাইছে তার মধ্যে ফিয়ার-কমপ্লেক্সের সূচিকা প্রয়োগ (inject) করে দেয়। তার মধ্যে এই ভাবটা জাগিয়ে দেয় "তুই ছোট, আমি বড়"। এই ফিয়ার-কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করার ফলেই ভারতের তথাকথিত ছোট জাতেরা নিজেদের সত্যিই ছোট মনে করে, স্বভাবগত ভাবেই করে। তাদের যদি হাত ধরে' চউকিতে, খাটে বসতে দেওয়া হয়, তা সে বসতে চাইবে না, কারণ যুগ যুগ ধরে ভীতম্মন্যতায় ভুগে ভুগে ওদের মানসিকতাই ওই রকম হয়ে গেছে। আর ঠিক তেমনি যারা অন্যের মধ্যে ফিয়ার-কমপ্লেক্স ইন্জেক্ট করে তারা

পরোক্ষভাবে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করে অন্যেদের ওপর, আর নিজেদের মধ্যে সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করে। এই করে গ্যাপটা দেয় বাড়িয়ে। সমাজের কাঠামোটা যায় ভেঙ্গে। এতে সুসংবদ্ধ (well-knit) সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। এই রকমভাবে যদি যাদের মধ্যে মহাম্মান্যতা আছে তাদের হাতে সামান্যতম ক্ষমতাও থাকে তারা এইভাবে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করে' অন্যান্য কাজগুলো হাসিল করে নেয়। আজ থেকে ৪৫ বছর আগে বা ৫০ বছর আগেও দেখেছি, রেলে কিছু কামরায় এমন ব্যবস্থা থাকতো যাতে প্যান্ট পরে গেলে চাপতে দেওয়া হতো, ধুতি পরে গেলে দেওয়া হতো না। এটা কী–না, ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করা হচ্ছে। এই সূচিকা প্রয়োগ (inject) করার ফলে কী হ'ল–না, মানসিক শোষণ ওইখানেই হয়ে গেল ও তাকে ভিত্তি করে অন্যান্য স্তরে শোষণের সুবিধা হয়ে গেল। ইংরেজীতে কথা বলতে না পারলে মুখ্যু বলে মনে করা হ'ত, এখনও মনে করা হয়। ইংরেজীতে যখন বলতে পারছে না তখন ও মুর্খ। অথচ সে মানুষটা হয়তো সংস্কৃতে বিরাট পণ্ডিত। এটাও এই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করার পরিণতি। এই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করে দেওয়ার

মানেই হ'ল তার ওপর মানসিক শোষণ চালানো। তা সমাজের অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম হয়। কোন জায়গায় দেখবে–বিশেষ করে সেকালে দেখা যেত কোন কিছু সাইনবোর্ড–এ বড় করে লেখা রয়েছে এমন একটা ভাষায় যে ভাষা স্থানীয় ভাষাই নয়। সাইনবোর্ড থাকে কেন? -না, স্থানীয় জনসাধারণকে বোঝাবার জন্যে যে কোন জিনিসটা কী। এই বড় করে লেখাটা যদি শাসক–শোষকের ভাষায় থাকে আর শাসিত–শোষিতের ভাষায় না থাকে অথবা থাকলেও শাসকের ভাষার চরণতলে কৃপাধন্য হিসেবে থাকে তাহলে শাসিত–শোষিতের মনে কী প্রতিক্রিয়া হবে! তাদের মনে নিজের ভাষা (দাসের ভাষাকে ইংরেজীতে 'বারনাকুলার' বলে) ও আত্মপরিচিতি সম্বন্ধে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স জাগবে.....তারা মানসিক ব্যাধিতে ভুগতে থাকবে। এইভাবে তাদের মনের ওপর পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে শাসকের ভাষা নৈবেদ্যের মণ্ডার মত চুড়োয় বসে থাকে। আর লোকের মধ্যে এই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স সৃষ্টি হচ্ছে–'সত্যিই তো এটা রাজার জাতের ভাষা গো!' সুতরাং ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স এলো। যেই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স এলো, তখন তার ওপর মানসিক শোষণ চলতে থাকলো। তা সামাজিক স্তরে এই

সোসিও-সেন্টিমেন্ট-এর দ্বারা যারা পরিচালিত (goaded) হয় তারা এইভাবে শোষণ চালায়। তারা জীবনের অন্যান্য ভূমিতেও এই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স প্রথমে ইনজেক্ট করে দেয়। তারপরে মানসিক শোষণ চলে। মানসিক শোষণ দ্বিভৌমিক। কখনো কেবল মানসিক স্তরেই হয়, আবার কখনও আধা-মানসিক, আধা অন্যান্য ভূমিতেও অর্থাৎ মানসিক শোষণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভূমিতে শোষণ চলে-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রেলিজন-সবেতেই। আমি' তাই এর আগে একবার বলেছিলুম যে জিও-সেন্টিমেন্টের দ্বারা মানুষের যত ক্ষতি করা যায়, সোসিও-সেন্টিমেন্টের দ্বারা তার চেয়ে কোটিগুণ বেশী ক্ষতি করা যায়।

এই সোসিও-সেন্টিমেন্ট হয় কী! মানুষ ভুলে যায় তার স্বাধিকার, ভুলে যায় সে মানুষ-ভুলে যায় মাথা উঁচু করে বাঁচবার অধিকার তারও আছে। তাই সোসিও-সেন্টিমেন্ট আরও বেশী ক্ষতিকর। এখন এই যে সোসিও-সেন্টিমেন্ট অন্যের মনে যে হীনম্মন্যতা জাগিয়ে দিয়ে সাইকিক এক্সপ্লয়টেশন করে (সাইকিক এক্সপ্লয়টেশন অন্যান্য শোষণের ভিত্তিভূমি)- তার ওপরে দাঁড়িয়ে অন্যান্য শোষণগুলো হতে থাকে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ওই রকম।

একটা জনগোষ্ঠী যে বিশেষ ধরণের সোসিও-সেন্টিমেন্টের দ্বারা পরিচালিত (guided by a particular type of socio-sentiment) আর একটা জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে। শোষণ করবার আগে তাদের মনে এই ধারণাটা ঢুকিয়ে দেয় যে, তারা ছোট আর তারা নিজেরা বড়। যেহেতু ওরা বড় তাই ওদের অধিকার বেশী-তাই শোষণ করৰারও ওদের অধিকার আছে। ওরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, তোরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। যদি তোমরা খুঁটিয়ে দেখো তো দেখৰে-বিশ্বের সর্বত্রই একটা জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক শোষণ করছে। সেখানে তারা সেই শোষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমেই সাইকিক এক্সপ্লয়টেশনের পরিবেশ তৈরী করছে তাদের মনের মধ্যে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স সৃষ্টি করে দিয়ে। তাই যেখানে অর্থনৈতিক শোষণ রয়েছে, খুঁজলে দেখৰে তার পশ্চাৎপটে অবশ্যই রয়েছে মানসিক শোষণ। আরও খুঁজলে দেখৰে তারও পশ্চাৎভূমিতে রয়েছে মনের মধ্যে হীনম্মন্যতা (inferiority complex) তৈরী করৰার এক নিরলস ও শঠতাপূর্ণ প্রয়াস।

অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শোষণ করতে গেলে দু'প্রকারে করা যায়। একটা হ'ল-সোজা মানস-অর্থনৈতিক শোষণ যা ইতোপূর্বে বললুম আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে পলিটিকো-ইকনমিক

শোষণ। যেখানে পলিটিকো- ইকনমিক শোষণ চলছে সেখানে তার সঙ্গে যদি মানস-অর্থনৈতিক যুক্ত হয় তো সোণায় সোহাগা। এই পলিটিকো-ইকনমিক শোষণের বলি শোষণ ও অসংস্কৃতি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এককালে ছিল, এখনও অনেক দেশ রয়েছে; শুধু দেশ বলি কেন, জনগোষ্ঠীও। অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে (সে পলিটিকো-ইকনমিক হোক আর মানস-অর্থনৈতিকই হোক) মানুষকে বাঁচাতে গেলে তাদের মধ্যে সচেতনতা (consciousness) আনতে হবে। সচেতনতা না আনলে তারা মানস-অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে তো দাঁড়াতে পারবেই না, পলিটিকো-ইকনমিক শোষণের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারবে না।।

ভারতের মানুষের মধ্যে সচেতনতা না জাগিয়ে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। তার ফলে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক (political independence) স্বাধীনতা মানুষ পেল কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজও পায় নি। আজও সে মানস-অর্থনৈতিক ও পলিটিকো-ইকনমিক ক্ষেত্রে শোষিত হয়ে চলেছে। তা আবার দেখো, যেটা মানস-রাজনৈতিক শোষণ (psycho-political) অথবা রাজনৈতিক স্তরের শোষণ, সেটা কী রকমভাবে হয়? না, একটা জনগোষ্ঠী সোসিও-সেন্টিমেন্ট দ্বারা

পরিচালিত হয়ে আরেকটা জনগোষ্ঠীর ওপর সৰলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। তাদের পেছনে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে যে ওই শোষিত জনগোষ্ঠী বা শোষিত দেশ (এখানে দেশের চেয়েও জনগোষ্ঠীটা বড় কথা–এই নিয়ে একটু পরে আরও বলবো) ওই ভূমিটাকে আমি কাঁচামালের যোগানদার হিসেবে নোৰ; কাঁচামাল তৈরী হবে আমার এক্তিয়ারের মধ্যে, আর ওই শোষিত ভূমিটাকে আমার তৈরী- মালের বাজার হিসেবে পাৰো। এখন যে সমস্ত জনগোষ্ঠী আর্থিক দিক দিয়ে অনুন্নত, তারা কী করে! শক্তিশালী জনগোষ্ঠী অথবা শক্তিশালী দেশের কাছে মাথা বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়–হয় শক্তির অভাবের জন্যে, ভীতম্মন্যতার ফলে অথবা আর্থিক অনটনের ফলে। আর মাথা বিকিয়ে যাবার পরে তার ফলশ্রুতি কী হয়? -না, দ্বিতীয় স্তরে (stage) তারা তাদের ভূমিকে বা জনগোষ্ঠীকে কাঁচামালের যোগানদার হিসেবে ও মাল কেনবার বাজার হিসেবে দেখতে পায়। অর্থাৎ তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। এই জিনিসগুলো মানস–অর্থনৈতিক শোষণের ফলে হয়, আবার পলিটিকো–ইকনমিক শোষণের ফলেও হয়–দু'টোতেই হয়। বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই ভেবে দেখৰে, বিচার করে দেখৰে কোন্টা কী ধরণের হচ্ছে। যেখানে শক্তি বলে, জড়শক্তির বলে

হয় তা পলিটিকো-ইকনমিক শোষণ। কিন্তু যেখানে জড়শক্তির বলে হচ্ছে না, বুদ্ধির বলে চালাকির দ্বারা হচ্ছে সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানস-অর্থনৈতিক শোষণ। এখন পলিটিকো-ইকনমিক শোষণই হোক আর মানস-অর্থনৈতিক শোষণই হোক, এর ফলশ্রুতিটা হয় কী! না, যারা শোষক-যারা শোষণ করছে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তারা শোষিতদের কেবল যে শোষণই করে তা নয়, শাসনও করে। কারণ শাসন কাজ অব্যাহত থাকলে শোষণ ভালোভাবে চলে। আর যারা পরোক্ষভাবে করে তারা কী করে! নিজেরা শাসন করে না, শাসকদের অর্থৰলে ক্রয় করে নেয়। আর এই অর্থৰলে ক্রয় করার পরিণামটা কী হয়! না, শাসককুল যাদের অর্থে ক্রীত হচ্ছে তাদেরই মনোরঞ্জন করে, তাদের টাকায় নির্বাচনে জয়ী হয়, তাদের সবরকমে মনোরঞ্জন করে, আর মুখে তারা আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তলে তলে এই জিনিসটাকেই সমর্থন করে। এই যে জিনিসটা, একে আমি নাম দিয়েছি বাকসর্বস্ব বিপ্লবী (vocal revolutionist)। এরা মুখে বড় বড় কথা বলৰে শোষণের বিরুদ্ধে, আর কার্যক্ষেত্রে তলে তলে সেইটাই করে যাবে। আমি বলেছিলুম, এর চেয়ে কিছুটা ভালো হ'ল

কী! না, রিফর্মিষ্ট–যারা বলে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করা যাক। কিন্তু তাদের মতলৰ থাকে যাতে শোষণের রথ অব্যাহত থাকে। তোমরা পৃথিবীতে অনেক রিফর্মিষ্ট দেখেছো কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা সমাজের কল্যাণ চায়নি, তারা একটু উনিশ–বিশ করে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে চেয়েছিলো। পৃথিবীতে এমন এমন অনেক লোককে দেখেছো যারা জাতিভেদের বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলেছে–"না, সৰাই সমান, সৰাইকার ছোঁয়া খাৰো, আমাকে যদি একটা পরিষ্কার ধোয়া গ্লাসে ভালো ফিল্টার করা জল দেয় তো খাৰ। এই খেয়ে নিলুম।' সবাই হাততালি দিয়ে বললে– "এই তো! এই তো! এই তো!" সে হ'ল কি, না, রিফর্মিষ্ট। সে তলে তলে জাতটাকে বজায়ই রাখতে চাইছে। সে যদি জাতিভেদ বজায় রাখতে না চাইত, তাহলে বলত–"এই অস্পৃশ্যতার মূলীভূত কারণ হ'ল জাত–পাত ভেদ। তবে না উচ্চ–নীচ হয়েছে, তবে না অস্পৃশ্যতার উদ্ভব হয়েছে, তবে না জাত–পাত তৈরী হয়েছে–ভেঙ্গে দাও জাত–পাতের বন্ধন।" এই সাহস যদি তার থাকতো সে হতো বিপ্লবী। কিন্তু এই সাহস তাদের ছিল না ও তারা বিপ্লবকে বিলম্বিত করে দিয়ে মানুষের বেশী ক্ষতি করছে।

যুগ-সংস্কারক যাঁরা তাঁরা সমাজের কল্যাণকামী নন। বরং তাঁরা সমাজের ত্রুটিগুলোকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করতে চান। তাদের পাকে প্রকারে জিইয়ে রাখতে চান। তাদের মধ্যে হয় ভীতম্মন্যতা ছিলো অথবা ছিলো শঠতার নোংরামি। আর এই পলিটিকো-ইকনমিক শোষণ যা চলে থাকে তা শেষ পর্যন্ত শোষিত মানুষের চোখ যখন খুলে দেয়, তাদের সমর্থন ও আদিখ্যেতা তখন তথাকথিত যুগসংস্কারকদের থেকে সরে যায়।

যে সৰ শোষকেরা প্রত্যক্ষভাবে পলিটিকো-ইকনমিক শোষণ করে চলেছে, অথবা যারা প্রত্যক্ষভাবে মানস-অর্থনৈতিক শোষণ করে চলেছে, পরোক্ষভাবে শোষকগণকে সমর্থন করছে, তারা শেষ পর্যন্ত জনসমর্থন হারাৰেই হারাবে। কারণ, মানুষের যখন চোখ খুলে যায় তখন আর কোনো ধরণের চালবাজি টিকতে পারে না। সেই সময় ব্যুরোক্র্যাসির সাহায্য ছাড়া এক পা-ও তারা চলতে পারবে না আর সেক্ষেত্রে এই ব্যুরোক্র্যাসির দ্বারা সম্প্রেষিত হয়ে তাদের সব কাজ করতে হয়। তখন তারা আর চোখ-খুলে-যাওয়া জনগোষ্ঠীর মোকাবিলা করতে পারে না, তারা চলতে পারে না। আর এইভাবে চলতে চলতে ধাপে ধাপে অৰাধভাৰে সেই

ব্যুরোক্র্যাসি এক ধরণের ওলিগার্কির কাছে মাথা নোয়ায়। এক ধরণের বিশ্রী ওলিগার্কি সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে। মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক এ এক অসহনীয় পরিস্থিতি। এর হাত থেকে মুক্তির উপায় হ'ল কী? না, মানুষের মধ্যে চেতনা এনে দাও, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় তাদের চোখ খুলে দাও। তারা বুঝতে শিখুক, কী, কেন, কোথায়, কী হচ্ছে। তাই ষ্টাডির দরকার আছে-একশ'বার আছে। আর এছাড়া রয়েছে মানব মনের ওপর রেলিজনের মাতব্বরি। তোমরা জান, রেলিজন জিনিসটা মোটামুটি বিচারে ভাবজড়তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর রেলিজনের প্রচারকরা কী করছেন? তাঁরা কখনও ভাগবত ধর্মের প্রচার করেননি-উদার মনুষ্যধর্মের, সর্বানুস্যূত ভাগবত ধর্মের প্রচার তাঁরা কোনো কালে করেননি, তাঁরা তাকে ভয় পেয়েছেন, এড়িয়ে গেছেন। তাঁরা কী করেছেন? সব সময় বলে গেছেন যেটা আমি বলছি সেটা আমার কথা নয়, ওটা ভগবানের কথা, আমি ভগবানের দূত। অর্থাৎ আমি যা বলছি সেটা আমার কথা মনে করো না। এটা ভগবানের কথা, তাই এটা তোমাকে মানতেই হবে। প্রশ্ন করবে না যে কথাটা ঠিক কি ভুল। প্রশ্ন করা পাপ, তাহলে আলজিব খসে যাবে।" অর্থাৎ মানুষকে তারা ভাবজড়তার

বন্ধনে আরও বেঁধে রেখেছে, যাতে সেই গণ্ডীর বাইরে এক পাও সে চলতে না পারে। এক-পা চলতেও তার ভয় হয়- "ওরে ৰাৰা! পাপ হবে। অনন্তকাল নরকের আগুনে পুড়তে ` হবে।"

এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে ভাবজড়তার বন্ধনে যারা আবদ্ধ করে রেখেছিলো তারাই তথাকথিত রেলিজনের গুরু ইত্যাদি। তারা মানুষের চরম ক্ষতি করে গেছে। আর, এক গণ্ডীৰদ্ধ জীব, গণ্ডীৰদ্ধ রেলিজিয়াস গ্রুপ আর একটার সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। কারণ দু'টোর মধ্যে তো কোনো মিল নেই। এ উত্তরে যায় তো ও দক্ষিণে যায়। ভগবানের নাম ভাঙ্গিয়ে তারা তাদের কার্যসিদ্ধি করেছে-এটা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। এই ভাবেই একটা গ্রুপ আর একটা গ্রুপকে তাদের শোষণের ভূমি হিসেবে পেতে চায়। যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি রেলিজনের ক্ষেত্রেও এটাই হয়। তারা তাদের নিয়ে স্যাটেলাইট গোষ্ঠী তৈরী করতে চায়। যেমন একটা অর্থোন্নত জনগোষ্ঠী একটা অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে নিজের স্যাটেলাইট হিসেবে পেতে চায় অর্থাৎ ওদের কাছ থেকে কাঁচা মালটি নেৰে, নিজের কারখানায় তৈরী করৰে আবার তৈরী-মাল' ওদের দেশকে

কিনতে বাধ্য করাবে। ঠিক তেমনি এই রেলিজনের ক্ষেত্রেও স্যাটেলাইট করবার চেষ্টা করা হয়। আর সব সময় যারা এই স্যাটেলাইট করতে চাইছে তাদের অর্থে পুষ্ট হয়ে এই সব তথাকথিত ধর্মপ্রচারকরা নিজেদের দিন কাটিয়ে যায়। এদের মধ্যে হয়তো অনেকেই জানে না যে তারা একটা শোষকের স্যাটেলাইট গ্রুপ তৈরী করার কাজে রত। আবার হয়তো কিছু কিছু লোক আছে যারা সেটা জানেও। যারা জানে না তাদের কাণে সত্য কথা শুণিয়ে দাও, ও নব্যমানবতাবাদ তাদের কাণের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছে দাও।

তাদের বুদ্ধি মুক্তিলাভ করবে। তখন তারা তাদের বিভ্রান্তির তকমা ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর যারা জেনেশুণে এই ভাবজড়তার প্রচার করছে, জেনেশুণে অনুচিত তত্ত্বের দালালি করে চলেছে, সত্য কথা প্রচার হতে দেখলেই তারা আরও উগ্র, আরও উদগ্র হয়ে উঠৰে। তা যত পারে উঠুক, যত পারে পাপের ঘড়া উপচিয়ে দিক। নাশ তাদের অনিবার্য, তাদের পাপের বিনাশ দূরপনেয় বিধিলিপি। রেলিজনের ক্ষেত্রেও তোমরা ভালভাবে তাকালে দেখৰে যে জেনে বা না জেনে যারা এই শোষণের কাজ করে চলেছে তাদের পেছনে রয়েছে অর্থশালী সত্তা। তাদের স্যাটেলাইট

তৈরী করতে চায়। সর্বস্তরেই দেখবে যে এদের পেছনে রয়েছে কোনো না কোনো ধনীর পুঁজি।

এরপর আর একটা জিনিস আছে–সেটা হ'ল সংস্কৃতি। তোমরা জান, অভিব্যক্তির যেটা মধুরতর সূক্ষ্মতর ভাব সেটাকেই আমরা সাধারণতঃ সংস্কৃতি বলে থাকি। মনে করো, তোমাকে কেউ খেতে দিলে, তুমি হাত মুখ না ধুয়ে দু'হাতে করে খেতে পার। আবার হাত মুখ ধুয়ে শুদ্ধভাবেও গ্রহণ করতে পার। এই যে শুদ্ধাচার ও স্বাস্থ্যসম্মত বিধি অনুযায়ী খাওয়া এটাই হ'ল খাওয়ার কালচার। যে সকল কর্মে এই যে মধুরতর, সূক্ষ্মতর অভিব্যক্তিগুলো রয়েছে সেগুলোই হচ্ছে কালচার। সংস্কৃতি মানুষের এক, তবে বিভিন্ন জায়গায় এর অভিব্যক্তির ধরণ ধারণে একটু স্থানিক পার্থক্য থাকে। কিন্তু যে জনগোষ্ঠী সোসিও–সেন্টিমেন্টের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্যকে শোষণ করতে চায় সে অন্যের স্থানিক অভিব্যক্তিগুলোকে নষ্ট করে দিতে চায়। জোর করে একের ওপরে অন্যের ভাষা চাপায়, জোর করে একের ওপরে অন্যের পোষাক চাপায়, অন্যের চিন্তাধারা চাপায়। এইভাবে মানসিক দিক দিয়ে তাদের পঙ্গু করে দিয়ে শোষণের আরো সুবিধা করে নেয়। তা সাংস্কৃতিক জীবনে এইভাবে চলে শোষণ, আর

এই শোষণ করে কারা? যারা সোসিও-সেন্টিমেন্টের দ্বারা অভিপ্রেষিত।

পৃথিবীতে এই হয়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে নিরীহ, নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষকে বাঁচাৰার মহৎ দায়িত্ব কি তোমাদের নয়? নিশ্চয়। যারা আগে জাননি তারা জানছ, অথবা অন্যের মুখে শিখে জানবে। মানুষকে বাঁচাতেই হৰে-কেন নিরীহ মানুষ এইভাৰে বলির পাঁঠা হয়ে থাকতে বাধ্য হবে? কিছুতেই এ সহ্য করা চলে না। মনে করো, কোনো একটা জনগোষ্ঠীর সিনেমা, থিয়েটার বেশ উচ্চমানের কিন্তু সেখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে শাঁসাল ধনীর সংখ্যা কম। আর একটা কোনো জনগোষ্ঠীর থিয়েটার, সিনেমা অতি নিম্নমানের; কিন্তু সেখানে শাঁসাল ধনী লোকের সংখ্যা বেশী। তারা ওই উচ্চমানের সংস্কৃতির ওপর শোষণ ৰজায় রাখতে চায়। কারণ মানস-অর্থনৈতিক ও মানসিক স্তরেও পঙ্গু করার আর একটা পথ হচ্ছে কী! না, সাংস্কৃতিক শোষণ। সেই ভাল মানুষগুলোর ঘাড়ে খারাপ সিনেমা, খারাপ নাটক সমস্ত চাপিয়ে দেওয়া। জান তো, মানুষের স্বাভাবিক মন অধোমুখী। নীচের দিকে যত সহজে যায় ওপরের দিকে তত তাড়াতাড়ি ওঠে না। সুতরাং খারাপ সিনেমা, খারাপ নাটক অর্থৰলে যদি তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে

দেওয়া হয় তাহলে কী হবে? না, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে, পঙ্গু হয়ে যাবে। আর এই পঙ্গু মানুষগুলো, মেরুদণ্ডহীন মানুষগুলো আর ভবিষ্যতে সাংস্কৃতিক শোষণ বা অন্য কোনো রকম শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে যূথৰদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারবে না–পারতেই পারে না, কেননা মানসিক দিক দিয়ে তাদের শেষ করে দিলুম। তাদের মাথা তোলবার পথ চিরতরে বন্ধ করে দিলুম। আর তারা মাথা তুলবে কী করে? এই যে সাংস্কৃতিক জীবনে শোষণ যেটা করা হয় অসংস্কৃতির মাধ্যমে, সেই অসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিটি সৎ, প্রতিটি ধার্মিক, প্রতিটি বিচারশীল মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে। সেই সঙ্গে অন্যকেও একাজে প্রেরণা জোগাতে হবে। তা না হলে মানুষের ভবিষ্যৎ থাকে না। মানুষ রাজনৈতিক শক্তির জন্যে লড়াই করে গেল, সামাজিক মুক্তির জন্যে লড়াই করে গেল বুঝলুম, কিন্তু যদি সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল তাহলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তা হবে ভস্মে ঘৃতাহুতির সামিল। যদি কারো মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে, সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অসংস্কৃতির বোঝায় যার ঘাড়–পিঠ ভেঙ্গে দুমড়ে গেল সে কি মাথা উঁচু করে জীবনে অন্য কোনো ভূমিতেই সংগ্রাম করতে পারবে? কিছুতেই পারবে না। তাই অসংস্কৃতির হাত থেকে

নিরীহ মানুষকে রক্ষা করা প্রতিটি বিচারশীল মানুষেরই অবশ্য কর্তব্য।

(কলিকাতা, ২১শে মার্চ, ১৯৮২)

মেকী মানবতাবাদ

বলছিলুম সমাজকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতার কথা (সোস্যাল সেন্টিমেন্ট)। সেন্টিমেন্ট যেখানে এককত্বের সীমা ডিঙিয়ে যায়-একের বেশীকে নিয়ে হয়, তখনই সে সোস্যালের আওতার মধ্যে আসে কিন্তু এর অন্তটা কোথায়? ব্যাসার্ধ (radius) যেমন শূন্যকে নিয়ে হয় না তেমনি অনন্তকে নিয়েও হয় না। অর্থাৎ শূন্যের বেশী ও অনন্তের কম এই রকম একটা ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত রচনা করতে হয়। আর সেই অবস্থাতেই এর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়-স্বীকৃত হয়। তার কম হলে বা বেশী হলে অস্তিত্ব নস্যাৎ হয়ে যায়-অস্তিত্ব তখন থিয়োরীতে থাকলেও বৈবহারিক ক্ষেত্রে থাকে না। যা ফ্যামিলি সেন্টিমেন্ট সেটাও একটা সোসিও-

সেন্টিমেন্টের অঙ্গ। এর ব্যাসার্ধ বড্ড ছোট। এর চেয়ে বড় ব্যাসার্ধ হচ্ছে জাতবুদ্ধি প্রবণতা (caste sentiment), সম্প্রদায়বুদ্ধি প্রবণতা (community sentiment), জাতীয়ৰুদ্ধি প্রবণতা (national sentiment), ইন্টার ন্যাশান্যাল সেন্টিমেন্ট, আরো কত প্রবণতা। এখন সোস্যাল সেন্টিমেন্টের মধ্যে যে সেন্টিমেন্টটা সবচেয়ে ছোট সেটাকে বলতে পারি "যূথকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা-সর্বাল্প" (socio-sentiment minimitis)। আবার থিয়োরীতে যেটা সবচেয়ে বড় তাকে বলতে পারি "সমাজকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা-সর্ববৃহৎ" (social sentiment maximities) বা "সমাজকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা-সর্বাতীগ" (social sentiment excellensior)। এখন আমাদের দেখতে হৰে যে এই দু'টো শব্দের মধ্যে পার্থক্যটা কী?

এক্সসেলেন্সীওর আর ম্যাক্সিমাইটিস-এর মধ্যে যে তত্ত্বগত দূরত্ব (gap) আছে তাকে থিয়োরীতে যদি পূরণ করি তাতে মাটির পৃথিবীর তথা ধূলির ধরণীর মানুষের কোনো কল্যাণ হবে না। কেবল থিয়োরীর আকাশে সে উড়ে বেড়াবে। পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র-এ নিয়ে আগেকার দিনে পণ্ডিতেরা লড়াই করতেন। তাল পড়বার পরে ঢপ্ শব্দটা হয় না ঢপ্ শব্দটা হবার পরে তাল পড়ে-এ নিয়ে এককালে

পণ্ডিতরা তর্ক করতেন। শোণা যায়, একবার নবদ্বীপে পণ্ডিতেরা এই নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। তাল ঠিক পড়ছে এমন সময় ঢপ্ শব্দ হয় না পড়ার পরে হয়–এই নিয়ে তিন দিন তিন রাত পাঁচশ' পণ্ডিত তর্ক করেছিলেন। তাতে পাঁচ মণ নস্যি খরচ হয়েছিলো। তারপর তৃতীয় দিন রাত্রিযাপনের পর প্রভাত হ'ল। তখন দেখা গেল পণ্ডিতেরা সবাই ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। কী হয়েছিলো! না, তাদের কারো মাথায়, কারো পিঠে তাল পড়েছিল। তা, এখন এই যে সোস্যাল সেন্টিমেন্ট সেটার স্টেজ অব এক্সেলেন্সীওর অথবা ইন থিয়োরী ম্যাক্সিমাইটিজ–এটাকেই বলতে পারি মানবতাবাদ (humanism)।

কোন একটা বিশেষ নেশনকে নিয়ে কাজ করছিলুম। এখন সব নেশনকে নিয়ে কাজ করছি। যখন নেশনের অস্তিত্ব তলে তলে মানছি আর বলছি সব নেশনকে নিয়ে কাজ করছি তখন সেটা হিউম্যানিজম্ হ'ল না–ইউনিবার্সালিজম্ তো অনেক দূরের কথা–এটা হ'ল ইন্টারন্যাশান্যালিজম্।

এখন 'ইন্টারন্যাশান্যালিজম্' শব্দটা যখন ব্যবহার করলুম তখন সঙ্গে সঙ্গে যেমন নেশনের পৃথক অস্তিত্ব মানলুম তেমনি

মানার সঙ্গে সঙ্গে তার পঞ্চপ্রয়োজন অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থানের কথাও মানলুম। ও সেই সঙ্গে একগোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর প্রাণরস শোষণ করে নিজেকে পরিপুষ্ট করতে চাইছে-এটাও দেখলুম। এটা দেখতে পেয়ে এর বিরোধিতা করতে গিয়ে আবার বিশ্বযুদ্ধ। সুতরাং ইন্টারন্যাশান্যালিজমে সমস্যা সমাধানের চাবি-কাঠি নেই। তাহলে কী-না, নেশন বা ইন্টারন্যাশান্যালিজমের কথা বাদ দিয়ে পরিধিটা আরও একটু বড় করে দিলুম-দিয়ে সমস্ত মানুষকে তার মধ্যে টেনে নিলুম। সমস্ত মানুষকে তার মধ্যে যে টেনে নিলুম-এইটাই হ'ল হিউম্যানিজম্। যাকে আরো ভাল করে বলতে গেলে বলতে হয় অর্ডিনারী বা জেনারেল হিউম্যানিজম্।

এখন এই হিউম্যানিজম্স্টা হ'ল কী! -না, সোসিও-সেন্টিমেন্ট ম্যাক্সিমাইটিস্। এই যে সোসিও-সেন্টিমেন্ট ম্যাক্সিম্যাইটিস্-এটাতেই কি সৰ কিছুর নিদান পাওয়া যাৰে? এটাতেই কি সবকিছুর প্রতিষেধ, সমাধান হৰে? -না, হবে না। দু'টো কারণে হবে না। একটা কারণ হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে ইন্ট্রা-হিউম্যানিষ্টিক ক্ল্যাস থাকৰেই আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে যে প্রাণী-জগতে মানুষই একমাত্র প্রাণিন্ সত্তা নয়, আরো অনেক প্রাণিন্ সত্তা রয়েছে। তাদের কথা না ভাৰলে বাইরের জগতে

হয়তো সংঘর্ষ হবে না। কারণ অ-মানব প্রাণীরা মনের দিক দিয়ে অবনত (শরীরের দিক দিয়ে উন্নত হলেও মনের দিক দিয়ে অবনত)। তাই তাদের ধ্বংস করে দিতে পারা যাবে- জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ দুইকেই। কিন্তু এই যে ধ্বংস করে দেওয়া, এটা মানুষের জীবনে আরও বড় ধ্বংস ডেকে আনবে, আরও বড় বিপর্যয়ের উত্তরণ ঘটাবে। জীবজগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও মনুষ্য জগতের মধ্যে তার ফলে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

মনুষ্য জগতে যে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ (intra-clash) সেই ইন্ট্রাক্ল্যাসটা কী ধরণের! ভাবছি অমুক জনগোষ্ঠীর মানুষ খেতে পাচ্ছে না, তাদের মুখে খাদ্য জুগিয়ে দিই-এটা একটা মানবিক ব্যাপার ঠিকই। কিন্তু তলে তলে ভাবছি এই সুযোগে ওই জনগোষ্ঠীটাকে আমার কাঁচা পণ্যের বাজার হিসেবেও পাবার চেষ্টা করি.....কারণ লোকগুলি তো অনুগৃহীত হয়ে রইল। এই ধরণের যে মানসিকতা বা শর্ত তাই একদিন অঙ্কুরিত হয়ে, পল্লবিত হয়ে মানব সমাজের শান্তি নষ্ট করে দেবে। সুতরাং এই হিউম্যানিষ্টিক অ্যাপ্রোচের মধ্যে ভেজাল রয়েছে, খাদ মেশানো রয়েছে। মনে করছি যে অমুক জনগোষ্ঠীর মানুষ শিক্ষায় অনগ্রসর-আহা! ওরাও তো মানুষ, ওদের মূক মুখে ভাষা এনে দিই, ওদের ছাপার অক্ষরের সঙ্গে

পরিচয় ঘটিয়ে দিই–তাই করলুমও। কিন্তু শিক্ষার ভেতর দিয়ে এমন জিনিসের সূচিকা (injection) প্রয়োগ করে দিলুম যা সেই অঞ্চলের মানুষকে শিক্ষিত করবে কিন্তু পঙ্গু করে দেবে। অর্থাৎ এই পঙ্গু মানুষ ঘুরে ফিরে ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে এসে যাবে (They will be governed as a colony of people)। এতে বিশ্বের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এগুলো সবই ইন্ট্রাহিউম্যান ক্ল্যাস। সোস্যাল স্ফীয়ারে নিজের পছন্দমত ভাবে তাদের গড়ে তুলবো আর তাদের স্বকীয়ত্ব ধ্বংস করে দোবো। এই মনোভাব কাজ করবেই। এই মনোভাব কেন কাজ করছে! না, আমি দয়া করছি–এই অহম্মন্যতা, এই মহাম্মন্যতাই আমার উপযুক্ত মোসাহেব, আমার উপযুক্ত স্যাটেলাইটে পরিণত করতে শেখাবে। সুতরাং এই যে খাদমিশ্রিত মানবিকতা (humanity)-এ মানবিকতা নয়, এ হিউম্যান সেন্স, হিউম্যান স্পিরিট নয়, এটা হচ্ছে অর্ডিনারী হিউম্যান সেন্টিমেন্ট যা প্রকারান্তরে স্যুডো–হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা কেমন! –না, যেমন স্যুডো–রিফরমিষ্ট স্ট্রাটেজী হয়। স্যুডো–রিফরমিষ্ট স্ট্রাটেজিটা কী রকম হয়! –না, অমুক জিনিসটা আমার প্রতিপক্ষ যা বলছে (এই কাজটা হয় একেবারে সোসিও–সেন্টিমেন্টের ভেতরে) তা সঙ্গত কথা।

অথচ এটা যদি কার্যরূপ নেয় আমার অসুবিধে হবে অথবা আমার ইন্ডিভিজুয়াল সেন্টিমেন্টে ৰাধা প্রাপ্ত হবে। তখন কী করছি! ঠিক আছে, ঠিক আছে, জিনিসটা মানিয়ে নিচ্ছি, মানিয়ে (adjust) নিচ্ছি, ... এইভাবে করৰো, ... তোমরা এতে সন্তুষ্ট তো... আচ্ছা আচ্ছা, বড় পরিবর্তন চাইছি না... ধাপে ধাপে করছি-ধাপে ধাপে করবো:- এই সমস্ত বললুম। কিছুটা ভাষণ দিলুম, বললুমও আর তলে তলে কিন্তু কোনো পরিবর্তনই হতে দোৰ না। এটাকে বলি স্যুডো রিফর্মিষ্টিক স্ট্রাটেজি অর্থাৎ প্রাক্সম-সংস্কারবাদাত্মক রণনীতি। আর স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজি হচ্ছে, মুখে মানবতার ললিতবাণী প্রচার আর তলে তলে মানবতার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করছি কারণ দৃঢ় ভিত্তির অভাবে এই ধরণের অর্ডিনারী হিউম্যান সেন্টিমেন্ট একটা চপলতাপূর্ণ (ব্যাসিলেটিং) অবস্থায় থাকে। এই জিনিসটা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে চলে চলেছে ও যাতে বেশী দিন না চলে সেই জন্যে তোমাদের চেষ্টাশীল হতে হবে। এই ইন্ট্রা-হিউম্যানিজম-এ এই ইন্ট্রা-হিউম্যানিষ্টিক ক্ল্যাস, এটা ঘটে চলেছে। যার ফলে মানুষে-মানুষে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে। কারণ কী! -না, তথাকথিত অর্ডিনারী হিউম্যানিজম্, বা জেনারেল হিউম্যানিজম্, এটা

ন্যাশান্যালিজমেরই একটা বর্ধিতায়ত অবস্থা (enlarged form)। গোড়ার দিকেই বলছিলুম যে রেডিয়াসটা বড় (maximitis)-এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহলে এখন দেখ, রোগ হিসেবে সোসিও-সেন্টিমেন্ট মিনিমাইটিস আর সোসিও-সেন্টিমেন্ট ম্যাক্সিমাইটিস দু'টোই মানসিক ব্যাধি-এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ, যদিও দু'য়ের ব্যাসার্ধের রকমফের রয়েছে। মানুষটা একই ব্যাধিগ্রস্ত। শরীরের একটা জায়গায় অল্প পরিসরে একটা ব্যাধি রয়েছে, আর একটা বড় পরিসরে সেই ব্যাধিটাই রয়েছে। এখানে রোগটা এক, পরিধির তফাৎ রয়েছে মাত্র। এই যে ম্যাক্সিমাইটিস অথবা এক্সেলেন্সীওর তা যূথকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে ও তা মানুষের সামনে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ডেকে আনে। শুধু তাই নয় মানুষে-জীবে-উদ্ভিদেও পারস্পরিক সংঘর্ষ ঘটিয়ে দেয়। মনকে হিউম্যানিজমে প্রতিষ্ঠিত না করে স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজি নিয়ে এগোলে পাকে প্রকারে উপকৃত জনগোষ্ঠীকে নিজের সোস্যাল সেন্টিমেন্টের আওতার মধ্যে এনে ফেলা হচ্ছে। তাই তাদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শোষণ একদিন হৰেই-আজ হয়তো হচ্ছে না, কাল হবে; এবেলা

হয়তো হচ্ছে না, ওৰেলা হৰে–অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তো আরও বেশী করে হবে।

একটা মজার জিনিস রয়েছে যা লোকে তলিয়ে ভাবছে না। যাকে আমরা অর্থোন্নত (developed) জনগোষ্ঠী বলছি–কিছুকে বলছি অর্থোন্নত, কিছুকে বলছি উন্নতিশীল (developing), কিছুকে বলছি অনুন্নত (undeveloped) -সেই অর্থোন্নত জনগোষ্ঠী কেউ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নেই। তারা অবস্থার চাপ সৃষ্টি করে উন্নতিশীল ও অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে শিল্পজাত তৈরী মাল কিনতে বাধ্য করছে। নিজের সম্পদের উৎকর্ষ ঘটিয়ে কেউ ডেৰলপ্ত হচ্ছে না। আর যারা নিজের সম্পদের উৎকর্ষ ঘটিয়ে অর্থোন্নত হচ্ছে তাদের পোটেনসিয়ালিটি সৰাইকার সমান না থাকায় একদিন পোটেনসিয়ালিটির অন্ত হবে। আর পোটেনসিয়ালিটির অন্ত হ'লে তখনই তাদের অন্যের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে; ৰৌদ্ধিক শক্তি অথবা জড় শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। তাই যতক্ষণ নেশনের বেড়াজাল রয়েছে, শুধু নেশনের কেন, ম্যাক্সিমাইটিসের বেড়াজাল রয়েছে, মিনিমাইটিসের কথা তো বলছিই না, ততক্ষণ অন্যকে শোষণ করার বৃত্তি ব্যষ্টিগত বা সামূহিক জীবন থেকে দূর হবার নয়। এরই জের পলিটিক্যাল

লাইফে আসতে বাধ্য। আর কালকেই বলেছিলুম যে স্যাটেলাইট তৈরী করার জন্যেই রেলিজনের প্রচার করা হয় বা যারা প্রচারক তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অন্যায় কাজটাই করছে। কারণ তার পেছনে রয়েছে এমন কোন জনগোষ্ঠীর পুঁজি যে জনগোষ্ঠী হয় কাঁচামালের যোগানদার হিসেবে ওই মানুষগুলোকে পেতে চায় অথবা তৈরী মালের বাজার হিসেবে পেতে চায় অর্থাৎ স্যাটেলাইট হিসেবে পেতে চায়। তাই রেলিজিয়াস লাইফে রয়েছে পুরো মাত্রায় আৰিলতা। এই রেলিজনগুলো ভাগবত ধর্ম নয়, সর্বানুস্যূত মানবধর্ম নয়।

এই কল্মষ রয়েছে সাংস্কৃতিক জীবনেও (cultural life)। কারো কালচারাল লাইফটাকে যদি কিনে নেওয়া যায় তাহলে তাকে চিরতরে দাসে পরিণত করা যায়। তাই যারা শাসক ও শোষক তাদের মধ্যে যদি সোসিও-সেন্টিমেন্ট ম্যাক্সিমাইটিস্ থাকে, যাকে জেনারেল হিউম্যানিজম্ বলি, তা থাকে, তাহলে সে সোস্যাল, ইকনমিক, কালচারাল, পলিটিক্যাল ও রেলিজনের জগতে এক্সপ্লয়েট করতে চাইবে। তাই এ চরম নিদান দিতে পারে না, এ মানুষের পক্ষে চরম পথ নয়। একটা জনগোষ্ঠী- যদি আমি তাকে ইন্টারন্যাশন্যালিজম্ নাম দিলুম অথবা সোস্যাল সেন্টিমেন্ট, সোস্যাল গ্রুপ-এক্সলেন্সীওর নাম দিলুম;

তারা কিন্তু বাকী মনুষ্যেতর জীব (মনে রাখতে হবে- গাছপালা, পশুদেরও বাঁচার আকুতি আছে, তারা স্বেচ্ছায় হাড়কাঠে মাথা গলিয়ে দেয় না), সেই বৃক্ষরাশি বা জীবকে ধ্বংস ক'রে বেঁচে থাকতে চায়। এই যে ধ্বংসের বীজ এই ধ্বংসের বীজ যে কেবল ইন্টার-ক্রিয়েচার ওয়ার্লড-এ আছে তা নয়; ইন্ট্রা-ক্রিয়েচার অর্থাৎ হিউম্যান ওয়ার্লডেও ঘুরে ফিরে আসে। আজ পশুর ওপর যে নির্যাতন করা হচ্ছে, কাল এক জনগোষ্ঠী আর এক জনগোষ্ঠীর মানুষের ওপর সেই নির্যাতন করতে পারে। কারণ, নির্যাতন করার বীজ তার রক্তে কিল্বিল্ করছে। রোগ তার সারেনি, সে মুখেই বড় বড় কথা বলছে। তাই একটু আগেই বলছিলুম, জিনিসটা স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজি; হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজিও নয়। মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে, চাষের জমি বাড়াবার জন্যে, কলকারখানা বাড়াবার জন্যে কী করা হয়! বড় জঙ্গল কেটে ফেলা হয়। কিন্তু সেই জঙ্গলের জীবেরা, আরণ্য জীবেরা কোথায় যাবে তা ভাবা হয় না। সুতরাং হাতী, বাঘ প্রভৃতি শহরে গ্রামে এসে জোটে, মানুষকে মারে, ঘর-দোর নষ্ট করে। কেন করে! বাঁচার তাগিদে করে। তাদের বাসস্থান অরণ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা যাবে কোথায়, একটু ভেবে দেখিনি যে তাদের

বাসস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে এসব কথা আদৌ ভাবি না। অরণ্য কেটে নিঃশেষ করে দিই। ভাবি না যে অরণ্য কাটার ফলে জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ আর মনুষ্য জগতের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আরও ভাবিনা যে এই জীবজগৎ আর উদ্ভিদজগৎকে ধ্বংস করে মানুষের লাভ হবে না–ক্ষতিই হবে। কারণ জীব জগতের এক একটা সত্তা বা উদ্ভিদ জগতের এক একটা সত্তা–তাদেরও দু' ধরণের মূল্য আছে। একটা তাদের উপযোগ মূল্য; আর একটা তাদের আস্তিত্বিক মূল্য।

যে সমস্ত জীবের বর্তমানে উপযোগ আছে মানুষ তাদের বাঁচিয়ে রাখে। যেমন গোরুকে বাঁচিয়ে রাখে। আজ ঘোড়ার উপযোগ মূল্য ফুরিয়ে গেছে। আজ পথে–ঘাটে তাই ঘোড়া দেখা যায় না। কিছুদিন পরে কেবল চিড়িয়াখানায় গিয়ে ঘোড়া দেখতে হবে; অন্যত্র ঘোড়া পাওয়া যাবে না। সে মানুষের প্রয়োজন মেটাচ্ছে না, মানুষের কাছে তার উপযোগ মূল্য শেষ হয়ে গেছে, তাই মানুষ তাকে আর বাঁচাচ্ছে না। যখন রাসায়নিক পদ্ধতিতে সিনথেটিক দুধ মানুষ আবিষ্কার করবে তখন সে গোরু পোষা ছেড়ে দেবে। সেদিন মানুষ গোরুগুলোকে হয় না খাইয়ে মেরে দেবে, না হয় নিজেরাই

তাদের খেয়ে নেৰে। এই হচ্ছে অবস্থাটা। মানুষের কাছে উপযোগ মূল্য যার নেই তার বাঁচার অধিকার নেই-এই কথা কে বলে! এই কথা বলৰার কারুর নৈতিক অধিকার নেই। বাঁচার অধিকার কেবল মানুষের আছে, আর মনুষ্যেতর জীবের নেই এমন কথা কিছুতেই বলা চলে না। সবাই ধরিত্রীর সন্তান, পরমপুরুষের সন্তান। এখন মানুষের কাছে থাক বা না থাক, অধিকাংশ জীবের আস্তিত্বিক মূল্য আছে। আমরা তাদের যে আস্তিত্বিক মূল্য আছে তা জানি না। এই আস্তিত্বিক মূল্য অনেক সময়ে একক, অনেক সময় যৌথ, অনেক সময়ে দুই-ই। অনেক সময়ে আমরা জানতে পারি না যে উপযোগ মূল্যটা কী, যৌথ মূল্যটা কী! ভাবি ওদের আস্তিত্বিক মূল্য নেই। সেটাও মহামূর্খতা। জ্ঞানভূমিতে মানুষ খুব বেশী এগোয়নি বলেই এই ধরণের ভুল করে বসে। এমনকি মানুষের কাছে যার উপযোগ মূল্য নেই বা ফুরিয়েছে, আস্তিত্বিক মূল্য নেই বা ফুরিয়েছে-তেমন জীবেরও বাঁচবার অধিকার আছে। এমনকি যার উপযোগ মূল্য দূরের কথা, নেগেটিব্-ইউটিলিটি ব্যালু রয়েছে, এন্টিটেটিব্-পজিটি ব্যালু নেই, নেগেটিস্ এন্টিটেটি ব্যালু রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও তা'দিকে ধ্বংস না করে উপযুক্ত পরিবেশে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। ও তারা যাতে

মানুষের মধ্যে ক্ষতিকর না হয়ে উঠতে পারে সেজন্যে উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখতে হবে। সুরক্ষা ব্যবস্থা না রাখার ফলে সেই অল্পবুদ্ধি জীবেরা যদি মানুষের ক্ষতি করে সেজন্যে ত্রুটি সেই জীবটার নয়-মানুষের। মানুষের বুদ্ধি আছে, কেন সে সুরক্ষা-ব্যবস্থা নেয়নি। আরও একটা জিনিস হচ্ছে এই যে আস্তিত্বিক মূল্য মানুষের কাছে মানুষের যতটা, জীবের কাছেও জীবের ততটা। মানুষ হয়তো বুঝতে পারে যে তার আস্তিত্বিক মূল্য আছে, জীব হয়তো বুঝতে পারে না-এতটুকুই তফাৎ। কিন্তু বুঝতে পারে না বলে সে হতভাগ্যকে ধ্বংস করবে-এই অধিকার মানুষের হাতে কেউ তুলে দেয়নি। এখন এই যে সোস্যাল-সেন্টিমেন্ট ম্যাক্সিমাইটিস-এর মধ্যে এই অর্থোন্নত জনগোষ্ঠী থাকছে। একটা মানব সমাজের মধ্যে বিভিন্ন বিভাজন ঘুরে ফিরে থেকে যাচ্ছেই-প্রত্যক্ষে না থাকুক পরোক্ষে থেকে যাচ্ছেই-ও যার ফলে ইন্ট্রা-হিউম্যান ক্ল্যাস-এর বিষটা থেকেই যাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে ইন্টার-ক্রিয়েচার বিষটা থেকে যাচ্ছে আর ইন্টার-ক্রিয়েচার যে ক্ল্যাসটা তাতেও মানুষ তাদের উপযোগ মূল্য (utility value) ও আস্তিত্বিক মূল্য (entitative value) বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। তাই জিনিসটা কোনো ক্রমেই ত্রুটিমুক্ত বলে গণ্য হবার নয়। মানুষকে

পারফেক্শান-এর জন্যে আরও চলতে হবে- 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' আরও দু'পা এগুতে হবে সেন্টিমেন্টের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে। সামনেও কি কোনো উজ্জ্বলতর প্রভাত তার জন্যে অপেক্ষা করছে না! নিশ্চয় করছে।

(কলকাতা, ২২শে মার্চ, ১৯৮২)

নোতুন প্রজন্মের পাথেয়

পরম কর্মায়ণ সত্তা (Supreme functional entity) একটা বিশেষ নিয়মে কাজ করে যায় আর তার এই নিয়মৰদ্ধতাকে 'নেচার' ৰলৰ। এই নিয়মৰদ্ধতা বেশ একটা ধারা (general stream) ধরে চলে। কিন্তু এই চলার পথে কোথাও কোথাও কিছুটা (যদিও তার মাত্রা বেশী নয়) অস্বাভাবিকত্ব (abnormality) দেখা দেয়। এই এ্যাৰনর্মালিটিটাও নেচার-এর বিধির (rule) বাইরে নয়, এটাও নেচার-এর একটা স্বীকৃত

ব্যাপার। অর্থাৎ এটাও নেচার। মেইন স্ট্রীম থেকে যে ডিবিয়েশন–সেই ডিবিয়েশনটাকেও ৰলৰ না 'ন্যাচারাল ল'-এর ডিবিয়েশন। এই ডিবিয়েশন–টাও 'ন্যাচারাল ল'-এতে স্বীকৃত জিনিস। এখন সাধারণতঃ মানুষের বিচার, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, মেধা–সেই মেইন স্ট্রীমটা ধরেই চলে। যে এ্যাৰনর্মালিটি অল্পস্বল্প দেখা দেয়–একটু আগেই বললুম–সেটাও নেচার–এর চলার পথে স্বাভাবিকতা–সে মেইন স্ট্রীম না হলেও সেটা স্বাভাবিক। এ্যাৰনর্মালিটি, আন্যাচার‍্যালিটি মহাবিশ্বে (uni-verse) নেই। অর্থাৎ সবই স্বীকৃত। কিছুই আন্যাচার‍্যালিটি বা এ্যাৰনর্মালিটি নয়–নেচার–এরই স্বীকৃত এক একটা কর্মায়ণ ধারা (functional faculty) বলতে পারি। এই যে বিশেষ ধরণের কর্মায়ণ ধারা–এ নেচারের আওতার মধ্যে পরম কর্মায়ণ সত্তার অধিক্ষেত্রের ভেতরেই (Special type of furictional faculty within the scope of nature, within the scope of Supreme functional principle)-এতে আমরা যে অভিব্যক্তিগুলো (expression) পাই–তা সে উদ্ভিদ–সংরচনাতেই হোক, জীব–সংরচনাতে অথবা মানুষের সংরচনাতেই হোক না কেন (both within plant struc- ture-within animal structure and also human structure) সেগুলো কী হয়! –না, কোনো কোনো ব্যাপারে সে মেইন স্ট্রীম থেকেও কম

দ্রুতিশীল (less advancing), আবার কোনো কোনো ব্যাপারে অধিক দ্রুতিশীল (far more advancing)। এই ধরণের সংরচনার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যখন কোনো কল্যাণকর ঘটনা সংঘটিত (blissful activity) হয়ে যায় বা হয়, তাকে আমরা বলি প্রতিভাধর (genius) ও তাকে বলতে পারি একটি কল্যাণঘন সত্তা। একটি মানুষের আধারে মূর্তকল্যাণ। পশু সংরচনায় খুবই ভালো জিনিস, উদ্ভিদ সংরচনায় মনে রাখার মত জিনিস (a blisssful structure, bliss in human structure, good in animal structure and remarkable in plant structure)।

আবার কোনো সংরচনা, সেই যদি ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয়, তখন বলৰো মানুষের আধারে পিশাচ, পশুর আধারে পশুর চেয়েও নীচ, সর্বনেশে উদ্ভিদের আধারে সর্বনেশে জিনিস (a demon in human structure, bad in animal structure, notorious in plant structure)। এখানে আমাদের বিশেষ করে উপজীব্য হ'ল ব্লিশ ইন্ হিউম্যান স্ট্রাকচার ও ডিমন ইন্ হিউম্যান স্ট্রাকচার। দি ব্লিস ইন্ হিউম্যান স্ট্রাকচার–তারা তাদের জিনিয়াসকে নবতর উদ্ভাবন, আবিষ্কার ইত্যাদিতে কাজে লাগিয়ে দেয়, মানুষের মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্মেষ ঘটিয়ে

দেয়। সব মানুষকে নিয়ে এক সঙ্গে চলে, লক্ষ্যের পানে দ্রুত পৌঁছুতে সাহায্য করে দেয়। তারা মানুষ সমাজের সম্পদ। তাদের ষ্টাডি করতে গেলে, জানতে গেলে খুব বেশী মনীষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যারা ডিমন ইন্ হিউম্যান স্ট্রাকচার তারা ছক্ বাঁধা নিয়মের মধ্যে আছে (They are in categorical form)। যদিও এই ধরণের স্ট্রাকচারগুলো, এই ফ্রেম ওয়ার্কগুলো, এই সংরচনাগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখতে মানুষেরই মত, কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে তারা অতি চালাক, অতি ধূর্ত (exceptionally clever and exceptionally cunning)। এরা বিভিন্ন ধরণের সেন্টিমেন্টের দ্বারা হাজার হাজার নয়-লাখ লাখ মানুষকে অকল্যাণের পথে ঠেলে দেয়- নিজেদের তুচ্ছ প্রতিষ্ঠার লোভে অথবা অন্য কোনো লোভে। সাধারণ মানুষ অত তলিয়ে ভাবে না। কিভাবে তলিয়ে ভাবতে হয় তা শেখানোও হয় নি... হয় না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এই ধরণের বিজ্ঞান বা বিদ্যা কতটা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। তাই মানুষ তাদের সম্বন্ধে কিছু না বুঝেই তাদের নিয়ে মাতামাতি করে ফেলে, তাদের নিয়ে বড় বড় বই লিখে ফেলে, আর তাদের কথাকে বেদবাক্য জ্ঞান করে সমাজের, রাষ্ট্রের জনসমূহের বহু ক্ষতি করে ফেলে। তারা অর্থাৎ সেই

অজ্ঞ নিরীহ মানুষেরা বুঝতে পারে না যে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা তারা ওই সকল ব্যষ্টিদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

এই ধরণের মানুষেরা কী করে? তারা মানুষের অন্তর্নিহিত (innate) ছোট ছোট জিও-সেন্টিমেন্ট, ছোট ছোট সোসিও-সেন্টিমেন্টকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেয়... দিয়ে তাদের নিজেদের ইচ্ছেমত চালাতে থাকে। কোন দেশের একজন নেতা দেশবাসীর মধ্যে জিও-সেন্টিমেন্টকে মনে কর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দিলেন। আবার জিও-সেন্টিমেন্ট-টা যেই বেড়ে গেল, তখন তাঁরা আবার ভয় পেয়ে যেতে পারেন যে এই যে জিও-সেন্টিমেন্ট এদের বাড়িয়ে দিলুম, জিও-সেন্টিমেন্টের সঙ্গে জিও-পলিটিক্যাল সেন্টিমেন্টটা বাড়িয়ে দিলুম-জিও-সেন্টিমেন্টটা বাড়ালে জিও-পলিটিক্যাল সেন্টিমেন্টও যে বেড়ে থাকবে। জিনিসটা যে সেখানেই থেমে থাকবে এমন তো কোনো কথা নয়। জিও-ইকনমিক সেন্টিমেন্টও তো জাগতে পারে। তারা তো ভাবতে পারে যে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলুম আর সঙ্গে সঙ্গে যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাবার ইচ্ছে তাদের মনে জেগে যায় তাহলে তো মহা ফ্যাসাদ হবে। আমরা চাইছি কেবল জিও-পলিটিক্যাল সেন্টিমেন্টটাকে কাজে লাগিয়ে একটা

জিও-পলিটিক্যাল লিবারেশন মানুষকে দিতে। কিন্তু জিও-পলিটিক্যাল লিবারেশন পাৰার আগেই, জিও-পলিটিক্যাল লিবারেশন পাৰার কথা ভাবতে ভাবতেই যদি তাদের মনের মধ্যে ইকনমিক লিবারেশন পাবার স্বাদ জেগে যায় তাহলে তো মহা ফ্যাসাদ হবে। এই নিরন্ন দেশে, বস্ত্রহীন দেশে সবাইকে যদি পেট ভরে ভাত-ডাল খেতে দিতে হয়, আমাদের মত পেট ভরে আখরোটের তেল আর অমুক তমুক যদি নাই বা জুটলো-পেট ভরে যদি ডাল-ভাতও খেতে দিতে হয়-তাহলে সেটা তো চাট্টিখানি কথা হবে না। তাহলে তো বর্তমান যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে, শোষণমূলক সংরচনা (exploitative structure) সেটাকে তো বদলাতে হবে। আর তা যদি করতে হয় তাহলে পলিটিক্যাল লিবারেশনটা পেয়ে লাভ হবে কি! এই রকম তলিয়ে তারা ভাবতে পারে। আর সাধারণ মানুষেরা এসবের কিছুই বুঝতে পারছে না। তলিয়ে ভাবতে গিয়ে এই ধরণের মানুষেরা এটাও দেখবে যে তার চাইতেও ভাল হয় যে জিও-পলিটিক্যাল সেন্টিমেন্টটা খুব বেশী ৰাড়বার আগেই যদি এর একটা নিষ্পত্তি করা যায়, অর্থাৎ পলিটিক্যাল লিবারেশন যার হাত থেকে পাবার কথা তার সঙ্গে মিলে মিশে গোপনে শলা পরামর্শ করে যদি এই

শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতাটা হস্তান্তর করে দেওয়া যায়। কারণ শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গেলে লড়বার জন্যে সেন্টিমেন্টের যে চরম অবস্থা সেটার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে আমাদের হাতেই ক্ষমতা এসে যাবে। আর ক্ষমতা এসে গেলে আগে যেমন শোষণ, শোষণকারী যন্ত্র (exploitation machinary) চলছিল আমরা সেইটাই বজায় রেখে দোৰ–কেবল শাদার বদলে কালো মানুষেরা শাসন করবে, এছাড়া কোনো তফাৎ হবে না। আর সাধারণ মানুষকে বলবো– "আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে গেছি" (We have attained political liberty)। এই বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দোৰ, তাদের কথাগুলো ধামাচাপা দিয়ে দোৰ; বলবো–"না, না, এসব কথা বলতে নেই, এসব কথা বলতে নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব কথা বলা পাপ"।

এই যে বর্ণচোরা মাণিকেরা, বাইরে থেকে এদের চেনা যাচ্ছে না কিন্তু তলে তলে কী সাংঘাতিক! এরা হ'ল ডিমন ইন্ হিউম্যান ফ্রেমওয়ার্ক। এখন কালের নিয়ম হচ্ছে এই যে বেশী দিন কোনো সত্য ধামাচাপা থাকে না। সে ফুটে বেরিয়েই যাবে। এখন পাপীদের মুখ থেকেই অনেক সময় পরোক্ষে বেরিয়ে যায়। কারণ মানুষের একটা সাইকলজি হচ্ছে

এই যে যে জিনিসটা সে ধামাচাপা দিতে চায়–ৰলৰো না, বলৰো না, বলৰো না করে, অতর্ক মুহূর্তে সেটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কোনো লোক, কোনো জিনিসটা হয়তো খুব চেপে রেখেছে, তারপরে এক বোতল কারণবারি পান করার পরে মাতাল অবস্থাতে সে সৰ বলে দেবে। আমার জানা কোনো একটি ধর্মসম্প্রদায়ের একজন নেতা ছিলেন। তিনি এমনিতে কিছু বলতেন না; আর অস্বাভাবিক অবস্থায় (তিনি যে সম্প্রদায়ের যে সম্প্রদায় মূর্তিপূজো আর জাতিভেদের বিরোধিতা করে কিন্তু যজ্ঞ–টজ্ঞ করে) অর্থাৎ খুব কারণবারি পান করে বলছেন– (আমার চোখের সামনেকার ব্যাপার) "ম্যায় তো কহতা হুঁ কী ম্যয় জাতপাত নেহী মানতা হুঁ–মগর ম্যায় মেরে বেটো কা বেটিয়ো কা বিবাহ কায়স্থ মে করুঙ্গা। ম্যায় তো দেবী–দেবতা নহী মানতা হুঁ–লেকিন বেটী কী সাদী নহা হো রহী হ্যায়। ইসলিয়ে লুচুপকে সত্যনারায়ণ ভগবান কী পূজা করতা হুঁ।" মদ খেয়েছে তো, তার মনের কথা সব বেরিয়ে গেলো। তা অতর্ক মুহূর্তে বেরিয়ে যায়; সত্য কখনও চাপা থাকে না। তাই তাদের ব্যাপারটা তারাও বলে ফেলে। তা এইজন্যে তাদের অর্থাৎ বর্ণচোরা মাণিকদের–আমি যা বলেছি–কী করতে হয়! না,

তাদের সেজন্যে ধরা পড়বার আগেই একটা অন্য ধরণের পন্থা নিতে হয়। অতীতে যে ধরণের সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে তারা মানুষের ক্ষতি করেছিলো সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা সেন্টিমেন্টে সুইচ ওবার করতে হয়। আর এই সুইচ ওবার করতে গেলে একটুখানি চালাকির দরকার হয়। সেটা বোঝাচ্ছি।

এই যে সুইচিং ওবার এটাকে বলা হয় মেটামফোজড সেন্টিমেন্টাল স্ট্রাটেজী অর্থাৎ যে সেন্টিমেন্টাল স্ট্রাটেজী নিয়ে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিলুম, আজ দেখছি ধরা পড়ে যাচ্ছে আমার সেই স্ট্রাটেজী–লোকে জেনে ফেলেছে আমার স্বরূপটা। এখন আমার প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে গেলে কী করতে হবে? -না, অন্য একটা সেন্টিমেন্ট এক্সপ্লয়েট করতে হবে ও সেটা করতে হবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, দেরী হলেই সেই ফাঁকে প্রতিষ্ঠাটা নষ্ট হয়ে যাবে। তা এই যে সুইচ–ওবার করা, একটা সেন্টিমেন্ট থেকে আর একটা সেন্টিমেন্টে–কম্যুন্যালিজম থেকে ন্যাশন্যালিজমে চলে গেলো অথবা ন্যাশন্যালিজম থেকে কম্যুনিজমে চলে গেলো–এই এক একটা সেন্টিমেন্ট বদলে দেওয়া–সেন্টিমেন্টের এই যে মেটামফোসিস এটাকে বলি মেটামফোজড সেন্টিমেন্টাল

স্ট্রাটেজী। এই ধরণের লোকেরা এসবেও ওস্তাদ। কোনো একটা পার্টি-সে আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-যাই হোক না কেন (এ তো সাইকলজির ব্যাপার হচ্ছে)-দেখছে তাতে দলাদলি হয়ে যাচ্ছে, দু'দলে চার দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আবার আলাদা আলাদা সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগাচ্ছে এই দলগুলো। তখন চালাকরা করে কী-দেখে এর মধ্যে কোন দলটা বেশী ভারী; কোন দলে ভিড়লে আমার প্রতিষ্ঠা ঠিক থাকবে, সে তাড়াতাড়ি কী করে! বাকীগুলোর বিরুদ্ধে যে দলটায় গেলে তার প্রতিষ্ঠা বজায় থাকবে- তার পক্ষে, বিবৃতি দিয়ে দেবে, ভাষণ দিয়ে দেবে-ষ্টেটমেন্ট দিয়ে দেবে, গরমাগরম কথা বলবে, অথবা এমনও বলে ফেলবে, "একদিন আমি ভুল করেছিলুম, আমি ভুল করেছিলুম", বলে তাড়াতাড়ি সুইচ-ওবার করে নেবে ও তা করে নিয়ে আবার প্রতিষ্ঠাটা বজায় রাখবে। তোমরা সোসিও-ইকনমিকো- পলিটিকো-কালচারাল সমস্ত লাইনেই এই ধরণের মানুষকে দেখতে পাবে।

• এরা এইরকম ভাবে সেন্টিমেন্ট এক্সপ্লয়েট করে মুখ্যতঃ প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে, গৌণতঃ অন্যান্য লাভের ব্যাপারেও আছে। এই ব্যাপারে এরা মানুষের কল্যাণ তো মোটেই চায় না, মানুষকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে দেখে। "আচ্ছা এই একলাখ

লোক, এই দু'লাখ লোক এদিকে থাকৰে, এই পাঁচলাখ লোককে এইভাবে কাজে লাগাৰ"-এইভাবে তারা ভাবে ও যারা তাদের বিশ্বাস করেছিলো তাদের একদিন কী হয়-না, সর্বস্ব খুইয়ে উদ্বাস্তু হয়ে যেতে হয়-অপমান, নিপীড়নের মধ্যে দিন কাটাতে হয়, পথে ঘাটে শিয়াল-কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে হয়। কাদের জন্যে! এই সমস্যার জন্যে দায়ী যে সকল ডিমন ইন হিউম্যান ফ্রেম-ওয়ার্ক তাদের জন্যে, যাদের ওপর এরা বিশ্বাস করেছিলো, যাদের মিটিংয়ে হাজার হাজার মালা নিয়ে যেতো, যাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে বিশেষ ধরণের টুপি পরে নিজের পাপকে ঢাকবার চেষ্টা করতো। একজন ভদ্রলোককে আমি বললুম, "তুমি এই ধরণের টুপি কেন পর? কালো চুলেতে শাদা রঙের বেশ খোলতাই হবে-তাই না?" সে বললে, "যা ভাবছেন তা নয়, আমি পাপ ঢাকবার জন্যে টুপি পরিনি, পরেছি টাক ঢাকৰার জন্যে"। অনেকে ওই টাক ঢাকবার জন্যে পরে আর অনেকে আনুগত্যের অভিপ্রকাশ হিসেৰেও পরে। কিন্তু সেই উদ্বাস্তুরা শেষ পর্যন্ত পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় আর এইভাবে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আজ হাজার হাজার, লাখ লাখ নয়-কোটি কোটি রয়েছে। আর এই যে কোটি কোটি মানুষ যারা অযত্নে, ক্ষুধার তাড়নায় মরছে-

যারা মরছে তারা যেন শেয়াল-কুকুরেরও অধম। এই মরার জন্যে দায়ী মুষ্টিমেয় কয়েকজন ডিমন ইন হিউম্যান ফ্রেমওয়ার্ক। তারা পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর বিরাট রকমের সর্বনাশ করে দিয়ে চলে যায়। তাদের জীবিত কালে তারা প্রচার-মাধ্যমগুলোকে (mass media) পুরো কাজে লাগায়। তাইতে বিভ্রান্ত হয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তারা তার ঊর্ধ্বে ভাবতে পারে না। সাধারণ মানুষের দুর্বলতা হচ্ছে ছাপার অক্ষরে তারা যা দেখে সেইটাই সত্য বলে মনে করে। সেই ডিমনরা কিন্তু ভাৰতে পারে না যে তারা পৃথিবী থেকে চলে যাবার পরেই আসল হিসেব-নিকেশ হয়। তখন মানুষ ভাবে, "এ কী করে ছিলুম, শিৰ ভেবে বাঁদরকে পূজো করেছিলুম! এ কী নিজেদের সর্বনাশ করেছিলুম!" কিন্তু তখন আর শোধরাবার পথ থাকে না। জনগোষ্ঠী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়... রাষ্ট্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়... মানুষে মানুষে মনের মাঝখানে বড় বড় প্রাচীর তৈরী হয়ে যায় ... মানুষ জাতের সামগ্রিক অকল্যাণ সাধিত হয়ে যায়। এই ধরণের মানুষ-আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আছে।

কেউ কেউ ভাৰে যে কেবল পলিটিক্যাল ক্ষেত্রেই থাকে তা নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রেই থাকে। বিশেষ করে চিন্তার জগতের বিভিন্ন ধরণের দার্শনিক অভিপ্রকাশের (in the field of so many schools of thought) ক্ষেত্রে এটা আরও বেশী। এতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করৰার অপচেষ্টা খুৰ বেশী আছে। অতীতে অনেক দার্শনিক গোড়ার দিকে একরকম কথা বলেছেন। তারপরে দেখেছেন স্পষ্ট বললে সমর্থন পাৰো না; তখন ভোল পাল্টেছেন। কারোরই নাম করা উচিত নয়। তোমাদের হাতে মাপকাঠি–তোমাদের হাতে কষ্টিপাথর–তোমরা যাচাই করেই দেখতে পারবে। কেবল একটা ছোট দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে–মহর্ষি কপিল গোড়ার দিকে একেবারেই ঈশ্বরের কথা বললেন না। তাঁর সাংখ্যের নাম নিরীশ্বর সাংখ্য। যখন দেখলেন হালে পানি পাচ্ছি না, অর্থাৎ লোকে এই দর্শন ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তখন 'জন্য–ঈশ্বরের' উদ্ভাবন করে ঘুরে ফিরে ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিলেন। শাঙ্কর দর্শনের সব কিছু মায়া; অর্থাৎ সবকিছুর গোড়ায় মিথ্যা, মাঝে মিথ্যা, শেষে মিথ্যা–যাকে ৰলে প্রমাদ। অথচ তিনি কী করলেন! না, গঙ্গার স্তোত্র রচনা করলেন–'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে'। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিথ্যা। সেই মিথ্যা বিশ্বে গঙ্গাটাও তো মিথ্যা।

তাহলে তার স্তুতি গাইবার কী প্রয়োজন ছিল? এগুলো হচ্ছে কী! –না, হালে পানি না পাওয়ার ফলে ভোল পাল্টাবার চেষ্টা, খোলস পাল্টে ঢোঁড়া ঢেমনা সাজৰার চেষ্টা। এটাকে কী বলছি–না, মেটামর্ফোজড় সেন্টিমেন্টাল স্ট্রাটেজী।

এই যে ভোল পাল্টানো, অথবা এই যে সেন্টিমেন্টাল স্ট্রাটেজী–এটা একটা পরিবর্তন। অনেকে বলবেন, এটা বিবর্তন। কিন্তু আসলে বিবর্তন নয়, পরিবর্তন। বিবর্তন অত কম সময়ে ঘটে না, ৰা অত অল্পায়াসে সংসাধিত হয় না। তো, মানুষ জাতের যাঁরা ক্ষতি করেছেন, তাঁদের অনেকের প্রকৃতি ও তাঁদের সবাইকেই মোটামুটি তোমরা বুঝেই নিয়েছো। এই যে বর্ণচোরা মাণিকেরা যারা সেন্টিমেন্ট বদলে দেয় মানুষকে অধিকতর শোষণ করবার উদ্দেশ্যে, তাঁদের চেনা একটু শক্ত। এঁরা কখনও একটা জিও–সেন্টিমেন্ট থেকে আর একটা জিও–সেন্টিমেন্টে সুইচ–ওবার করে যান, আবার কখনও একটা জিও–সেন্টিমেন্ট থেকে অন্য কোনো সোসিও–সেন্টিমেন্টে সুইচ–ওবার করে যান। অথবা একটা সোসিও থেকে আর একটা সোসিও–তেও চলে যান। এঁরা সব পারেন। জনসাধারণকে হাতে নেবার জন্যে হয়তো কোনদিন কোন একটা নেতা–কোন একটা দেশের নেতা বললে যে আমার দেশকে কিছুতেই আমি

ভাগ হতে দোষ না–বিভক্ত হতে দোব না; আমার মৃতদেহের ওপর দেশের বিভাজন হবে–তৎপূর্বে নয়। কী করলে–না, মানুষের জিও–সেন্টিমেন্ট তথা একই সঙ্গে সোসিও–সেন্টিমেন্টকে এক্সপ্লয়েট করলে। সবাই হাততালি দিয়ে বললে, "উনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। সাধে বলি উনি নির্ঘাত ব্রহ্মা, নিদেনপক্ষে বিষ্টুর অবতার!" তারপরে সেই দেশটা মনে কর বিভাজিত হ'ল। তখন সেই নেতা গোড়ার দিকে কিছুই বললেন না। তাঁর তখন মৌন দিবস চলতে থাকল। তারপরে বিভাজিত হয়ে যাওয়ার পরে বললেন, "আমি এতে বড় দুঃখিত, আমি জনগণের সঙ্গে আছি"। এগুলো হ'ল কী না, মেটামফোজড সেন্টিমেন্টাল স্ট্রাটেজী। এদের চিনতে হবে। এখন এদের চিনতে গেলে কী করতে হবে–না, সাধারণ বুদ্ধিতে হয় না, একটু বেশী বুদ্ধির দরকার হয়। এইজন্যে প্রয়োজনটা হচ্ছে কী! যে এদের চিনতে যাবে, প্রথমতঃ তার মনটা উপযুক্তভাবে তৈরী হতে হবে। ও মনটা তৈরী হবার জন্যে একটা আধারশিলা (base) চাই। কয়েকটা ছেলে দৌড়ুতে চায়। দৌড়ুতে গেলে তাদের একটা মাঠের ওপর দাঁড়াতে হবে তো! তা মনকে তৈরী করতে গেলে একটা আধারশিলার দরকার। এই আধারটা হচ্ছে 'সমসমাজ তত্ত্ব'। অর্থাৎ অন্যে

যে যাই বলুক না কেন আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে সকল মানুষের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান ইত্যাদি প্রাপ্তির ষোল আনা অধিকার আছে। আমি সেই অধিকারটা শুধু যে স্বীকারই করলুম বা করছি তাই নয়, তারা যাতে এই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, একটা সৎ মানুষ হিসেৰে আমি সেজন্যে চেষ্টাশীল থাকৰ। এইটাই হ'ল যথার্থ আইডিয়া-সম-সমাজতন্ত্রের স্পিরিট।

আর এইখানে থেমে থাকলে-স্পিরিট টুকুকে নিয়েই যদি থেমে থাকি, তাহলে কাজ হৰে না। যে ছেলেগুলো দৌড়ুতে চায়, তারা একটা মজবুৎ মাটির ওপর দাঁড়ালেই কি আর দৌড়ুনো হ'ল? তাদের দৌড়ুতেও তো হবে! এই যে দৌড়ুনোটা-এই যে এগিয়ে চলাটা এটা হ'ল কি-না প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচুয়ালিটি। এই প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচুয়ালিটির মাধ্যমে হয় কী না, মানুষ যে ধরণের ভাবছে, অন্যের কর্মে যদি দেখে সেই ধরণের ভাবনার অভাব হচ্ছে, সে তাদের চিনে ফেলে। সুতরাং এই অবস্থায় মানুষ এই যে প্রোটোসাইকো-স্পিরিচুয়ালিটি-এর দ্বারা ওই সকল ডিমন ইন হিউম্যান ফ্রেমওয়ার্ককে চিনে ফেলে। আর চিনে ফেলার পরে তাদের উচিত জনগণকে ভালভাবে চিনিয়ে দেওয়া-দেখো,

অমুক এইভাবে বিশ্বমানবের অকল্যাণ করে চলেছে। তাই কেবল চিনে ফেলাই যথেষ্ট নয়, অন্যের চোখ খুলিয়ে দিতেও হবে। তবেই না জগতের কল্যাণ হবে। তাই চুপটি করে ভাল মানুষটি সেজে ঘাপটি মেরে পায়রার খোপের মধ্যে যদি বসে থাক তাহলে কাজ হবে না। তাকে ডানা মেলে উড়তে হবে নীল আকাশে। তা' এই যে প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচুয়ালিটি-এটা একটা চলমান-সত্তা। যেমন মাঠে কতকগুলো ছেলে দৌড়ুচ্ছে-এই চলমানতা হ'ল এর প্রাণ। এরা যদি চলমানতা খুইয়ে মাঠে বসে থাকে সেটা যেমন দৌড়োনো তো হ'লই না, তার ফলে আলস্য উৎসাহিত হ'ল-It will encourage the psychology of lethargy। তা এই জিনিসটা কী রকমের-কেমন?

এই যে আমাদের মহাবিশ্ব তোমরা জান এটা সারকামরোটারিয়ান (This universe of ours, you know, is circumrotarian) অর্থাৎ এ নিজের কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বেই ঘূর্ণায়মান। এর বাইরে কেউ নেই। সুতরাং একে বাইরে থেকে কোনো সেন্টার বা কেন্দ্র খুঁজতে হবে না-কোনো নেইব, কোনো হাৰ, কোনো চক্রনাভির খোঁজে ছোটাছুটি করতে হবে না। মহাবিশ্বের চক্রনাভি সেই ব্যষ্টিরও চক্রনাভি-The hub of

this curcumrotarian universe is his hub also। এখন এই যে সারকামরোটারিয়ান ইউনিভার্স–এই সামগ্রিকভাবে আবার ইউনিটারী ভিত্তিতেও একটা সেন্টার থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই প্রতিটি পার্টিকল, প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি স্তম্ব সবই সেই সুপ্রীম হার্ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে (each and every grain of dust, each and every blade of grass-all are being equally controlled by that Supreme hub)। এখন কোনো মানুষ যদি তার ইউনিট হার্কে, ইউনিট সাইকো–স্পিরিচ্যুয়াল হার্কে এই সারকামরোটারিয়ান স্পিরিচ্যুয়াল হাবের সঙ্গে কোয়েনসাইড করে দিতে পারে, তাহলে প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে, প্রতিটি স্তম্বের সঙ্গে (স্তম্ব মানে ঘাসের পাতা) সে তার আত্মীয়তা অনুভব করবে–মর্মে মর্মে অনুভব করবে আর এই অনুভূতিটাই তাকে বিশ্বগতপ্রাণ করে দেবে। আর এই বিশ্বগত প্রাণ হবার ফলে অর্থাৎ এই প্রোটো–সাইকো স্পিরিচুয়ালিটির ফলে সে তখন যতরকমের সোসিও–সেন্টিমেন্ট আছে তার বিরুদ্ধে যুঝতে পারবে। এই বর্ণচোরা মাণিকেরা–তারাও তো সোসিও–সেন্টিমেন্টেক বা জিও–সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগায়। সুতরাং তাদেরও ভালোভাবে চিনে ফেলতে পারবে। এখন তোমরা

বলতে পারো এটার নাম আমি প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচুয়ালিটি কেন রাখলুম।

সাইকো-স্পিরিচুয়ালিটি জিনিসটা হ'ল কি!-না, মন এগিয়ে চলেছে স্পিরিচুয়ালিটির দিকে। তাই সাইকো-স্পিরিচুয়ালিটি নামটা হ'ল। এখন 'প্রোটো' এই কারণে বলছি যে এটাও একটা ফ্লিকারিং এন্টিটি (flickering entity)- নির্বাত দীপশিখার মত নয়, দদপ্ করা দীপশিখার মত। অর্থাৎ এটা কোনো নির্বাত নিশ্চল অবস্থা নয়-একটা চলমানতার দ্যোতক। তাই কমপ্লিট সাইকো-স্পিরিচুয়ালিটি বলতে পারলুম না-বলছি প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচুয়ালিটি। আর এই যে প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচুয়ালিটি-এর মধ্যে যে সিষ্টালশন রয়েছে-এই সিষ্টালশনের ভেতরে যে মৰিলিটি পোরশন-সেই মৰিলিটি পোরশানটা হ'ল পিওরলি সাইকিক্। আর এরই মধ্যে যে ৰিসফুল ষ্ট্যাটিসিটি রয়েছে-সেটা হ'ল পিওরলি স্পিরিচুয়াল-

That is a happy blending of psychic and spiritual strata।

তার জন্যে এটাকে বলছি সাইকো-স্পিরিচুয়ালিটি। এখন এতে আরও একটা বক্তব্য রয়েছে। যখনই মানুষ কোনো কাজ করবার পরে সেই 'হার্', এই সারকামরোটেরিয়ান 'ইউনিবার্সের', সেই কেন্দ্রবিন্দুর কথা ভাবৰে, তৎকালের জন্যে

তার মনটাও হয়ে যাৰে সর্বানুস্যূত। সে কারোর ক্ষতির কথা ভাবৰে না, সে সৰাইকার কল্যাণের কথা ভাবৰে। যে ক্ষতিকারী ইউনিট, যে মানবাধারে দৈত্য তাদের সে ভালোভাৰেই চিনে ফেলৰে। আর অন্য সব রকমের সোসিও সেন্টিমেন্ট যাদের দ্বারা প্রেষিত হয়ে সাধারণ মানুষ, অসাধারণ মানুষ, ব্যষ্টি, ব্যষ্টি-সমষ্টি ভুল পথে পরিচালিত হয়, তাদের শুধরে দেবারও যোগ্যতা অর্জন করবে। কারণ জিও-সেন্টিমেন্টের চেয়ে সোসিও-সেন্টিমেন্ট অনেকগুণ বেশী ক্ষতিকর। তাই বুদ্ধিমান মানুষের উচিত ভালোভাবে সেমিনারের মাধ্যমে জেনে বুঝে নেওয়া; এই সোসিও-সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে যুঝতে হলে যে সম-সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি আর প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচুয়াল মুমেন্ট অর্থাৎ গতিশীলতা দরকার, এই দু'টোকে জেনে, দু'টোকে অনুসরণ করে মানুষের মুক্তির পথ দেখানো। এটা করতেই হবে, আর কেন করতে হবে! -না, ব্যষ্টিগত জীবনে অনেক মানুষ হয়তো জেনে অথবা না জেনে এটা করে থাকেন কিন্তু সমষ্টি তো অন্ধকারে পড়েই রয়েছে, তাই সমষ্টিকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে হবে-'সমষ্টি তোমারই-সমষ্টি তোমার বাইরেকার নয়, সবাইকার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য অচ্ছেদ্যভাবে সংরচিত', তাই 'সবাইকে সঙ্গে

নিয়ে তোমাকে এই তামসী বিভাবরীর পরপারে নোতুন প্রভাতের মধুঢালা আলোর দিকে নিয়ে যেতে হৰে'।

(কলকাতা, ২৮শে মার্চ, ১৯৮২)

নব্য মানবতাবাদই শেষ আশ্রয়

আজকের মানুষ মনীষায়, বৈদগ্ধ্যে, বিবেচনায়, বিচারে কিছুটা তো এগিয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে এসেছিল আজ থেকে আনুমানিক দশ লাখ বছর আগে। সেই সময়কার মানুষের বিভিন্ন অনুভূতি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, উদ্বেগ, সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না যেমনটি ছিল, আজও তেমনটিই আছে। তফাতের মধ্যে আজকের মানুষের মধ্যে এসেছে অনুভূতির আরও বেশী গভীরতা। গভীরতা শুধু নয়, এই গভীরতার সঙ্গে চিন্তার মৌলিকত্বও বেড়ে গেছে। মানুষের এই যে গুণের ও দোষের সমষ্টি (collection of all perfections and imperfections of human beings)-এর সবটাকে নিয়েই 'হিউম্যানিজম্' আর

মহত্তর ভাবগুলো যেখানে একীকৃত হয়েছে, সমাহৃত হয়েছে– সেইগুলো নিয়েই হচ্ছে হিউম্যানিজম্–একটা গোটা মানুষ –... গোটা মানুষদের সমাহার। দোষে, গুণে, এই যে মানুষ–একে বর্তমান ইংরেজীতে বিশেষ্যেও 'হিউম্যান' (human) শব্দ ব্যবহার করা হয়–বিশেষণেও হয়। আগেকার দিনের মানুষ সংক্রান্ত যে ভাবসমূহ তার সম্বন্ধে যদি 'হিউম্যানিজম্' শব্দটা ব্যবহার করি, আর আজকের দিনেও যদি সেই 'হিউম্যানিজম্' শব্দটাই ব্যবহার করি তাতে ক্ষতিটা কী! মানবতা বা মানবিকতা আগেকার মানুষের সম্বন্ধে যেমনটি ব্যবহার করেছি, আজ কি তেমনটি ব্যবহার করতে পারি না! পারলেও পারতে পারি, কিন্তু তবু করছি না। কারণ, হিউম্যানিটিকে, হিউম্যানিজ়কে সেকালের মানুষ খুব ভালোভাবে বোঝেনি, স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেনি। সে যুগে মানবতা বা মানবিকতা যথার্থভাবে বিশ্লিষ্ট হয়নি। আজও হচ্ছে না। এই দশ লাখ বৎসরের মানুষের ইতিহাসে মানুষর প্রতি সুবিচার করা হয়নি। মানুষের একটি শ্রেণী, একটি বর্ণের প্রতি বেশী ৰাড়াবাড়ি করা হয়েছে, বেশী আদিখ্যেতা করা হয়েছে, আর তা করতে গিয়ে অন্যকে তাচ্ছিল্য করতে হয়েছে। একজন মানুষ লড়াই করলে ... মরলে.... আত্মদান দিলে, কাগজে বড় করে তা ছেপে দেওয়া

হ'ল, আর সে মারা যাবার পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে তার বিধবা স্ত্রীকে কী ধরণের অসুবিধায় পড়তে হ'ল সেকথা খবরের কাগজে বড় করে ছাপানো হ'ল না। অর্থাৎ একতরফা বিচার করে আসা হয়েছে। যদিও ব্যাকরণগত ব্যাপার আর হঠাৎ বদলানো যায় না তবে 'ম্যান' '(man)'-এই কমন জেণ্ডারের মধ্যে 'ম্যান', আর ওম্যান (woman)-দুই-ই এসে যায়। অথচ, 'ওম্যান' এই কমন জেণ্ডার-এর মধ্যে 'ম্যান' ও 'ওম্যান' দুই আসবেনা কেন! অর্থাৎ একতরফা, একপেশে বিচার করা হয়েছিল। Man is a masculine gender, man is a common gender also-মানুষ বলতে পুংলিঙ্গও হয়, আবার উভলিঙ্গও হয়ে যাচ্ছে। মানুষ বলতে এখানে মেয়ে মানুষও।

তা' এই ত্রুটিপূর্ণ জীবনের বোঝা নিয়ে দশ লাখ বছর ধরে মানুষ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে এসেছে, সৰাইকার প্রতি সুবিচার করেনি। তাই মানুষের সম্বন্ধে বা মানুষ-সম্বন্ধীয় ভাব নিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন-এ যে মানবতা-আর মানুষ সম্বন্ধে মানুষকৃত এই অর্থে 'ফিক' প্রত্যয় করে 'মানবিক' শব্দের উত্তর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন-এ 'তা' যোগ করে যে 'মানবিকতা', এর প্রতি সুবিচার করা হয়নি। কিন্তু এই যে মর্যাদাভ্রষ্ট মানবতা, এই যে মর্যাদাভ্রষ্ট মানবিকতা (downtrodden

humanity or downtrodden 'humanism')-একে নোতুন করে তাকিয়ে দেখবার সময় এসেছে। এমন দিন গেছে, যে মানুষটা পেছিয়ে পড়েছে যে মানুষটা মুখ থুবড়ে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেছে, হাত পা থেৎলে গেছে, যে মানুষটার বস্ত্রে কাদার ছাপ লেগেছে, অন্যে তাকে ঘৃণা করে দূরে ফেলে রেখেছে, সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এক ঘরে করেছে... এই সবগুলোই করেছে। যে পেছিয়ে পড়েছে তাকে টেনে তুলতে, সঙ্গে নিয়ে যেতে ততটা প্রয়াস করেনি, ততটা আগ্রহ দেখায়নি। মানুষ চলতে শুরু করেছে যখন, নিজের কথাটা যতটা ভেবেছে, অন্যের কথাটা ততটা ভাবেনি। অন্য মানুষের কথাও ভাবেনি, আর মনুষ্যেতর জীবজন্তুর কথাও ভাবেনি, গাছপালার কথাও ভাবেনি। অথচ একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে দেখা যাবে কি যে নিজের কাছে নিজের অস্তিত্ব যতটা প্রিয়, প্রত্যেকের কাছে তাদের নিজের নিজের অস্তিত্ব ততটাই প্রিয়। আর সব জীবের এই নিজ অস্তিত্বপ্রিয়তাকে যথাযোগ্য মূল্য না দিলে সামগ্রিকভাবে মানবিকতার বিকাশ অসম্ভব। মানুষ যদি ব্যষ্টি বা পরিবার, জাত বা গোষ্ঠীর কথা ভাবলো, সামগ্রিকভাবে মানুষের কথা না ভাবলো–সেটা অবশ্যই ক্ষতিকর। কিন্তু মানুষ যদি সামগ্রিকভাবে জীবজগৎ, উদ্ভিদ জগতের কথা না

ভাৰলো সেটা কি ক্ষতিকর নয়! তা, আজ এই মানবিকতাকে ও মানবতাকে নোতুন ভাবে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর এই নোতুনভাবে ব্যাখ্যাত মানবিকতা জগতে সত্যিকারের সম্পদে পরিণত হবে। What is Neo-humanism? Neo-humanism is humanism of the past, humanism of the persent and human- ism newly-explained of the future. মানবিকতাকে ও মানবতাকে নোতুনভাবে ব্যাখ্যাত করে মানুষের চলার পথকে আরো প্রসারিত, আরো উন্মুক্ত, আরো সহজ সরল করে দেবে... এই হ'ল নব্য মানবতাবাদ। মানুষকে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নোতুনভাবে ব্যাখ্যা দেবে, নোতুনভাবে প্রেরণা যোগাবে আর নোতুনভাৰে বোঝাৰে যে বিশ্বে এই সৃষ্টির মাঝখানে, এই সৃষ্ট জগতে তুমি সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান, সৰচেয়ে বেশী চিন্তাশীল প্রাণী। তাই সমস্ত সৃষ্ট জগতের অভিভাবকত্বের মহান দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। তো, What is Neo-humanism? Humanism newly explained...newly sermonised is Neo-humanism. যে দর্শন মানুষকে বোঝাৰে তুমি তুচ্ছ নও আর এই যে নিজেকে তুচ্ছতামুক্ত, গ্লানিমুক্ত করবার দর্শন–এ মানুষকে নোতুনভাবে প্রেরণা দেৰে, মানুষ আবার নোতুনভাবে বিশ্বকে গড়ে তুলবে।

আমি আগেই বলেছি যে 'ডিসটর্টেড হিউম্যানিজম' (বিকৃত মানবতা) পৃথিবীর অনেক অনর্থ করেছিল, আজও করছে, আর নব্য মানবতাবাদের দ্বারা বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত ভবিষ্যতেও মানুষের কপালে অনেক দুর্দৈবের এরাই কারণ হবে। এরা মানে কারা! না, যারা স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী-র দ্বারা প্রেষিত; এই যারা হিউম্যানিটিকে নিও-হিউম্যানিজমের দিকে না নিয়ে গিয়ে একে ব্যষ্টিস্বার্থে লাগাচ্ছে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, গোষ্ঠীস্বার্থে লাগাচ্ছে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, তাদের সম্বন্ধে কী করণীয়! এই যে ডিস্টর্টেড হিউম্যানিজ়ম্ ৰললুম অর্থাৎ এই হিউম্যানিটি-কে, হিউম্যানিজকে নিও-হিউম্যানিজমের দিকে নিয়ে গিয়ে আমরা সর্ববিধ মানসাধ্যাত্মিক ব্যাধির মকরধ্বজ তৈরী করে নিতে পারি। আর তা না করে তাকে যদি বিকৃত করা হয়, তাকে যদি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজীর খাতে প্রবাহিত করা হয় তাহলে মানুষের সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে তো অবশ্যই, তার সঙ্গে ধর্মজগতেও নানান ধরণের বিকৃতি দেখা দেবে, নানা ত্রুটি দেখা দেবে, যে ত্রুটি মানুষের মনকে কলুষিত

করে মানুষকে অধঃপাতের দিকে নিয়ে যাবে। এই ত্রুটিগুলো সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা ইতোপূর্বেই করা হয়েছে।

এখন প্যানাসিয়াটা (পাত্রভেদে সর্বরোগ-বিদূরক মকরধ্বজ) সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। এই যে যারা মানবিকতায় বিকৃতি ঘটাচ্ছে নিও-হিউম্যানিজমের দিকে না নিয়ে গিয়ে এর মধ্যে বিকৃতি এনে দেয়, ডিষ্টরসন এনে দেয়, তারাও সাধারণত দু'ধরণের মানুষ। এক ধরণের মানুষ এই কাজগুলো করছে সম্পূর্ণ না জেনে। তারা জানেই না, তারা কী দারুণ ক্ষতি করে চলেছে মানবসমাজের তথা মানবাশ্রিত উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের। আর এক শ্রেণী আছে যারা জেনেশুনে স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী নিয়ে চলেছে, যাদের সম্বন্ধে আমি বলছিলুম যে বর্ণচোরা মাণিক, ঘন ঘন রঙ পাল্টাতেও জানে। এই দু'ধরণের। নিও-হিউম্যানিজমের যে সাইকো- স্পিরিচুয়াল আসপেক্ট বা ফিজিকো-সাইকো-স্পিরিচুয়াল এদের কাণে কাণে যদি পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে দুই ধরণের প্রতিক্রিয়া আশা করতে পারা যায়। এই ধরণের হ'ল, তারা বলবে-'আহা, ভুলটা করেছি! কী ভুলটা করেছি! অমুক লোকটাকে নিয়ে আদিখ্যেতা করে কতই না রচনাসম্ভার (article) লিখেছি, আজ থেকে শুধরে যাব। অমুক লোকটার

ত্রুটি- বিচ্যুতিগুলো দেখবার সামর্থ্য আমার আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, তাই দেখতে পাইনি। আজ দেখতে পেলুম। এবার থেকে যথাযথ পথে চলে মানুষের কল্যাণ করব। আবার ওদেরই আর এক শ্রেণী না জেনে করেছিল। তারা যখন ঠিক জিনিসটা জানলে, তাদের মধ্যে যদি 'ইগো'র (অহম্মন্যতা) মাত্রাধিক্য থাকে, তাহলে বলবে, '(স্বগত) দ্যাখ, আমি ভুল করেছি আর অমুকে ধরিয়ে দিল! এ অপমান, এ অপমান! এ সহ্য করতে পারব না। অমুক যদিও বলছে ঠিক জিনিসই, তবু মেনে নেওয়া আমার পক্ষে মর্যাদাহানিকর হবে। তা আমার পক্ষে যখন মর্যাদাহানিকর হবে, তখন যে ভুল পথে চলেছিলুম, সেই পথেই চলৰ। আর মানুষের ক্ষতি করেছিলুম- একথা যদি স্বীকার করি, তাহলে আমার মুখে কালিলেপন হয়ে যাবে, কলঙ্ক লেপন হয়ে যাবে। তা কী করে হতে পারে! আমি কিছুতেই ভুল স্বীকার করব না। আর বলতে থাকব যে না, আমি ঠিকই করেছি। মানুষের ক্ষতি হয় হোক, আমার মর্যাদাহানি যেন না হয়। এই দু'রকমের মানুষ হয়। তোমরা যখন নব্যমানবতাৰাদকে মানুষের ঘরে ঘরে, দোরে দোরে পৌঁছে দেবে, তখন এই দু' রকম মানুষই পাৰে যারা না জেনে করেছিল। তবে আশা করি যারা না জেনে এই যে স্যুডো-

হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী ধরে চলেছিল–না জেনে, জেনে নয়–তাদের অনেকেই ভুল বুঝে নেবে, ভুল শুধরে নেবে। আর তোমরা তাদের সাহায্যে অন্যের কল্যাণ করবে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দেবে।

একটু আগেই বলেছি, এর আগের দিনও বলেছি যে এই অন্ধকারের পরপারে তাদের তোমরা নিয়ে যাও, আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের সামনে এনে দাও, যাতে তারা সংশোধিত হয়ে মানুষের আরো বড় এ্যাসেটে পরিণত হয়, আরো বড় সম্পদে পরিণত হয়। আর, যারা বিরোধিতা করবে, 'ইগো'তে ধাক্কা খেয়ে তারা কিছু করতে পারবে না। কারণ যারা 'ইগো'র দ্বারা প্রেষিত হয় তাদের বুদ্ধিহানি ঘটে, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। 'ইগো'-টাই বড় হয়ে যায়, বুদ্ধি কমে যায়। আর যার বুদ্ধি কম, সে তো অনায়াসে হেরেই যাৰে। তাই, তাদের জন্যে কোন দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু জ্ঞাতসারে যারা স্যুডো–হিউম্যানিষ্টিক পলিসি নিয়ে চলেছে, স্যুডো–হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী নিয়ে দুনিয়াকে দেখছে, তারা শোধরাতে চাইবে না। বরং তারা আরও উগ্র, আরও উদগ্র হয়ে উঠবে। তারা ভাবৰে যে তাহলে তো আমার সব কেরামতি ধরা পড়ে গেছে! আমার তো আর লুকোনো কিছু রইল না। তখন তারা ক্ষেপে উঠবে।

আর তাদের হাতে যত রকমের 'মাস মিডিয়া' (প্রচার-মাধ্যম) আছে, যত শক্তি, যত সামর্থ্য, যত বোক্যালিটি (vocality)-যা কিছু আছে... তূণীরে যতগুলি তীর আছে, সব প্রয়োগ করবে। কারণ, তখন তাদের সামনে অন্য পথ নেই। হয়তো তারা শোধরাতে চাইতে পারে, কিন্তু যদি শোধরাতেও চায়, তবু তারা দেখৰে যে অতীতে তাদের যে বিরাট ইতিহাসটা ছিল, সেটা তো মসীলিপ্ত ও নিও-হিউম্যানিজমের কষ্টিপাথরে তা মেকী জিনিস, তা মরা সোণা বলে ধরা পড়ে গেছে। তবে এটাও ঠিক যে জাগ্রত বিবেক, জাগ্রত মানুষ তাদের চিনে নেবার পরে তাদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবে। কোনো মমতা রাখবে না। এখন নিও-হিউম্যানিষ্টিক এই এ্যাপ্রোচ-নিও-হিউম্যানিজম্ কী তা বলতে গিয়ে যে বললুম হিউম্যানিটি, হিউম্যানিজ়ম্ নিউলি এক্সপ্লেইন্ড-হিউম্যানিজ়ম্ এক্সপ্লেন্ড এ্যাফ্রেশ। তা এই যে নিও-হিউম্যানিজম্-এর পথে চলতে গেলে, একে বাস্তবায়িত করতে গেলে কেমনভাবে চলতে হৰে অর্থাৎ নিও-হিউম্যানিজকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কীভাবে চলতে হবে আর যারা স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী নিয়ে মানুষের অকল্যাণ করে এসেছে, জেনে বা না জেনে, তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুঝতে হবে?

দু'টো প্রশ্নই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত-উত্তরও তাই। এইভাবে চলতে গেলে দেখতে হয় যে মানুষের জীবনটা কেবল ফিজিক্যাল নয়, কেবল সাইকিক নয়, কেবল স্পিরিচুয়ালও নয়-তিনে নিয়ে জীবিত মানুষের অস্তিত্ব। এইজন্যে এ্যাপ্রোচটাও হবে কী রকমের! না-প্রথম স্তর (ফার্স্ট স্টেজ) হবে, যার আমি নাম দিয়েছি স্পিরিচুয়াল কাল্ট। এই ফার্স্ট ষ্টেজটা কেমন হবে!- না, এই যে আমাদের কসমোলজিক্যাল অর্ডার-দিস এন্টায়ার কসমোলজিক্যাল অর্ডার (মহাবিশ্বের দ্যোতনা), এতে রয়েছে কী! ফিজিক্যালিটি রয়েছে, পাঞ্চভৌতিক উপাদান রয়েছে, জড় জগৎ রয়েছে। এই জড় জগতের পরিচালক-একটা ম্যাক্রোসাইকিক এন্টিটি (বিরাট মানসিকতার অধীশ্বর পরমসত্তা) রয়েছে। আবার এই ম্যাক্রোসাইকিক এন্টিটির পেছনে একটা ম্যাক্রোস্পিরিট-অতি বিরাট চিতিশক্তি রয়েছে। হ্যাঁ-This universe of ours is of Macro-psychic conation. (আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট মানসিকতার সংবোদনাত্মক প্রসৃষ্টি)। সুতরাং মানুষকে চলতে গেলে জড় জগৎ (ফিজিক্যাল ওয়ার্লড্)-কে অস্বীকার করে চলা চলবে না। ফিজিক্যাল ওয়ার্লডের যা কিছু অসঙ্গতি-সেগুলোর সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে আর এই বিবেচনা করতে

সাহায্য করবে মাইক্রোসাইকিক একজিষ্টেন্স (বিন্দু মানসিক আস্তিত্বিক চেতনা), তারপরে মানসিক জগতে যা কিছু অসঙ্গতি রয়েছে, অনেক মানুষ তার মেন্টাল পোটেনশিয়ালিটি (মানসিক সামর্থ্য) রয়েছে, কিন্তু কিভাবে চিন্তা করতে হয় সেই খাতটা, সেই রাস্তাটা, সেই স্ট্রীমটা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই সে ভুল পথে চিন্তা করছে। ভুল চিন্তার ফলশ্রুতি হয় ভুল কর্ম। তা চিন্তার ক্ষেত্রে কীভাবে তাকে চলতে হৰে সেই ব্যাপারে সে কোন গাইড-লাইন পাচ্ছে না। He is not being properly goaded unto the path of Macropsychic Entity.

আমাদের একটা স্বভাব আছে যে মানুষের একটা খারাপ কাজকে উঠতে বসতে তার নিন্দে করি, তাকে হেনস্থা করি। আমাদের ভেবে দেখা উচিত-সে এক ধরণের মানসিকতার রোগী। (He suffers from a sort of micropsychic ailment). তার সেই মাইক্রোসাইকিক এইলমেন্ট বা মনোবিকারের রোগ দূর করবার জন্যে তার সামনে আমাকে নিও-হিউম্যানিষ্টিক ফিলজফি তুলে ধরতে হবে। আমরা তা করিনা, আমরা অপরাধী। তারপরে সেই মাইক্রোসাইকিক এন্টিটির উদ্ধৃতি কোথা থেকে হচ্ছে। The micropsychic entity is a collection of a few ectoplasms, (অনেকগুলো চিত্তাণুর সমবায়েই, বিন্দু

মানসিক আস্তিত্বিক চেতনা তৈরী হয়) আর এই চিত্তাণু (এক্টো-প্লাজম) আসছে এই মাইক্রোসাইকিক এক্টোপ্লাজম (মহামানসিক চেতনাসঞ্জাত প্রসৃষ্টি) হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে আর ম্যাক্রোস্পিরিট থেকে পরোক্ষভাবে। এই দু'টো কথা ভোলা চলে না। প্রচারের দরকার, মানুষকে ঠিকভাবে চিন্তা করবার উপাদান যুগিয়ে দেওয়ার দরকার, ঠিকভাবে পথনির্দেশনার দরকার, তেমনি ম্যাক্রোস্পিরিট-এর দিকে যাবার জন্যে ঠিকভাবে পথনির্দেশনা মাইক্রোসাইকিক একটোপ্লাজমকে দিতে হবে। আমরা তা দিইনি। তাই আমরা এ বিচারেও অপরাধী। মানুষ জাতকে গড়তে গেলে যেমনটি পথনির্দেশনা দেওয়া উচিত ছিল দর্শনে, প্রজ্ঞায়, বিজ্ঞানে আমরা তা দিইনি। বিজ্ঞানের শুভপ্রয়োগের চেয়ে অশুভ প্রয়োগ বেশী করেছি, মানুষের চিন্তাধারাকে বিকৃত করে দিয়েছি, নির্দেশনা দেওয়া দূরের কথা, ভুল পথে চালিয়েছি। চিন্তা করতে শিখিয়েছি এই ৰোমাটা তৈরী করলে একসঙ্গে এত লাখ লোক মরতে পারে। শেখাই নি যে এই ফিলজফিটা প্রচার করলে-এই ধরণের মানসিক তথা আধ্যাত্মিক জগতে দিগ্দর্শন দিলে একসঙ্গে দশ লাখ লোক উপকৃত হবে। ভুল পথে মানুষ চলেছে। আজ তার

পথ-সংশোধনের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তার একমাত্র পাথেয়, পথের কড়ি হচ্ছে নিও-হিউম্যানিজম্-নব্যমানবতাবাদ।

এই পথে চলতে গেলে যেটা প্রথম সোপান-তিনটে সোপান রয়েছে, তিনটে ধাপ রয়েছে-সেই প্রথম সোপানটা হচ্ছে কী-না সেটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল কাল্ট (spiritual cult)। হোয়াট ইজ স্পিরিচুয়াল কাল্ট? ইট ইজ ফিজিকো- সাইকো-স্পিরিচুয়াল এন্ডেবার (জড়-মানসিক আধ্যাত্মিক প্রগতির নিত্যপ্রয়াস)। এই যে ফিজিকো-সাইকো-স্পিরিচুয়াল, এ মানুষকে যেমন জড়জগতের ভুলভ্রান্তিগুলো সংশোধন করবার নির্দেশনা দেবে তার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-জগতের ত্রুটি শোধরাবার নির্দেশনাও দেবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এটা ভালভাবে বুঝিয়ে দেবে যে অযথা কালক্ষেপ না করে স্পিরিচুয়াল গোল-এর দিকে এগিয়ে চলো। কারণ স্পিরিচুয়াল গোল-এর দিকে অগ্রগতি তোমাকে প্রকারান্তরে সাইকিক জগতে ও ফিজিকাল জগতেও সাহায্য করবে। তুমি মানুষকে অধিকতর সাহায্য করতে পারবে, একেই আমি বলি আধ্যাত্মিক নিত্যপ্রয়াস। এই স্পিরিচুয়াল কাল্টের অগ্রগতি শুরু হবে মানুষের অস্তিত্বের প্রোটোপ্লাজমিক সেল থেকে আর এর চরম নিষ্পত্তি পরমা প্রাপ্তিতে। এই যে ফিজিকো-সাইকো-স্পিরিচুয়াল কাল্ট-যার নাম দিচ্ছি

স্পিরিচুয়াল কাল্ট- এ ফিজিক্যাল ওয়ার্লড্-কে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে, সাইকিক ওয়ার্লড্-এর সাইকিক-কে প্রত্যক্ষভাবে, ফিজিক্যালকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করবে; আর স্পিরিচুয়াল পোটেনশিয়ালিটিস-এর স্পিরিচুয়ালকে প্রত্যক্ষভাবে আর সাইকিক ও ফিজিক্যাল-কে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে যাবে। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। এহ বাহ্য আগে কহো আর। আরো এগিয়ে চলো, "হেথা নয় হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে"।

দ্বিতীয় ধাপটার নাম দিয়েছি আমি স্পিরিচুয়াল স্পিরিট অর্ এসেন্স। স্পিরিচুয়াল এসেন্স মানে আধ্যাত্মিকতার সারমর্ম, নিগূঢ়তত্ত্ব। এই ক্ষেত্রে কাজ - হবে মুখ্যতঃ সাইকিক (মানসিক) আর স্পিরিচুয়াল (আধ্যাত্মিক) স্তরে। মানুষ জাতিকে সামগ্রিক ভাবে দেখলে মানুষের একটা সামগ্রিক মন রয়েছে- (collective mind, not the cosmic mind but the collec- tive mind.) এই যে কালেক্টিক্ মাইণ্ড-এর চিন্তার স্রোত চলেছে, চিন্তাজগতে উহ-অবোহ চলেছে, এতেও তো পরিবর্তন আনতে হবে! সামূহিক মানব মনেতে নোতুন ধরণের চিন্তার যোগান দিতে হবে। এযাবৎ মানুষ যেভাবে ভেবে চলেছে তাতে মানুষের উন্নতির গতি খুবই কম হয়েছে। সুতরাং একে

যদি নোতুন মোড় দেওয়া যায়, উন্নতি আরও ত্বরিত, আরও ত্বরান্বিত হবে। তাই এই যে দ্বিতীয় ধাপটা যার নাম দিচ্ছি স্পিরিচুয়াল এসেন্স-এ কাজ করবে সাইকিক, স্পিরিচুয়াল দু'টোতে। আর এ কাজ করৰে কালেক্টিব্ সাইকিক মাইণ্ড-এ অর্থাৎ কালেকটিক্ একটোপ্লাজম্ অব্ এন্টায়ার হিউম্যানিটি-তার মধ্যে কাজ করবে। অর্থাৎ দুনিয়ার মানুষের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেবে। আর ঠিক তেমনি মানুষের যে কালেকটিক্ স্পিরিট-সেই কালেকটিক্ স্পিরিট-এ শক্তির যোগান দেবে। মানুষ মিলিতভাবে একটি আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীতে পরিণত হবে। তখন সেঅবস্থায় আর কোন স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী কাজ করবে না। ব্রহ্মাস্ত্রের সামনে আর সব অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যায়।

কিন্তু এর পরেও আছে যাকে আমি নাম দিয়েছি স্পিরিচুয়ালিটি এ্যাজ এ মিশন। প্রথমে শুরু হ'ল স্পিরিচুয়ালিটি এ্যাজ এ কাল্ট; দ্বিতীয় ধাপ হ'ল-স্পিরিচুয়ালিটি ইন এসেন্স বা স্পিরিট আর তৃতীয় ধাপ হ'ল' স্পিরিচুয়ালিটি এ্যাজ এ মিশন। যত কিছু সত্তাগত কর্মায়ণ (existential phenomena) আছে সব উৎসারিত হচ্ছে একটা আস্তিত্বিক চক্রনাভি (existential nucleus) থেকে। আর একটি মানুষের

এই এজিষ্টেনসিয়াল নিউক্লিয়াস প্রত্যক্ষ যোগ (direct link) রেখে চলেছে কার সঙ্গে!–না, কসমোলজিক্যাল অর্ডার–এর যা নিয়ন্তাবিন্দু (controlling point) তার সঙ্গে–a direct link with the Cosmological Hub, a direct link with the Existential Nucleus of the Cosmological order, মহাবিশ্বের দ্যোতনার সঙ্গে, তার চক্রনাভির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে। এই পথ সাইকো–স্পিরিচুয়াল পথ, নিও–হিউম্যানিজম বলেছে। এর এই যে চরম তথা পরম পথটা হচ্ছে যে ইউনিট–এর একজিষ্টেনশিয়াল নিউক্লিয়াসকে কসমিক–এর এক্সজিষ্টেনশিয়াল নিউক্লিয়াস–এর সঙ্গে কোইনসাইড করিয়ে দেওয়া, (অণুবিন্দুর সংগে মহাবিন্দুকে মিলিয়ে দেওয়া–তন্ত্রের ভাষায় নাদবিন্দু যোগ)...এক বিন্দুতে মিলিয়ে দেওয়া। তার ফলটা হবে কী? না–the entire existential order of unit being becomes one with the Controlling Nucleus of all the existen- tial order of the Supreme Entity of the Cosmological order (এককত্বের সমস্ত চক্রাধারকে বিশ্বদ্যোতনার মহাচক্রনাভিতে মিশিয়ে দিয়ে এককত্বের অবযন্ত্রণা থেকে মহানিষ্কৃতির সম্প্রাপ্তি) আর সেই অবস্থাতেই আসৰে নিও–হিউম্যানিজম্–এর চরম প্রদ্যুতি। আর সেই নিওহিউম্যানিষ্টিক স্ট্যাটাস কেবল যে মানুষকেই বাঁচাবে তা নয়, জীবজগৎ, উদ্ভিজগৎ–সৰাইকেই বাঁচাৰে। আর সেই যে

(নব্যমানবতাবাদের পরমাস্থিতি) সুপ্রীম নিও-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্যাটাস সেই পরমাস্থিতিতে পৌঁছে যাবার পরে বিশ্বমানব তার অস্তিত্বের চরিতার্থতায় পৌঁছে যাবে। তখন মানুষের পক্ষে অসাধ্য কিছু থাকবে না, মানুষ সৰ কিছু করতে পারবে।

আজকের মানুষ নিজের অসম্পূর্ণতার কথা... ইম্পারফেশনের কথা বড্ড বেশী ভাবে-আমি কি পারৰ? কিন্তু, তখন তা নয়। তখন সে ভাববে-আই এ্যাম এ নিও-হিউম্যানিষ্টিক বীয়িং-পারবার জন্যেই তো আমি পৃথিবীতে এসেছি। আমি কি পারৰ-সে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? অনেককাল আগে পুরুলিয়ায় গেছলুম, সঙ্গে একটা ভারী মোট ছিল! একজন গ্রাম্য লোককে আমি শুধিয়েছিলুম- "আরে, মোটটা লিয়ে যেইত্যে পাইরবি, না লারবি?" সে বললে- "লারৰ কেনে গো, পাইরৰ"। আমার ভারি ভালো লেগেছিল। আর আমি জানি এই নিও-হিউম্যানিজম্ একদিন পৃথিবীর সব মানুষের মুখ দিয়ে ৰলাৰে- "লারব কেনে গো, পাইরব," আর মানুষ পারৰেও তা। আর সে দিন কোনো জিও-সেন্টিমেন্ট ট্যাঁ ফোঁ করতে পারবে না। কোন সোসিও-সেন্টিমেন্ট মানুষের সমাজে ভেদবুদ্ধির প্রাচীর গড়তে পারবে না। আর হিউম্যানিজম্-এর নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষের বিশ্বাসের অবমাননা

করে লাখ লাখ মানুষের ক্ষতি করতেও কোনো ডিমন (দানব) পারবে না। আর সেই যে সদাজাগ্রত হিউম্যান এন্টিটি, ফিজিকো-সাইকো-স্পিরিচুয়াল এন্টিটি যখন তার চরম তথা পরম অবস্থায় পৌঁছে তার এজিস্টেনশিয়াল নিউক্লিয়াসকে সুপ্রীম এজিস্টেনশিয়াল নিউক্লিয়াস-এ মিশিয়ে দেবে, তখন নিও-হিউম্যানিজম্ পাবে তার স্থায়ী ভিত্তিভূমি। আর সেই অবস্থাতেই নিও-হিউম্যানিজম্-এর হবে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। আর মানুষ চিরদিনের জন্যে মুক্তির আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ সেদিন বলবে, পৃথিবীতে এসেছি কাজ করতে, আর সব মানুষের সর্বজনহিতায়, সর্বজনসুখায়, সর্বজন কল্যাণার্থ, সবাইকে অন্ধকার থেকে টেনে নিয়ে আলোর দিকে নিয়ে চলতে। যদি কেউ বলে আমার অন্ধকারটাই ভালো-তাকে বলব-ঠিক আছে, তোর অন্ধকারটাই ভালো, কিন্তু একবার আলোর সামনে এসে দেখ-সেটা আরো ভালো।

(কলকাতা, ২৯শে মার্চ, ১৯৮২)